চর শীলাবতীর সেরেঙ্গ

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

ছোটনাগপুর পাহাড় থেকে এঁকেবেঁকে চলেছে শীলাবতী তার পথে। তার পারে অসংখ্য গ্রাম, তাদের সংস্কৃতি, জীবনশৈলী নিয়ে বয়ে চলেছে, সেই কবে থেকে। ওদের স্মৃতিগুলো উপচে পড়েছে বলে, কিছুটা ভাগ করে হালকা করেছে নিজেকে মড়কুসমা গ্রামে এসে। তারপর আবার ভার নিতে নিতে সন্ধিপুর, পলাশচাপড়ী, গোপালপুর, বাঁকা, যাদবপুর, হালদারবেড়, শ্রীরামপুর এইসব গাঁ শরীরে মেখে মেখে নাড়াজোল রাজবাড়ী ছুঁয়ে ঘাটাল বন্দর হয়ে মাথা রেখেছে, উজাড় করে দিয়েছে নিজের যা কিছু সঞ্চয়, সব রূপনারায়ণের বুকে।

আমি অনিন্দ রায়, শীলাবতী আমাকে চেনে, আমার ছোট্টবেলা থেকে। আমার গায়ের গন্ধ হয়তো এখনও তার শরীরে লেগে আছে।

সেই ছোট্টবেলায়, যখন তুষুমেলায় আর সবার সাথে আমিও স্নান করেছিলাম, তখন থেকে।

আজ আমি ছোট্ট অনিন্দ নয়। ডাঃ অনিন্দ রায়। আহামরি পসার নেই। থাকার কথাও নয়। বোধহয় ঐতিহ্যময় দারীদ্র নিয়ে সবাই বেঁচে আছে বলে। কে কাকে দেবে, কে কার পেট ভরাবে! স্বাভাবিক কারণেই রোজগার এমন কিছু নয়। কিন্তু শ্রদ্ধার আসনে বসেছে অনেক মানুষের হৃদয়ে।

বন্ধু থাকলে শত্রুও থাকে। শত্রুরা চেষ্টা করে অনেক কিছু। কি যায় ওসবে।

আসলে জীবনতো এই রকমই। কেউ সবার কাছে সম্মান পায়না অথবা সবার ভাল করতেও পারেনা। আবার কেউ পাহাড়প্রমান উচ্চতায় থাকে না চিরকাল অথবা গভীর খাতে. অন্ধকারে আলোহীন দিন নিয়ে অভিশপ্ত হয়না।

জীবনতো এমনই—কোন এক সুদূর প্রান্ত থেকে এসে মিত্র হয়ে যায় অচেনা অজানাদের কোন কোন জন। ভুলে যায় জীবনের কঠিন, রূঢ় কষ্টকর দিন। নিজের অক্লান্ত শ্রম দিয়ে স্বাচ্ছন্দের চূড়ায় ওঠে। হারিয়ে যায়না অগ্ন্যুৎপাতে। সে অগ্ন্যুৎপাত হল অহংকার।

সলেমান তাহের সিদ্দিকি, পেশায় রাজমিস্ত্রী। তার প্রথম যৌবনে সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে পেটের তাগিদে চলে এসেছে শ্রীরামপুরে। অপেশাদার, অন্য এক ঠিকাদারের অধীনে শুরু রুজিরোজগারের। বাড়ীতে তার আব্বা, আম্মা, বহিন সায়লী।

অপূর্বা সুন্দরী সায়লী। হবে নাই বা কেন, সলেমানকে দেখলেই তো আন্দাজ করা যায়।

একসময় পূর্ণাঙ্গ মিস্ত্রী সলেমান। আয় বাড়ছে ধীরে ধীরে। তারপর ঠিকাদার।

শেষ নেই কাজের। বাড়ী যাবার সময় নেই। তা না থাক, কর্তব্যে গাফিলতি নেই। টাকা পাঠায় আব্বাকে। টাকা পাঠায় সায়লীর সাদীর জন্য।

আমার সাথে পরিচয় করিয়েছিল রণজিৎ। আমার স্কুল জীবনের ডাকসাইটে বন্ধু। যার বাড়ী—আমার স্কুলজীবন, কলেজ জীবনে এমনকি আজও যাই সময়ে, অসময়ে।

পরিচয়ের প্রথমদিন সলেমান বলে—জানেন অনিন্দবাবু, বাড়ীর জন্য মন টানে খুব, মন খারাপ হয় আব্বা, আম্মার জন্য। কতদিন বহিন সায়লীকে দেখিনি।

চোখের কোণ চিক্‌চিক্ করে সলেমানের, বুকের ওঠানামা বেড়ে যায়। চোখ দুটো হয়ে যায় নাটকে দেখা সিরাজের কাঁটার আসনে বসার সময়ের মত।

তারপর চোখের কোণ। রুমাল বের করে মুছে বলে—কিই বা করব ফিরে গিয়ে। ওখানে রাজমিস্ত্রীর ছড়াছড়ি। জানেন তো অনিন্দবাবু—

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—বাবুটা বাদ দাও সলেমান ভাই। তুমি আমাকে অনিন্দ ভাই বলে ডেকো।

বেশ তাই হবে। বুঝলেন অনিন্দ ভাই, আমাদের সম্প্রদায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যাপার নেই। তারপর তালাক দেওয়া আছে। নতুন করে নিকা করা বিধান আছে। তিন ছেলের বাপ হয়ে যাচ্ছে সাত ছেলের বাপ। খাবে কি! করবে কি? হাতে তুলে নিচ্ছে করনীক। এক সময় মিস্ত্রী, তারপর ঠিকাদার। চলে এলাম এখানে। যদি ভাল করে শিখতে পারি। রোজগার করতে পারি।

জিজ্ঞাসা করি—তোমার আব্বা, আম্মার চলে কিভাবে?

টাকা পাঠাই মাসে মাসে।

এখন থাকো কোথায়?

ঐ তো টিনের একচাল বাড়ীটা দেখছেন, ওখানে। তবে জায়গা কিনেছি এক টুকরো। রণজিৎ ভাই-এর জমি ছিল। ভাবছি ওখানেই একটা বাড়ী করব।

তুমি বিয়ে করবে না?

বাড়ীটা আগে তৈরী করি। তারপর।

তোমার হাতে কাজ কেমন?

আল্লার দোয়ায় প্রচুর। শেষ করতে হিমশিম খেয়ে যাই। ঐতো রণজিৎ ভাইদের বাড়ীটাও করেছি। রণজিৎ ভাই অনেককে বলে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়।

হাসে রণজিৎ, সলেমানের বিশ্বাসের প্রতি মর্যাদার হাসি।

একসময় রণজিৎ নেতা হয়ে যায়। ভীষণ চালাকচতুর রণজিৎ। সেই স্কুলজীবন থেকেই। যেখানে যতেক ছাই রণজিৎ সেখানেই। পড়াশুনাতে খুব ভাল না হলেও, আটকায়নি কোথাও। বি.এ. পাশ করে বাড়ীতে চাষবাস, দেখাশুনা করে। অনেক জমি

ওদের। জমির রোজগার থেকে বাড়ী, একটা মোটর সাইকেল। সব করেছে। সুযোগবুঝে দলবদল করে নেতাও হয়েছে।

ভীষন মিসুকে রণজিৎ। ব্যক্তিজীবনে সব সঙ্গই লাভ করেছে সে। সব নেশাই পরীক্ষা করেছে। আসলে দেখতে হ্যাণ্ডসাম, মিষ্টিভাষী। সবাই ভালবাসে রণজিৎকে। পাড়ার মেয়েরা, বৌদিরা। সুযোগ নেয় রণজিৎ। যার সাথে যতটুকু পারে। এ হেন ছেলেকে ফেরাবে এমন সন্ন্যাসীনী কে আছে।

তবু সে রণজিৎ। সবার প্রিয়, বদনামহীন।

বলত রণজিৎ—জানিস অনিন্দ, মাইরি বলছি, মেঘ না চাইতেই আমার কাছে জল ধরা দেয়।

তা বলে এইসব করে বেড়াবি?

ছাড়তো সব নীতিকথা। জীবনটাকে উপভোগ করে নিতে হবে জীবন যেরকম চাইবে। তোর মত Good boy হয়ে কোন লাভ নেই।

রণজিৎ ভুল বলল। ওতো জানে, আমি বিয়ে করেছি প্রেম করে। ওতো জানে স্কুল জীবনে কেউ কেউ আসতে চেয়েছিল। চেয়েছিলাম আমিও।

রসিকতা করত রণজিৎ। তোর দ্বারায় কিছু হবেনা। এ্যঁঠো কর। দেখবি সব থেকে যাবে।

পারিনি। এতখানি বুকের পাটা ছিলনা।

শীলাবতীর তীরে—যেখানে যাদবপুর বলে একটা গ্রাম আছে অথবা ভবানীপুর যেখানে শেষ হয়েছে। প্রতি পৌষসংক্রান্তিতে সেখানে বসত তুষুর আসর। আদীবাসি, দুলে, বাগদী সম্প্রদায়ের মানুষ আসত তাদের মত করে তৈরী হয়ে। মাইক বাজত তারস্বরে। ভাঙা, পাঠহীন গলায় গান চলত—

আমাদের তুষু নাইতে যাবে
নতুন গামছা পরেলো,
ওদের তুষু নাইতে যাবে
ছেঁড়া কানি পরেলো।

জবাব আসত অন্য দলের কাছ থেকে—

বলিসনা আর তোদের কথা
(তোদের) তুষুর মনে সদাই ব্যাথা

জুটেনি তার লেপ বালিশ
মুখেই তোদের বড় কথা।

ভীষণ ভাল লাগত শুনতে। অবশ্য শুনতাম মাইকের মাধ্যমে।

একদিন রণজিৎ এসে বলল। চল তুষু গান শুনতে যাই। তারপর একরকম জোর করে নিয়ে গেল ওখানে। গিয়ে দেখলাম—এতো তুষু গান নয়, খেউর সেরেঙ্গ।

লখাই বলে আদিবাসী ছেলেটা— সে সেই কবে, সারেঙ্গা থেকে কাজ করতে এসে সেঙ্গা করে রয়ে গেছে মনসাতলার চাতালে। আদিবাসী পাড়ায়, উদম হেঁড়া খেয়ে, চোখ তার লাল। তার মাথায় বাউরি চুল। তুষু সেরেঙ্গ চালাচ্ছে খেউড়ের বান ডাকিয়ে। তার বৌ—সুরতিমাই, যেন গলে যাচ্ছে কর্তার কীর্তি দেখে। নাম জানিনা ঐ মেয়েটার, আইবুড়ো। তাকে ঠেলে লখাই-এর গায়ে ফেলে দিচ্ছে সুরতিমাই। মেয়েটাও যেন গলে জল হয়ে জড়িয়ে ধরছে লখাইকে। তার শঙ্খদুটো চেপটে বসে যাচ্ছে লখাইয়ের ঘাম চুকচুক কাল বুকে। যদিও শীতকাল। তবুও ঘামে ভিজে যাচ্ছে লখাই।

রণজিৎ বলে—অনিন্দ!

কিরে।

মাইরি দেখছিস্। মালটা কেমন হয়ে যাচ্ছে।

তার মানে?

বুঝলি অনিন্দ। মালটা হেভি। দাঁড়া তুলতে হবে।

সে কিরে। ওযে আদিবাসী!

আমি ওসব মানি না। জাত, ধর্ম আবার কিরে। মানুষ ভাবতে শিখ, সবাইকে মানুষ ভাব।

তা বলে.............।

দেখনা কি করি।

রণজিৎ দু বাটী হেঁড়ে খেয়ে নিল সুরতির কাছে। তারপর ভীড়ে গেল দলে। মেয়েটা লাখাইকে ছেড়ে, বোধহয় নেশার ঘোরে, মেতে গেল রণজিৎ-এর সাথে। সুরতি, লখারা ভালভাবেই জানে রণজিৎকে। বহুদিন থেকে যোগাযোগ। ওকে হেঁড়া খাওয়া এবং দলে ভীড়ে যাওয়া দেখে সুরতি বলে—এই রনভাই। পারুকে লিয়ে জানা। মেয়েটার নাম পারু। কি সুন্দরী দেখতে। ডাগর চোখ। বুকের সৌন্দর্যও যেন পাঠনা ভাঙা। তারপর লখার সাথে ঐ সব চলার সাথে সাথে আরও তীর্যক হয়ে গেছে বুক দুটো। যেন বুকের শাড়ীটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে। সবাই নেশায় মত্ত বলে রণজিৎ-এর প্রতি আলাদা করে কেউ নজর দেয়নি।

এইভাবে বিকাল শেষে সন্ধ্যা নেমেছে। দেখি পারু, রণজিৎ নেই।

ভয় আমাকে গ্রাস করছে। বাগদী, দুলেদের দল চলে গেছে। এরা যায়নি। হেঁড়ের

হাঁড়ি শেষ হয়নি এখনও। এরা আদিবাসী। একবার যদি এদের সেন্টিমেন্ট জেগে ওঠে, বিপদ হয়ে যাবে রণজিৎ পারুর।

খোঁজ করতে শুরু করলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন পেলাম, দেখি পারুর শরীর ঢাকা আছে রণজিতের শরীরে। ওদের খেয়াল নেই আমি এসে দাঁড়িয়ে আছি। ওদের থেকে একটু দূরে।

পারু পাগলের মত রণজিতের মুখ থেকে গলা পর্যন্ত যেন চেঁটে চলেছে। আর রণজিৎ.........।

ওদের সব শেষ হতে ডাকলাম—এই রণজিৎ?

তড়াক করে উঠে পড়েছে রণজিৎ। পারুর পরনের শাড়ী আলগা। লজ্জায় আলগা শাড়ী দিয়ে বৃথা ঢাকার চেষ্টা করছে শরীর।

আমরা কেউ আর দেরী করিনি। রণজিৎ চলে গেছে তার বাড়ী। আমি আমার।

এমনই সাহস রণজিতের।

সমস্ত রাত্রি ঘুমাতে পারিনি। একটা ভয় যেন আমার সমস্ত শরীরকে চেপে ধরে রেখেছিল সমস্ত রাত্রি। যেমন রণজিৎ ধরেছিল পারুকে।

শীলাবতীর বুকের বালি, রোদ্দুর মেখে তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করে বর্ষার কদিন ছাড়া সমস্ত বৎসর। যেমন বাঁধানো ছবিকে বুকে নিয়ে শুয়ে থাকে সদ্য বিবাহিতা, তার প্রিয় মানুষটি—যে তাকে ভাসিয়ে দিত প্রতি রাত্রে। এখন নেই। চলে গেছে তা কর্মস্থলে। একা স্ত্রী। মনের জ্বালা নিয়ে কাটিয়ে চলেছে, গুনে চলেছে এক-একটি দিনরাত্রি। শান্তি যেটুকু তা কেবল বুকের উপর রাখা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। যেটুকু উত্তাপ তাই নিতে নিতে। শীলাবতী নদীটিও। অথচ তার শাখা নদীটিতে জল থাকে বছর ভর। বিশেষ করে পলাশচাপড়ী থেকে মনোহরপুর থাকে সুখা। শীলাবতী জানে। যেমন জানে অরক্ষণীয়া স্ত্রী, যার পাশের ঘরে শুয়ে আছে দেবর তার স্ত্রীকে নিয়ে সিক্ত হতে হতে।

যেমন ছোট্ট রাইমণির। যদিও তার মনে ওসব জাগেনি। তবু অপেক্ষায় থাকে বাবুয়ার জন্য। বাবুয়া আসবে লালগড় থেকে, আদিবাসী হলে কি হবে গায়ের রং ফরসা। দেখতে বাঙালী ঘেষা।

বাবুয়া এলে ভীষণ ফুর্ত্তি রাইমনির। তার সাথে খেলবে। নদীতে স্নান করবে। বালি মাখবে। কোন কোন সময় বৌ-বর খেলা খেলবে।

আমি দেখেছি তাদের—বাবুয়া আদিবাসী বলেই নজর কেড়েছিল আমার। রাইমণির কোঁকড়ানো কালো চুল, ডাগর, উদাস চোখ।

রণজিৎ বলত—বুঝলি অনিন্দ, তুই দেখবি ওরা যখন বড় হবে, বেশ মানাবে ওদের।

দেখ রণজিৎ—রাইমণি কেমন কৃষ্ণচুড়ার মালা পরেছে। দুহাতে পরেছে চুঁড়ি। পায়ে নপুর, গলায় রুপোর হার।

সুখচাঁদের মেয়েতো। পয়সা আছে, তাই একটু অন্যরকম রাখতে চায়।

মুখিয়া সুখচাঁদ। সবাই তাই জানে। মুখিয়া বিচার করে। শাস্তি দেয়। কাউকে কাউকে ডাইন বলে গাঁ ছাড়া করে। বেশী ঝামেলা করলে গিরা ডাকে। মৃত্যুদণ্ডতো দিতে পারেনা। কিন্তু যে শাস্তিটা দেয়, তা মৃত্যুদণ্ডের থেকেও ভয়াবহ। সবাই ভয় করে সুখচাঁদকে। সুখচাঁদ ব্যবহারে পুরাতন, কিন্তু মেয়েকে লেখাপড়া শেখায়। হয়তো স্বপ্ন দেখে মেয়েকে নিয়ে। এই বিংশ শতকের শেষে এসেও ওদের সমাজে বদলায়নি অনেক কিছু। ওদের সংস্কৃতি, ওদের একগুঁয়ে মনোভাব, ওদের জলের মত সরলতা।

ওদের পাড়ায় কারনে অকারনে ভিডিও চলে। উগ্র হিন্দি সিনেমা দেখে। নকল করে নায়ক-নায়িকার সবকিছু।

আবার ছোটরা ছোট স্কুলে যায়। বড় স্কুলে যায় কেউ কেউ। একটু বেশী বয়সেই। অনেকে যেতে যেতেও ফিরে আসে ওদের সামাজিক অবস্থানে।

রাইমণি পড়াশুনা করছে ক্লাস থ্রীতে। সেও সিনেমা দেখে। দেখে নায়ক নায়িকার প্রেমপর্ব, যৌনতা। যদিও সবকিছু বোঝেনা। দেখে তাদের পাড়ায় উদম নেশা করে জ্ঞানগম্য হারিয়ে সন্ধ্যাতেই নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা। তারা কখনও স্বামী-স্ত্রী, কখনও সম্পর্কটা অবৈধ।

বাবুয়াও পড়াশোনা করে লালগড়ে পঞ্চম শ্রেনিতে। ওদের জমি নেই এক ছিটেফোঁটাও। রোজগারের পথ বলতে কেঁদুপাতা, শালপাতা, বাবুই পাকানো, বনের ছোটছোট ডাল কেটে বিক্রি করা। ভীষণ কষ্টের জীবন ওদের।

অবশ্য যারা পড়াশুনা করবে তাদের কোন অসুবিধা নেই। সরকার ওদের জন্য সবরকম ব্যবস্থাই রেখেছে।

বাবুয়ার বাবা আসে। দেখা হয় সুখচাঁদের সাথে। সুখচাঁদ ওদেরকে তেমন পছন্দ করেনা। কারন জমি নেই, লাঙ্গল নেই, হামার ভরা ধান নেই, সারা মরশুম সব্জি হয় না।

বাবুয়ার বাবা উপেন্দ্র মাণ্ডী বলে—চলে তো যাচ্ছে। ছিলাটাকে লিখাপড়া শিখাচ্ছি। পঞ্চায়েত বাবুত বলে—উয়ার হবেক, উ চাকরী পাবেকই।

জানু মুখিয়া—যত কষ্টই হউক, উকে লিখাপড়া শিখাবক। বনে জঙ্গলে পাতা

ভাঙতে দিবক লাই। কাঠ কাটতে দিবকলাই, বাবুই পাকাতে দিবকলাই। ইমন কি হাটেও যেতে দিবকলাই।

সুখচাঁদ বলত—হ্য হ্য। কুতকে দেখলাম। উসব ফুটানির কথা বুটে। দিখনা কিনে। সুব্বাইকে হুই বনলে যেতেই হবেক।

তর্কবিতর্ক হয়। জেদ বাড়ে উপেন্দ্রর। মুখিয়া সুখচাঁদের তাচ্ছিল্যও বাড়ে।

পছন্দ করেনা বাবুয়ার সাথে রাইমণিকে মিশতে দিতে। এর তো জানে ছোট্টবেলা থেকেই এরা বদলে যায়। এরা তো জানে এদের সমাজের রীতিনীতি। এরা তো এইসব দেখে সব শিখে যায়।

রাইমণির মা চূড়ামনি অবশ্য পছন্দ করে বাবুয়াকে। সে মনে মনে ভাবে এরা বড় হলে একদিন এক করে দেবে এদেরকে।

চূড়ামণি তো দেখেছে এরা দুজনকে ছাড়া খেলেনা, দুজনে গল্প করে। মেতে ওঠে হাসিতে। একে অন্যকে না দেখে থাকতে পারেনা। অবশ্য বাবুয়া যতদিন এখানে থাকে।

রণজিৎও পারুকে না দেখে থাকতে পারেনা ঠিক তুষুমেলার দিনটিতে। পারুও যেন প্রত বৎসর ছটফট করে রণজিৎ-এর ঐ একটি দিন মস্তি করার জন্য।।

আমি দেখেছি ঐ দু জোড়াকেই। আমার চোখে।

রাইমণি-বাবুয়া যদিও ভীষন ছোট, কিন্তু মন দুটো যেন একই সুতোতে বাঁধা। যদিও সুতোটা বেশ বড়। প্রান্ত বরাবর ওরা বাঁধা পড়ে আছে। ওরা বড় হবে ছোট হবে সুতোটা। তারপর শেষ হয়ে যাবে সুতো। ওরা বাঁধা হবে দুজনের হৃদয়ে।

আর পারু-রনজিৎ। ওদের বাঁধনে যদিও সামাজিক স্থায়ীত্ব নেই। কিন্তু দুজন দুজনের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে ওদের অবচেতন মনে।

এইভাবেই বাড়ে। জমে ওঠে শীলাবতীর চর। হেঁড়ের গন্ধে তুষুগানে, যৌবনের টানে। মনের টানে, সবকিছুই বাড়ে। কিন্তু গভীরতা কমতে থাকে শীলবতীর। তার প্রেম আছে। নাগর আসে না। আসলেও বরষায়। শীলাবতীর দুঃখ শোনার সময় নেই। ভোগবিলাস সেরে যত দ্রুত চলে যেতে পারে, তেমনই তার ইচ্ছে। শীলাবতী রয়ে যায় অব্যক্ত। সেখান থেকে তৈরী হয় অভিমান। সে যেন সুযোগের খোঁজে অপেক্ষা করে সমস্ত বৎসর।

সলেমান সাদী করে নিয়ে এসেছে ফতিমাকে। তার তৈরী নতুন বাড়ীতে। রণজিতের চোখ পড়েছে ফতিমার উপর। পারু হারাতে শুরু করেছে মন থেকে।

তার বাড়ীতে যাতায়াত দ্বিগুণ হয়েছে রণজিতের। সেই সূত্রে আমারও পরিচয় হয়েছে ফতিমার সাথে। ভদ্র, মার্জিতা, শিক্ষিতা ফতিমা। আমাকে বলে বড় ভাইজান। আমি বলি ভাবি। খুব সুন্দরী ফতিমা, তেমনি তার ব্যবহার। কয়েক মাসের মধ্যে ভাব জমিয়ে নিয়েছে পাড়ার অনেকের সাথে। তারা আসে ফতিমার বাড়ী। সময়টা কেটে যায় তার।

এইভাবে চলতে থাকে প্রায় দু'বৎসর। বাচ্চা আসছে না ফতিমার। কিন্তু তার সৌন্দর্যের উপরে যেন আরও অনন্য সৌন্দর্যের প্রলেপ। নজর পড়ছে পাড়ার শিবু, বুটনদের। বিভিন্ন ছুতানাতায় বাড়ছে যাতায়াত। সলেমান ওসব জানেনা। জানার সময় নেই তার। কেবল কাজ আর রোজগার। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে বাড়ী ফেরা।

সলেমানকে একদিন বলি—আর কেন, এবার একটা বাচ্চা নাও।

এক বুক দুঃখ দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে। বলে জানেন অনিন্দ ভাই। আমার বিবিও তাই চায়। কিন্তু সারাদিন খেটেখুটে এত ক্লান্তি আসে যে ফতিমা চাইলেও তাকে সুখ দিতে পারিনা। তাহলে বোঝো, তুমি থাক বাইরে, মেয়েটা একা একা কাটাবে কি করে?

আমার সাথে খোলামেলা গল্প করত গঙ্গাবৌদি। ফতিমার কথা বলতে সে বলে—ফতিমার বাচ্চা হবে কোথা থেকে। সলেমন সারাদিন কাজ করে এসে, খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্তি জুড়োতে। ফতিমা কি বলে জানে—

কি?

বলে—বিশ্বাস করো দিদিভাই, আমার তখন কান্না পেতো।

তাকে জড়িয়ে ধরে যা কিছু করার, সব করলেও ঘুম ভাঙত না। অথবা ঘুম ভাঙলেও জাগত না তার মনে ক্ষুধা। তাকে দেখে তখন মায়া হত। ভাবতাম—আমার চাওয়াটাই কি সব, বেচারা কত কষ্ট করে এল।

আর কি বলত?

বলত—একদিন সহ্য করতে না পেরে রাগ করে বললাম—আমাকে তালাক দিয়ে দাও। এভাবে থাকা সয় না। কি হল কে জানে। বহুদিন পরে জেগে উঠল আমার খসম।

তারপর?

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ফতিমা। জানো ভাই। আমি যতই খোঁচা দিই, কিছুতেই বলতে চায়না, অবশেষে বলল—

কি আর বলব, তুমি তো জানো দিদিভাই, কি হয়।

আমি বললাম, বয়স হয়েছে। ওসব কি আর মনে আছে। তাছাড়া শুনতেও তো ইচ্ছে করে। ফতিমা শোনাও না ভাই।

শুরু করল বলতে—খসম আমার শরীরের সব আবরণ খুলে ফেলে দিল খাটের পাশে।

বললাম—তারপর?

আমার সমস্ত শরীরে তার লকলকে জিভটা যেন.................। তারপর একবার ডান একবার বাম বুকে তার শক্ত থাবা বসিয়ে আমার হালত বদলে দিল সে।

তারপর?

তোমাদের গাঁয়ের এই শীলাবতী নদিতে বন্যা দেখেছো?

বললাম—দেখেছি। তার উঁচু বাঁধ ছাপিয়ে ভাসিয়ে দেয় মাঠ। সে কি ভীষন শব্দ।

এমনি করেই জল আসছিল আমার নদী ভরে। খসম যেন জলভরা আষাড়ের মেঘ। সে যেন বজ্রপাত। বিদ্যুৎ হয়ে চমকাচ্ছে আমাকে। কি বলব দিদিভাই, এমন কারও কাছে শুনিনি। মনে হচ্ছে একটা আগুনের পিণ্ড যেন এফোঁড় ওফোঁড় করছে আমাকে। মনে হচ্ছে, আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। কষ্ট পাচ্ছি। তৃপ্তি পাচ্ছি।

একসময় শেষ হয়ে গেলাম। সে হয়তো তাই দেখে নিশ্চিন্তে ঘুমের দেশে চলে গেল। ভিতরে আমার স্রোত তখনও বইছে শিরায় শিরায়। শির শির, শির শির, শিরশির। মনে হচ্ছে খসম যেন এখনও আমার সমস্ত শরীর জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে তার খেয়ালে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর?

তারপর আর কি! ভোর হল। বিছানা ছাড়লাম। নদীতে গেলাম। স্নান করলাম। ফিরে এসে দেখি খসম তখনও ঘুমোচ্ছে।

সত্যি বৌদি, তোমরা পার।

কেন, একথা কেন বললে?

না আসলে, মুসলিমরা তো ভীষণ রক্ষণশীল। তাদের ভিতরের কথা বের করা সহজসাধ্য নয়। অথচ তুমি পারলে।

ও কেন, দরকার হলে তোমার গিন্নীর কাছ থেকে তোমাদের প্রথম প্রথম রাত্রির খবরও বের করে নিতে পারি।

হেসে উঠলাম দুজনেই। তারপর চা খেয়ে উঠলাম ফিরে আসার জন্য।

গঙ্গাবৌদি বলল—আবার এসো। তুমি তো ভাই রণজিৎ ছাড়া কিছু বোঝনা।

না বৌদি, তুমি ভুল বললে।

হবে হয়তো।

যদিও প্রায় সমবয়সী, আমার বিয়ের প্রায় তিন বৎসর পরে রণজিতের বিয়ে হল। রূপালী সুন্দরী। রূপালী শিক্ষিতা। গিয়েছিলাম তার বিয়েতে। সলেমানকেও দেখলাম বিয়েবাড়ীতে, কিন্তু ফতিমাকে দেখিনি। হয়তো পেটে বাচ্চা বলে বেরোয়নি।

রূপালীর সাথে পরিচয় পর্ব শেষে বললাম— দেখো ভাই ওকে সামলে রাখতে হবে। ভীষণ দামাল।

লজ্জা পেয়েছিল রূপালী। তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছিল আমার কথার সারমর্ম।

প্রায় এক বৎসর রণজিৎ যেন বদলে যাওয়া রণজিৎ হয়ে কাটাল। ভদ্র, মার্জিত, স্ত্রীঅন্ত প্রাণ।

তারমধ্যে পৌষ-সংক্রান্তি এল। তুষুর আসরে গেলাম। পারুকে দেখলাম। কিন্তু তার কাছে গেল না রণজিৎ। হয়তো এমনও হতে পারে তার মনের, শরীরের প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছে রূপালী।

এক বছর পর আবার গেল রণজিৎ সেরেঙ্গের টানে।

বেহায়া পারু রণজিতের কাছে এসে জিজ্ঞাসাকরল—

কিগো রনবাবু, পারুকে মনে ধরছেনি। নাকি বৌ হইঙ্গ গিছে বলে ভাল লাগছেনি।

কোন উত্তর দেয়নি রণজিৎ।

সুরতিমাই আসল হেঁড়ের বাটি নিয়ে—এ্য রণজিৎবাবু, কি হল বটে। খাবিলাই? নাকি বিহা করেছু বলে তুয়ার বৌটা সব বারন করেঙ্গ দিছে।

না না, ভাল লাগছে না।

সে কি গো, ভুতের মুখে রামের নাম দেখছি বটে! তুমার পারু যে ছট্‌ফট্ করছে। উহার সাথে........।

তখন মনে হচ্ছিল পালিয়ে বাঁচি। কিন্তু রণজিৎ আসতে দিল না। সন্ধ্যা নামল তার মত করে। চলে গেল অন্যান্য দল। শীলাবতী নদীর চরে তখন আদিবাসী কজন, আর আমরা।

লখাই এল তার বাউরি চুল হেলাতে হেলাতে। এসেই ধরল রণজিতের হাত— এ্য রণজিৎ তুই লেতা হইছ বটে, তা বুলে সুরতিকে অপমান। কিনে কি দোষ করলে সুরতি। তুই ফিরাইঙ্গ দিছু হেঁড়ার বাটি।

আমতা আমতা করতে শুরু করল রণজিৎ। সে তো জানে এরাই তার ভরসা। তার রক্ষক। তার মূল সমর্থক।

হঠাৎ যেন বদলে গেল রণজিৎ। বলল- ডাক তোমার বৌকে।

লখাই ডাক দিল—এ্য সুরতি, লিয়ে আননা কিনে। প্রথম কাটটা।

সুরতি পেট ভরে হেঁড়ে খাওয়ালে রণজিৎকে। রণজিতের চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা হচ্ছে। শেষ বাটিটা নিয়ে এল পারু। ইচ্ছে করেই সুরতি পাঠাল পারুকে।

ভয় করছে আমার। কেননা এবার যা হবে হয়তো নেশার ঘোরে। কিন্তু রূপালী যদি জেনে যায়। তাহলে ভীষণ ঝড় উঠবে ওদের দাম্পত্য জীবনে। বললাম— রণজিৎ এবার বাড়ী যা।

কে কার কথা শোনে। পারুকে নিয়ে চলে গেল মাঠের মাঝে। যখন ফিরে এল— তখন পারু, রণজিৎ দুজনেই বিধ্বস্ত।

এসেই বলল—চল, বাড়ী যেতে হবে।

বললাম— তোকে কি দিয়ে আসব?

না, আমি চলে যেতে পারব।

বেশ কিছুদিন ভয়ে যাইনি রণজিৎদের বাড়ী। কিছুটা অস্বস্তি বোধও ছিল। কিছুদিন পরে গিয়ে দেখলাম রূপালী বমি করছে। দেখলাম তাকে। তার মূত্র পরীক্ষা করানো হোল। রূপালীর পেটে বাচ্চা এসেছে।

বাচ্চা হয়েছে ফতিমার। বাচ্চার নাম রেখেছে সলেমান আবুতাহের সিদ্দিকি।

কেমন দেখতে আবু? দেখতে গেলাম একদিন, অবশ্য সলেমানের ডাকে। তার চোখদুটো ফতিমার মত সুন্দর। সলেমানের মতই লম্বাটে গড়ন।

রূপালীর পেটে বাচ্চা, রণজিতের যাতায়াত আবার ফতিমার বাড়ী।

ফতিমার ছেলে হওয়ার পর প্রথম মাস দুই সলেমান কাজ সামলাতো তার মিস্ত্রীদেরকে দায়িত্ব দিয়ে। এখন নিজে যায়। আগের মতই সমস্ত দিন। ফিরে আসে রাত্রিতে। কোন কোন দিন রয়ে যায়। দূরবর্তী কাজের জায়গায়। ফতিমার দিন কাটে তার আবুকে নিয়ে।

সেদিন সলেমান বাড়ীতে নেই। রণজিৎ ভর দুপুরে মিটিং সেরে ফিরতি পথে ঢুকে পড়ে সলেমানের বাড়ীতে। ফতিমা তখন সবে খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিচ্ছে তার আবুকে নিয়ে।

রণজিৎ বলে—ভাবি একটু জল খাওয়াবে?

কেন, সামনেই তো জলের কল, ওখানে না খেয়ে এখানে।

এখানের জল মিষ্টি যে।

মুসলমানের ঘরের জল মিষ্টি? তুমি যে অবাক করলে!

জল খায় রণজিৎ। বসার জন্য চেয়ার দিয়েছে ফতিমা। তারপর জিজ্ঞাসা করে—রণজিৎ ভাই, এতদিন সাদী হল, বৌকে তো দেখালে না।

না গেলে দেখাব কি করে?

একদিন নিয়ে এসনা।

আসব কি করে, তার পেটে যে বাচ্চা।

তাই! তাহলে তো আব্বা হবে।

আরও কিছু কথপোকথন সারা হলে রণজিৎ বলে—ভাবি, সলেমান ভাইতো প্রায় বাড়ীতেই থাকেনা, তুমি কাটাচ্ছো কি করে।

আবুকে নিয়ে।

না, আমি তা বলছিনা, বলছি সারা দিন রাত্রি সলেমান ভাই বাইরে তো।

চলতে থাকে সহজ হওয়া থেকে সহজতম হওয়া।

একসময় রণজিৎ যে কোন মেয়ের সবচেয়ে দুর্বল স্থানে তার চাতুর্য হানে।

ভাবি তুমি ভীষণ সুন্দরী।

তাই নাকি। তোমার বিবির থেকেও।

তাই তো দেখছি।

দাঁড়াও তোমার বিবিকে বলতে হবে।

বলে দেখ, খুব একটা লাভ হবে না।

কেন?

সে বিশ্বাস করবে না।

হয়তো একটু প্রশ্রয় দেয় ফতিমা। সুযোগ নেয় রণজিৎ।

তার ঐ টুকু দুর্বলতার সুযোগে।

জান ভাবি ইচ্ছে করছে তোমাকে.........।

বল। থামলে কেন?

থাকতে পারেনি রণজিৎ। চুমু খায় ফতিমার মুখে, গলায়, স্তনে।

অপ্রস্তুত ফতিমা, হয়তো বা ভয়ে, কিংবা রণজিতের আরও কিছু চাওয়া থাকতে পারে এই ভেবে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেয়। ঘরের ভিতরে হাসছে ফতিমা।

বেচারা রণজিৎ দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষায়, তারপর আশার গুড়ে বালি ভরে চলে যায় বাড়ী ছেড়ে।

পরের দিন স্নানের সময় ফতিমা কিছুটা রেখে ঢেকে বলে গঙ্গাকে।

সেদিন রূপালীর বাড়ীতে রূপালীকে দেখতে গেছে ফতিমা। কথায় কথায় ফতিমা বলে—ভাবি তোমার কর্তাটি বেশ।

কেন গো?

তুমি সামলাও কি করে?

কেন?

বাপরে বাপ, যেন সিংহ!

তোমাকে খেতে গেছল নাকি?

হয়তো খেয়ে নিত। তবে পারেনি।

রসিকতার ছলে কথাগুলো বলছিল ফতিমা। রূপালী ভাবছিল অন্য কথা।

চোখ দুটো লাল হয়ে যাচ্ছিল রূপালীর। তার বরের প্রতি ফতিমার ইঙ্গীতবাহী কথা শুনে। সে ভাবছিল, হয়তো হতেও পারে। যেভাবে প্রতি রাত্রে ঝামেলা করত। এখন তো করেনা।

ফতিমা তাকিয়ে আছে রূপালীর দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে রূপালীর মনস্তত্ব।

এক সময় দুজনেই হেসে ওঠে। রূপালী হাসতে হাসতে বলে—আর বলোনা ভাবি—প্রতি রাত্রেই ও যেন বজ্রমেঘ, বিদ্যুৎ চমকাবে, ঝড় তুলবে, বৃষ্টি ঝরাবে, তারপর নীল আকাশ হবে।

মন খারাপ করে ফতিমার। সলেমানের প্রতি রাগ আসে। সে কেন এমন হয়না। মনে পড়ে রণজিতের কথা। সত্যিই সে যেন বজ্রমেঘ। সেদিন ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে না দিলে কি কাণ্ডই না হত। ইচ্ছে হয় রণজিৎকে প্রশ্রয় দিতে। কিন্তু.....। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফতিমা। বুটন, শিবুরা আসে। কিন্তু ইচ্ছে করেনা তাদের সাথে গল্প করতে। তারা যেন কেমন অন্যরকম।

ফিরে এসেছে ফতিমা তার বাড়ীতে। রূপালীর বাড়ী থেকে। ঝড় উঠছে ফতিমার মনে। স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে সে ঝড়। কেননা সলেমান ভীষণ ভালবাসে তাকে। বিশ্বাস ঘাতকতা করতে মন চায়না। কিন্তু শরীর। সেই যে সেদিন, তার পর থেকে সলেমান যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সন্দেহ জাগে মনে, সলেমান কি অন্য কারও সাথে.......।

রূপালীর মেয়ে হয়েছে। নাম রেখেছে ঋষা। রূপালীর মতই হবে দেখতে। ভীষণ খুশি রূপালী। তার ইচ্ছে ছিল একটা মেয়ে হোক। রণজিৎও তাই চেয়েছে। খুশি রণজিৎও। আরও বেশী ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে রূপালী ফতিমার। পাড়ায় তা নিয়ে সমালোচনাও চলে। কিন্তু সাহস পায়না কেউ কোন কিছু প্রকাশ্যে বলতে। কারন রণজিৎ বড় মাপের নেতা। সে দেবতা মানেনা, জাতপাত, ধর্ম মানে না, রূপালী মানে সবকিছুই। কিন্তু রণজিতের ভয়ে সাহস কুলোয়না।

ফতিমা, রূপালীর গভীর ঘনিষ্ঠতার সুযোগে এটা ওটা নিয়ে প্রায়ই যায় রণজিৎ ফতিমার বাড়ী। হয়তো ফতিমাও তাই চায়। কিন্তু কোনদিন কেউ বাইরে কারও কাছে প্রকাশ করেনা। বুঝতে চেষ্টা করলেও সমস্ত গ্রাম না. বোঝার ভান করে থাকে।

চাপা থাকেনা সবকিছু। যদিও ভীষন মৃদুভাবে, তবুও কানাঘুষো চলতে চলতে রূপালীর কানে আসে উড়ো খবরটা। রূপালী তখন তার মেয়েকে নিয়েই ব্যস্ত। রণজিৎ-এর ঝড় সামলানোর লোভ নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে মাতৃত্বের আবরন! তবু একদিন জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁগো কি সব শুনছি?

কি?

তোমাকে, ফতিমা ভাবিকে নিয়ে।

ছাড়তো। যত্তসব বাজে কথা।

লোকে বলে—জাত, ধর্ম সব গেল।

মুখোমুখি তাকায় রণজিৎ, রূপালী। তারপর স্ত্রীঅন্ত প্রাণ স্বামীর মত বলে—জানো রূপালী, জাতপাত বড় নয়, মানুষ বড়। ব্যবহার তার পরিচয়। সলেমান ভাই সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে এসেছে। তার কেউ এখানে নেই। একবারে একা। কে কি

বলছে জেনে লাভ নেই। তুমি মাঝে মধ্যে ওদের বাড়ী যেও। বেচারা ফতিমা এক একা....।

একটা কথা জিজ্ঞাস করব?

একটা কেন, যত পার জিজ্ঞাসা কর।

ফতিমার প্রতি তোমার এত দরদ কেন?

দেখ রূপালী, তখন সলেমান বিয়ে করেনি। এখানে এসে রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু করল। কিন্তু থাকবে কোথায়। মুসলিম বলে কেউ তেমন স্থান দেয়না। আলাদা চোখে দেখে, আমি একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিলাম। তারপর একটু জায়গা দিলাম। তখন তো ফতিমা আসেনি। ওর বাড়ীতে দুবেলা যেতাম দেখা করতে। কেউ কিছু বলছে কিনা খবর নিতে। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, সলেমান, ফতিমা নমাজ হয়তো পড়ে, তবে লোকচক্ষুর আড়ালে। সবাই যদি ওর সাথে না মিশে ও ভাববে কি। তাহলে হিন্দুবাদী আর বামপন্থীতে তফাৎ কোথায়?

সে তো না হয় বুঝলাম। কিন্তু আরও তো তোমার মত সব আছে। কই তারা তো ওদের অন্য চোখেই দেখে।

তুমি কি ফতিমাকে.............।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, মনটা এত নীচে নামিয়েছ।

ওসব বুঝিনা। তোমরা পারনা এমন কিছু তো নেই। তাছাড়া তুমিইতো বল জাত, ধর্ম, ওসব মানিনা।

আস্তে কথা বল রূপালী, লোকে শুনলে বলবে কি!

কেউ শুনুক না শুনুক আমি শুনেছিলাম। রণজিতের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে। তখন দুপুর। দরজা বন্ধ। রোগী দেখতে আসছিলাম শ্রীরামপুরেই। ফেরার পথে ভাবলাম রণজিতের সাথে দেখা করে যাই। দরজায় কড়া নাড়তে গিয়ে পারিনি। কথাগুলো কানে এসে যাওয়ায়। ভাবলাম রূপালী কি সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তা না হলে রণজিৎ এত যুক্তির বিন্যাসে কেন চেষ্টা করছে রূপালীর মনে উঁকি দেওয়া সন্দেহটাকে দূর করতে!

আমি তো জানি ও কত মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। আমি তো ভুলে যায়নি এই সেদিন তুষুমেলায় পারুর সাথে ওর সম্পর্কের কথা।

দরজার কড়া নাড়ি। দরজা খুলে দেয় রূপালী।

কি ব্যাপার? দাদা যে, এত দুপুরে?

আর বলোনা ভাই। আসছিলাম রোগী দেখতে। ভাবলাম, আসছি যখন তোমাদের সাথে দেখা করেই যাই।

আপ্যায়ণের ত্রুটি রাখেনি রূপালী। কিন্তু আমার চোখ রূপালী আর রণজিতের

দিকে। যাদের চোখে মুখে সন্দেহের জমাট বাঁধা অন্ধকার। রণজিৎকে এই প্রথম দেখলাম—যেন সে ভয় পেয়েছে। বললাম—কি ব্যাপার রে রণজিৎ। এতখানি থমথমে পরিবেশ!

না না তেমন কিছু নয়।

রূপালী যেন চাইছিল কিছু বলতে। রণজিৎ বলে—রূপালী একটু চা কর। অনিন্দ খাবে। আমারও খাওয়া হবে।

চলে যায় রূপালী চা তৈরী করতে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার বলতো!

কি আর। ওর কানে কে না কে তুলেছে—আমি নাকি ফতিমার সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছি।

মনে মনে ভাবি। যদি তুলেও থাকে। কথাটাতো একবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। বলি—ছাড়্তো ওসব। তুইতো নিজেও জানিস্ তুই কি। কেন খামোকা ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস্।

ফ্যাকাসে হয়ে যায় রণজিৎ-এর মুখ। সে যেন অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আসামী।

ফিরে এসেছে রূপালী চা নিয়ে। চা খেতে খেতে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নিই।

ঋষাকে দেখি—রূপালীর অনুরোধে। নাঃ তেমন কিছু নেই। ঋষা ভাল আছে।

আমি বা রণজিৎ এড়িয়ে যেতে চাইলে কি হবে, রূপালী যেন হজম করতে পারেনি পাড়ায় উস্কে ওঠা তুষের আগুন। বলে—বলুন তো দাদা, এমনি এমনি কারও নামে কেউ বদনাম দেয়।

যেন কিছুই জানিনা, ভান করে জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার বলতো?

রটনাগুলো বলে রূপালী। রণজিতের ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ আমার চোখে। বুঝতে অসুবিধা হয়না, রণজিতের ভাষা। রূপালীকে বলি—দেখো মানুষ যখন কোন কাজ করে তখন কেউ না কেউ তার খুঁত খোঁজে। তা যখন না পায় চেষ্টা করে সবচেয়ে সংবেদনশীল রটনা রটাতে এবং সেটা হয়, অবশ্যই নারীঘটিত। যাতে করে যার সম্বন্ধে রটানো হল তার সংসারে আগুন জ্বলে। সে ব্যস্ত হয়ে যায় নিজেদেরকে নিয়ে। রণজিতের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। এগুলো যারা করছে তারা বিরোধী। তাদের পায়ের তলার মাটি নেই। খোঁজার চেষ্টা করছে।

কিছুটা বিশ্বাস, কিছুটা অবিশ্বাস নিয়ে নিরস্ত্র রূপালী বলে—দাদা, আজ এখানে খেয়ে যাবেন।

না ভাই ফিরে যেতে হবে, চেম্বারে রোগী বসে থাকবে।

রণজিতের ফ্যাকাশে মুখটা বদলেছে। সেটাও আমার প্রতি বিশ্বাসে এবং অবস্থায়। ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্রামের একেবারে একপ্রান্তে সলেমনের বাড়ী যাই।

সলেমান বাড়ীতে আছে। ফতিমা আবুকে খাওয়াচ্ছে। আবুর বয়স প্রায় দু বৎসর। আদো আদো কথা বলে। সুন্দর চেহারা। চোখ দুটো একবারে ফতিমার মত টানাটানা, হাত-পায়ের গড়ন সলেমানের মত লম্বা, জমাট বাঁধা। ফতিমা এখন আর পর্দার আড়ালে নেই। বড় ভাইজান বলে আমাকে ডাকে। শ্রদ্ধা করে। আদাব জানায়। বলে—বড় ভাইজান, গোসল করে এখানে একটু খেয়ে গেলে খুব ভাল লাগত।

আজ যে সময় নেই ভাই।

না, না। আজ খেতেই হবে। ভয় নেই। আমরা মুসলিম হলেও বদলে ফেলেছি সব কিছু।

সত্যিই তাই। হিন্দু পাড়াতে একমাত্র মুসলিম সংসার। ওরা হিন্দু ঘেঁষা। কিন্তু হিন্দু নয় বলেই গ্রামের একপ্রান্তে কষ্টার্জিত পয়সায় ছোট ঘর করেছে, রং করেছে, জানালায়-দরজায় পর্দা টাঙিয়েছে। বাইরেটা সাজিয়েছে ঝাউ, উইভিং, দেবদারু দিয়ে। গোলাপ ফুল ফুটে আছে টবে। পাতাবাহার দিয়ে সাজিয়েছে বাড়ীর সীমানা। রজনীগন্ধাতে এখনও ফুল আসেনি। একটা ছোট্ট চাঁপাগাছে ফুল ফুটেছে কয়েকটা। তার গন্ধে মম করছে বাতাস।

ফতিমা, সলেমানের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। অবশ্য আমার বাড়ীতেও কেউ ছিলনা। খেতে হত হোটেলে।

. খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম নিলাম বেশ কয়েক ঘন্টা। যখন ঘুম থেকে উঠলাম—শেষ বিকেলের নরম রোদ্দুর চাঁপা ফুলের উপর বসে পান করছিল তার সৌন্দর্য। দেবদারুর পাতায় লাল আভা পড়ে কি মায়াময় পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। বারান্দায় বসেছিল সলেমান, বসেছিল আবুকে কোলে নিয়ে ফতিমা। লাল, নরম রোদ্দুর পড়ছিল তাদের চোখে মুখে, শরীরে। সুন্দর করে কাটা সলেমানের চাপদাঁড়ি। তার সাথে মানিয়ে বাটারফ্লাই গোঁফ। টুকটুকে ফর্সা, এত সুন্দর লাগছিল, মনে হল—যদিও ছবিতে দেখা! সিরাজদ্দৌলা যেন নতুন অবয়বে স্বাধীন ভারতে বিংশ শতকের শেষ পর্যায়ের নবাব, বসে আছে ঠিক আমার সামনে। আমি অবাক হচ্ছি। আমি মুগ্ধ হচ্ছি, তখনও চোখ ফেরাতে পারিনি আমার কল্পিত সিরাজের দিক থেকে। হলই বা সে রাজমিস্ত্রী। তারপর মনে হল—সিরাজকে তো দেখলাম। তার গুনমুগ্ধ হলাম। লুৎফাকে তো দেখা হয়নি। মাতৃত্বের অহংকারে অহংকারী। ফতিমা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আমি সুলেমানের সৌন্দয গোগ্রাসে পান করছি। ফতিমার দিকে তাকিয়ে দেখি সে হাসছে।

চাঁপার গন্ধটা আসছিল আমার ঘ্রাণে। মনে হল আতরের ঘ্রাণ। মনে হল লুৎফার শরীর থেকে ভেসে আসা। প্রায় সমস্ত দিন কাটালাম। এভাবে তো দেখিনি। বিকালের শেষ রোদ্দুরে কি ছিল যে এত সুন্দর, সুন্দরী লাগছে সলেমান, ফতিমা অর্থাৎ সিরাজ, লুৎফাকে। লুৎফারও ছবি দেখেছি ইতিহাসে। দেখেছি আমার মামা বাড়ীতে সিরাজদ্দৌলা

নাটকে। হীরা, জহরৎ বসানো শাড়ী। পটলচেরা চোখ। দ্বিতীয়ার চাঁদ ভ্রূযুগল। নাক তো নয় যেন পানিসংখের লেজ।

ফতিমা খুব সহজভাবেই বলল—বড় ভাইজান কি দেখছেন একবার ওর দিকে, একবার আমার দিকে। কেমন যেন আবেগপ্রবন হয়ে গিয়ে বললাম—সিরাজ আর লুৎফাকে।

হেসে উঠল ফতিমা। সলেমান বোকাবোকা তাকাল।

ফতিমা উঠে গেল ঘরের মধ্যে। আবার ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করল—বড় ভাইজান। একটু সরবত আনি?

না বললাম না। শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। আসলে ফতিমার চলে যাওয়া দেখছিলাম মন ভরে। তার পায়ে পায়েল। শব্দ তুলল রিনিঝিনি। ঘর ঢুকল ফতিমা। সরবৎ করছে। তার হাত ভর্তি চুঁড়িতে সুর তুলছে। কেন রণজিৎ এখানে বার বার আসে বুঝতে পারলাম। বুঝলাম রণজিৎ কেবল গল্প করতে আসেনা। তার আসার পিছনে আরও অনেক কিছু লুকিয়ে আছে।

ফিরে এল ফতিমা। তার হাতে সরবতের গ্লাস—নাকি সরাব। মনে হল লুৎফা সরাব খেতে দিচ্ছে তার প্রিয় মেহেমানকে। মুখে অদ্ভুৎ এক হাসি। সে হাসিতে সম্মোহন।

বললাম—এবার যে উঠতে হবে!

আবার আসবেন তো?

আসব ফতিমা।

বহিনকে মনে থাকবে তো?

ফতিমার চিবুকে হাত রাখলাম। বললাম পাগলী বোন।

হাসলো সলেমান। সেই বোকাবোকা হাসি। তখন মনে হল এ সিরাজ সে সিরাজ নয়। কিংবা মনে হল—সিরাজ যেন সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের প্রচেষ্টায় কাঁটার আসনে বসে আছে এবং প্রায়শ্চিত্ত করছে মানুষের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা রাখার।

মনে পড়ে গেল রণজিৎ, শিবু, বুটনদের কথা। যারা বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয় সলেমানের সরলতার সুযোগ নিয়ে।

সলেমান হঠাৎ যেন চনমনিয়ে উঠল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি রণজিৎ এসেছে। ও যখন তখন আসে। বেলা, অবেলায়, কালবেলায়।

কেননা অরক্ষিত ঘর।

জিজ্ঞাসা করল রণজিৎ—কিরে সেই সকাল থেকে এখানেই আছিস্?

তার চোখে সন্দেহ এবং সেটাই বাস্তব। তারপর সলেমানকে জিজ্ঞাসা করল—কি সলেমান ভাই, এখন কাজ কি একটু মন্দা।

জিজ্ঞাসার কারণ বুঝতে অসুবিধা হল না। আমার ভাবনার বাস্তবতা এনে দিল ফতিমা। ফতিমা কেমন যেন হঠাৎ গুটিয়ে গেল। বদলে গেল তার শারীরিক ভাষা।

প্রতি প্রশ্ন করলাম রণজিৎকে— তোর তো মিটিং ছিল বলেছিলি। তা মিটিং কি হল না?

না।

ওঃ।

একথা ওকথা শেষে হঠাৎ সবার সামনে বললাম—হ্যাঁরে রণজিৎ। পৌষসংক্রান্তিতো এসে গেল। এবার সলেমান, ফতিমাকে নিয়ে চল। খোঁচাটা বুঝল রণজিৎ। প্রসঙ্গ বদলাল একশ আশি ডিগ্রী।

শুনেছিস্ অনিন্দ রইমণি আর বাবুয়ার ব্যাপার?

না তো।

সুখচাঁদতো বাবুয়ার উপরে ভীষন চটে আছে। বলছে পঞ্চগ্রামী করে বাবুয়াকে শায়েস্তা করবে।

কারণ?

সেটাই তো বোধগম্য হচেছ না। ছেলেটি লেখাপড়া শিখছে। হয়তো চাকরী পাবে। তখনতো ওরা সুখে স্বাচ্ছন্দেই থাকবে।

তুই এসব জানলি কোথা থেকে?

রূপচাঁদ বলছিল।

তাই!

শুনলাম এই পৌষসংক্রান্তিতেই সুখচাঁদ একটা হেস্তনেস্ত করবে।

তাহলে কি হবে? ওরা তো খুবই ছোট।

আমরা সবাই সিদ্ধান্ত একটা নিয়ে রেখেছি। আগে তো দেখি সুখচাঁদ কি করে।

রণজিৎ, আমি বেরিয়ে পড়লাম সলেমানের বাড়ী থেকে যে যার গন্তব্যস্থলে।

চেম্বারে ফিরে এসে কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছিল, রণজিৎকে দেখার পর ফতিমার মুখের পরিবর্তনটা। ভাবছিলাম—তাহলে কি রূপালীর সন্দেহটাই ঠিক?

রোগী আসছিল একটার পর একটা। তাদের ভীড়ে হারিয়ে যাচ্ছিল ফতিমার মুখ। তাদের কষ্টের বর্ণনায় ভুলে যাচ্ছিলাম রূপালীর বলা কথাগুলো। তারপর সবকিছু মনের ক্যানভাস থেকে পুরোপুরি মুছে গেল। মনের মধ্যে ওঠা ঝড়টাও স্তিমিত হয়ে মৃদু দক্ষিণা বাতাস হয়ে গেল। শান্তি পেলাম।

বেশ কিছুদিন কোন এক অজানা কারণে রণজিতের সাথে অথবা সুলেমান, ফতিমার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। তার মধ্যে পৌষসংক্রান্তি ডাক দিয়ে চলে গেছে, বসন্ত

এসেছে। বিদায় জানিয়েছে চৈত্রসংক্রান্তির ঢাকের শেষ বোলে। দ্রিম তা দ্রিদিম, দ্রিদিম, দ্রিদিম। নতুন বৎসর এসেছে একবুক ঝড় নিয়ে। সে ঝড় হয়তো যতসব পুরাতনকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার। পুরাতন মনগুলোকে এবং মনে জমে থাকা সন্দেহ, অবিশ্বাসকে পুনর্নবীকরণ না করে ঝেড়ে সাজানোর।

তার মধ্যে রণজিৎ-এর সংসারের সাথে সুলেমানের সংসার আরও বেশী একাত্ম হয়েছে। হজার সমালোচনা ভাসছে শ্রীরামপুরের বাতাসে বাতাসে।

রণজিতের মায়ের প্রয়াণ হল বৈশাখের সাত তারিখে। কেন জানিনা। রণজিৎ আমাকে কোন খবর দেয়নি। তার একমাস পরে প্রয়াণ হল রণজিতের বাবার। হয়তো রণজিৎ-এর বিবেকের ঘরে অনুশোচনা এসেছিল। খবর দিল একটা চিঠি মারফৎ। তখনও তার বাবার শবদাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়নি। আমি গেলাম রণজিৎ-এর বাড়ী। ভীষণ ভেঙে পড়েছে রূপালী, রণজিৎ। ওদের মেয়ে ঋষার ওসব ধারনা তৈরী হয়নি। সে দেখছে, বাড়ীতে অনেক মানুষ। অবাক হয়ে দেখছে তাদের। কখনও ভয়ে কাঁদছে, কখনও তার বাড়ীতে প্রায় আসে এমন মানুষদের দেখে হাসছে। খেলছে।

আমি রণজিৎকে সান্ত্বনা দেব তেমন ভাষা খুঁজে পাইনি। কেবল তার কাঁধে হাত রেখেছি। কান্নায় ভেঙে পড়েছে রণজিৎ। বারবার বলছে—আমাকে ক্ষমা করে দে অনিন্দ। আমি তোকে ভুল বুঝে কেবল এড়িয়ে চলেছি।

বললাম—মানুষ ভুল করে। সংশোধনের দায়িত্বও তার। এ নিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কি আছে। বিশেষ করে আজই। যখন তোর বাবা ইহজগৎ ত্যাগ করে চলে গেছেন সবাইকে ছেড়ে।

না অনিন্দ, আজ এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমি অনেক ভুল করেছি তোকে অন্যরকম সন্দেহ করে।

থাকনা ওসব কথা।

অনিন্দ!

বল।

তুই আমাকে ক্ষমা করলি তো।

ওসব ছাড়তো, যা বাস্তব তাকে নিয়ে চল।

শবদাহর আয়োজন সারা। এবার রণজিৎ-এর বাবাকে নিয়ে চলেছে শবদাহকারীরা, শীলাবতীর চরে, যেখানে সমস্ত গ্রামের অনেকের শব দাহ করা হয়।

যে শীলাবতী জলের জন্য হাহাকার করে বর্ষা ছাড়া সমস্ত বৎসর। তার বুকে জ্বলছে আগুন। এ দুঃখ কাকে বলবে শীলাবতী। তার নাগর যে বসন্তের কোকিল। তার বসন্ত তো কেবল বর্ষাকাল। এখন জৈষ্ঠ। এখন সে নীল আকাশের ওড়নায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। তার দুঃখ কিছুটা হলেও অনুভব করে দুই পাড়ের—কাঁঠাল, জাম, বাঁশ, হিজল, বেগনে, বেড়াকল্মি কিংবা তার দুই পারে বিচরনে তৃপ্ত গরু, ছাগলের।

মানুষেরা ওসব অনুভূতির মধ্যে আনেনা। কেননা তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভুলে গেছে। কেবল ভোগের নেশায়, স্বার্থের নেশায়। তার বুকে বসাচ্ছে অগভীর নলকূপ। তার বুকের বালি নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদায়। যে বালিতে লুকিয়ে আছে বুকফাটা কান্না, আর দীর্ঘশ্বাস।

আজ রণজিৎ কাঁদছে, রূপালী কাঁদছে, কাঁদছে রণজিৎ-এর বাবার পরিজনেরা। কারণ তার মৃত্যু হয়েছে। শীলাবতী মৃতপ্রায়, তার জন্য সামান্যতমও নিঃস্বার্থ অনুশোচনা প্রকাশ করেনা কেউ।

শবদাহ শেষ হয়েছে। শেষ হয়েছে কীর্তনীয়াদের দরাজ গলার গান। মৃদঙ্গ বাজছেনা, বাজছে না করতাল। এই একটু আগে যারা কাঁদছিল, তারাও আর কাঁদছেনা। হয়তো চোখের জল শেষ হয়ে গেছে। কিংবা এবার ভুলে যেতে হবে বলে অভ্যাসের দাসত্ববরণ করছে সবাই।

কিন্তু সলেমান! গ্রামের একমাত্র মুসলিম পরিবারের একজন সদস্য। সে কেন শীলাবতীর চর থেকে একটু দুরে জামের তলায় বসে দোয়া চাইছে। সবাই ফিরে যাওয়ার জন্য যখন ব্যস্ত। সে তো দাহকৃত শবের কেউ নয়। ধর্ম, জাত, সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দুদের বিপরীত। অথচ সে দোয়া ভিক্ষা করছে। তিন ওয়াক্ত নমাজ পড়ছে।

আমরা পারিনা। আমরা যাইনা ওদের মৃত ইনসানকে যখন কবরস্থ করা হয়। যদিও বলা হচ্ছে, মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটছে।

ফতিমাকে, আবুকে দেখেছিলাম তখনও শবদেহ বাড়ী থেকে বের করা হয়নি। দেখেছিলাম ফতিমার চোখে জল। ঠিক আমাদের মেয়েদের মতই। ঠিক তখনই ইচ্ছে করছিল সকল ধর্মীয় ব্যবধান মুছে ফেলি। ওরা হিন্দু না, মুসলিম, জৈন না খৃষ্টান। এই আমরা, যে টিভির পর্দায় দেখি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সম্প্রচার। জাত ধর্ম বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যাংটো শিশুটির হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করা। সে বোবা, সে অবোধ, জানে না আমরা যেখানে বাস করছি তার অবয়ব কেমন। তার প্রান্তর সবুজ নাকি রুক্ষ্ম। তার তাপমাত্রা শীতল, উষ্ণ নাকি নাতিশীতোষ্ণ।

শবদাহ শেষে একা ফিরে এসেছিল সলেমান। অবশ্য ব্যবধান বজায় রেখে। কারণ সমাজ। কারণ গাঁয়ের মানুষদের তেরছা চাউনি। সবকিছু লক্ষ করেছিল রণজিৎ। শুনেওছে অনেক কিছু। মনে মনে রাগ পোষণ করেছে। অমানবিক-হৃদয় মানুষগুলোর জন্য।

আদ্যশ্রাদ্ধের কাজ শেষ হয়েছে। নিমন্ত্রণের তালিকায় সলেমন তাহের সিদ্দিকি, ফতিমা বিবি। তাদের আগমণে রক্ষণশীল সমাজ রেরে করেছে। অবশ্য আড়ালে আবডালে। কারন রণজিৎ-এর প্রতি ভয়। শ্রদ্ধা আছে কিনা জানিনা।

রূপালী তার মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত। একা ঘর সামলাচ্ছে নিপুণভাবে। মাটির মানুষ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। হলে কি হবে, পড়শী মেয়েদের সাথে যোগাযোগ কমছে ধীরে ধীরে। কারণ ফতিমা।

একদিন রাত্রিতে রূপালী রণজিৎকে বলে—জানো! পাড়ার গঙ্গাদি, চাঁপাদি, নয়না এরা কেউ আসেনা। শুনলাম ফতিমা ভাবি আসার জন্য নাকি ওদের কর্তারা আসতে নিষেধ করে দিয়েছে!

তাই!

হ্যাঁগো।

এবার বোঝ আমরা কোন সমাজে বাস করছি। কি জানো রূপালী? আমরা যতই বলিনা কেন মানুষের চেতনা বেড়েছে। যতই টিভিতে দেখিনা কেন ন্যাংটো শিশুটিকে আর শুনি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সমাজ বদলানোর ডাক। আসলে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেছি।

এভাবে চললে তো একা হয়ে যাব। তাছাড়া ঋষা বড় হচ্ছে। ওর মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে।

হয়তো হবে। তবে আমার মনে হয় সে প্রতিক্রিয়াটা প্রগতির।

আর কোনদিন এসব কথা রণজিৎ-এর কানে তুলেনি রূপালী। দরকারটাই বা কি। অঢেল সুখ তার। অঢেল টাকাও। তার যাবতীয় চাওয়া পুরণ হয়ে যাচ্ছে চাওয়ার সাথে সাথে। ইদানিং রণজিৎ যেন কম কথার মানুষ হয়ে যাচ্ছে। অন্তত বাড়ীর মধ্যে এবং গ্রামের মধ্যেও। সে যেন বেশী বেশী করে সময় দিচ্ছে পার্টিতে। তার সাথে বিভিন্ন কাজের ঠিকা নিচ্ছে। পয়সা আসছে প্রচুর।

কথায় কথায় রণজিৎ বলে—রূপালী, তুমি তো একটু আধটু বেরুতে পার। মহিলা সমিতিতে যোগ দিতে পার। এভাবে একঘেঁয়ে জীবনযাপন তো ভাল নয়।

গুরুত্ব দেয়নি রূপালী। পর্দানাশীন থাকাতেই তার পছন্দ। বলে—দরকার কি রানী লক্ষ্মীবাই বা মাতঙ্গীনী হাজরা অথবা ইদানীংকালে সোনিয়া, মমতা, মেধা, বৃন্দাকরাৎ হওয়ার। আমাকে আমার মত থাকতে দাও।

সত্যি এজন্যই তোমরা রয়ে গেলে মহিলা হয়ে। নারী হতে পারলে না।

দরকার নেই। বেশ আছি।

যদিও বাড়ীতে রূপালীর পর্দানশীন থাকাটা রণজিৎ-এর একান্তই কামনা। শুধু তাই নয় বাইরের সমালোচনা ঘরে আসুক এবং একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরী হোক রণজিৎও চায় না।

রূপালী কেবল দেখে দুহাতে পয়সা আসছে, যা দেখেনা তাহল আসছে অনেক কিছুই।

ফতিমা খোঁজ রাখে। ফতিমা হিসেব রাখে সলেমানের রোজগারের। কারণ সলেমান অশিক্ষিত। সলেমানের যা রোজগার, বহাল তবিয়তে চলে যাচ্ছে ছোট্ট সংসার। ব্যাংকেও জমা পড়ছে কিছু। সব পেয়েও বয়স ফতিমাকে উন্মন করে। তাকে হয়তো কিছুটা বেপরোয়া করে। কারণ সলেমান ফতিমার চাওয়া পুরণে অক্ষম। সলেমানের পাশে শুয়ে ফতিমা শারীরিক চাহিদার অপমৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিছুই জানতে পারেনা। অথবা জানতে চায়না সলেমান। কেননা একরাশ ক্লান্তিতে তার ঘুম পায়। মন চায়না। শরীর চায়না।

বুটন আসে। তার হ্যাংলাপনা সহ্য হয় না ফতিমার। স্বাভাবিক নিয়মেই এড়িয়ে চলে ফতিমা। শিবু আসে কেন যে। সে তার বৌকেই শাস্তি দিতে পারে না। অবাধ্য হয়ে বৌ মেলামেশা করে পাড়ারই দেবরের সাথে। সমস্ত গ্রাম তা জানে। শিবুও জানে। কিন্তু বিষহীন সাপতো ছোবল মারতে পারে না।

রণজিৎ আসে। ভাললাগে। কেন? সেকথা কেউ হয়তো জানেনা। জানলেও কারও সাহস নেই তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার। শ্রদ্ধা করে ফতিমা রণজিৎকে। তাকে প্রশ্রয় দেয়। বড় বড় কাজের ঠিকা পাইয়ে দেয় রণজিৎ। খুশি সলেমান। ফতিমারও কৃতজ্ঞতা বোধ কাজ করে।

দুজনের বয়স বাড়ছে। বাড়ছে আবু, ঋষাও। তবু যাওয়া আসা। হয়তো ভালবাসা। কিংবা নেশা।

আবু, ঋষা বন্ধু হয়ে গেছে সেই ছোট্টবেলা থেকেই। একসাথে খেলাধুলা, একসাথে স্কুলে যাওয়া। কোন কোনদিন এ ওর বাড়ী, ও এর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া। আপত্তি নেই কারুরই, বিশেষ করে ফতিমা, রণজিতের। রূপালীর চোখ, কান বন্ধ হয়ে গেছে আতিশয্যে। ওদিকে মন নেই। লক্ষ নেই ওরা বড় হয়েছে। পাড়াতে সমালোচনা হচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীরামপুর থেকে ফিরতি পথে চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে কানে এল অনেক কিছু কথা। সে কথাগুলো বোনা হয়েছে ঋষা, আবুর সম্পর্ক নিয়ে। আমাকে সবাই চেনে, আমিও চিনি। সবাই জানে আমার সাথে রণজিতের সম্পর্কের কথা, জানে সলেমানের বাড়ীর সাথেও আমার যোগাযোগ আছে। প্রশ্ন আসে মনে— ওরা কি আমাকে দেখেই সমালোচনা শুরু করল? তা না হলে থামছে না কেন? ভাবলাম এখান থেকে চলে যাই। অথচ মন টানলো না। কারণ সমালোচনার বিস্তৃতিটা জানতে ইচ্ছে করল।

চা দোকানী যেমন হয়, তেমনই। আগুনে মাঝে মাঝে ঘী ঢালছে।

লক্ষ্মী বলছে—সমাজটা কালে কালে হল কি।

সনাতন বলছে—নেতা তো! তাই সবই সাজে।

দোকানী বলছে—যাই বলো দাদা ওরা কিন্তু বেশ মানানসই।

সনাতন যেন জ্বলে উঠেছে—মানান সই বলে জাত, ধর্ম সব ছাড়তে হবে। যেমনি বাপ তার তেমনি বেটী।

লক্ষ্মী সনাতনের কানে কানে কি যেন বলল। সনাতন তাকাল আমার দিকে। তারপর থেমে গেল।

বুঝতে পারেনি দোকানী। সে বলে—আজকাল ওসব অচল। দাদা, তোমরাতো টিভি দেখ। ওখানে তো হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান বলে আলাদা কিছু নেই।

থামতে পারেনি সনাতন, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দোকানীর খোঁচা খেয়ে বাঘ হয়ে গেছে। তাহলে আর কি, তোমারও তো ছেলে আছে— লেলিয়ে দাও, একটা মুসলিম মেয়ের সাথে। যেমন সিনেমাতে হচ্ছে।

লাগছিল বেশ। ইচ্ছে করেই ওদের দিকে তাকিয়ে জোরে কাশলাম। ওরা বোধহয় বুঝতে পারলে আমার অস্বস্তির কারণ। আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে চলে এল শিক্ষাদীক্ষার প্রসঙ্গে। আমিও যেন নিশ্চিন্ত হলাম।

চা খেয়ে উঠে পড়লাম। চেম্বারে ফিরতে হবে। না জানি কজন বসে আছে অপেক্ষা করে। যদি নাও থাকে, রাত্রি হচ্ছে। এমনিতেই ফিরে যেতে হবে। ফেরার পথে কি মনে হল—একটু ঘুরপথে সলেমানের বাড়ীতেই গেলাম। গিয়ে দেখি আবু ভীষন মনোযোগ সহকারে পড়ছে। ফতিমা কাছে নেই। কোথায় ফতিমা?

জিজ্ঞাস করলাম আবুকে—তোমার আম্মা কোথায়? আবু পড়তে পড়তেই আঙ্গুল তুলে বুঝিয়ে দিল ঘরের মধ্যে আছে।

কিন্তু ঘর তো অন্ধকার। অন্ধকার কেন? গিয়ে টর্চের আলো ফেলে যা দেখলাম। তা হয়তো কানে এসেছে, কিন্তু বাস্তবে কোনদিন ভাবিনি।

ভীষণ ভয় পেয়ে ওরা উঠে পড়েছে। রণজিৎ বোধহয় বুঝতে পারছেনা কি করবে। আমি বুঝতে পারছিনা কি করা উচিৎ। যদি আগে বুঝতে পারতাম। বুঝবোই বা কি করে। বাইরে তো রণজিৎ-এর গাড়ী নেই।

দ্রুত বেরুনোর পথে আবুকে বললাম—চলিরে। আজ দেরী হয়ে গেছে।

মা-এর সাথে দেখা না করে চলে যাবেন।

হ্যাঁ, অন্য একদিন আসব।

চলে এলাম বাইরে। হাঁফ ছেড়ে হয়তো বাঁচল ফতিমা, রণজিৎ।

সমস্ত রাস্তায় রণজিৎ ছিল আমার মনের মধ্যে। যার অভ্যেস এতটুকুও বদলায়নি। সেই স্কুল জীবন থেকে। অথচ আজ তার মধ্যাহ্ন সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমের দিকে। পারু

এসেছে, ফতিমা এসেছে, রূপালী আছে। আরও হয়তো কেউ আছে, যাদের আমি জানিনা।

ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে রণজিৎ-এর প্রতি। সলেমানের প্রতি জাগছে করুণা। খারাপ লাগছে ফতিমাকে দেখে। কিন্তু কিই বা করার আছে। জীবনের এই দিকটা তো এমনই। আমরা কতটুকু খোঁজ রাখি। কতটুকু জানি। একজন রণজিৎ, ফতিমা, সলেমান তো শুধু নয়। অর্থ, মান, সম্মান তো জীবনের একমাত্র দিশা নয়। চাওয়া, পাওয়াময় মন তো আছে। না পাওয়ার যন্ত্রনা আছে। সে যন্ত্রনা থেকে মুক্তির বিভিন্ন পথ আছে।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ইচ্ছে করেনি বলে দেখা করিনি রণজিৎ-এর সাথে। দেখা করিনি ফতিমা ওরফে সিরাজের লুৎফার সাথে। দেখা হয় আবুর সাথে, ঋষার সাথে স্কুল ফেরার সময়। তাদের মধ্যে গল্পে মশগুল অবস্থায়।

একদিন স্কুল ফিরতি আবুর সাথে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম পড়াশুনা কেমন হচ্ছে? প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করে বসল আবু—

কাকু, আপনি আমাদের বাড়ী যাননি কেন? তারপর বলল—আজ চলুন।

বললাম—না না আজ নয়। অন্য একদিন যাব। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করলনা, ফতিমা কেমন আছে? অথবা রণজিৎ যায় কিনা?

আবু জেদ করতে শুরু করল—চলুন না কাকু। আব্বা বাড়ীতে আছে।

কেন? কাজে যায়নি?

না। দু-তিনদিন যায়নি।

কেন?

শরীর খারাপ।

কি হয়েছে?

জ্বর। তবে আজ ভাল আছে।

জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছে যাচ্ছেনা, কে দেখছে? আচ্ছা আবু, তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম পড়াশুনা কেমন হচ্ছে? বললে না তো?

ভাল।

ঋষার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

উচিৎ হয়নি হয়তো আবুকে প্রশ্নটা করা। কিন্তু ভীষনভাবে আমার মনটা চাইছিল বলে জিজ্ঞাসা করে দেখলাম। আবু লজ্জা পেয়েছে। তাহলে কি যা শুনছি তাই সত্যি। মনে মনে বলি, ঈশ্বর তাই যেন হয়। ভীষন মানাবে। আবার ভাবি—তাহলে সমাজ! ওরা মেনে নেবে তো? নাকি ঋষা, আবুকে হারিয়ে যেতে হবে সারাজীবনের মত।

ভাল লাগছে না এসব ভাবতে। কিন্তু আবু যে জেদ ধরেছে ওদের বাড়ী যাওয়ার জন্য। কি ভাবে এড়িয়ে যাব। সেই ভাবনাই সারা মন জুড়ে।

একটা ঘৃণা ফতিমার প্রতি আটকে দিল আবুদের বাড়ী যাওয়া।

বললাম—আজ নয় আবু, অন্য একদিন যাব। আজ একটু ব্যস্ত আছি।

হতাশ হাবু চলে গেল তার বাড়ী। হয়তো অনেক প্রশ্ন নিয়ে। রূপালীর মেয়েকে, রূপালীকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। একবার কি যাব ওদের বাড়ী। না থাক, কিন্তু মনটা যে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করছে। না চলেই যাই। ওরা তো কোন অপরাধে অপরাধী নয়। আবুও তো অপরাধী নয়। তাহলে ওর বাড়ী গেলাম না কেন? কি করা উচিৎ ভাবতে ভাবতে চলে গেলাম রূপালীর বাড়ী।

বাড়ীতে এসে দেখলাম রণজিৎ নেই। নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু রূপালী কোথায়? ঋষাতো আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখান। জিজ্ঞাসা করলাম মা কোথায়?

মা ওপরে।

আমাকে একরকম হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ঋষা। গিয়ে দেখি রূপালী রূপসজ্জায় বসেছে। বরোয়ারী মেলায় যাবে। আমাকে দেখেই রূপালী বলে ওঠে। বহুদিন পরে এলেন। বোনটাকে কি ভুলেই গেছলেন দাদা।

আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি কেন আসিনি। অথবা বলতে পারিনি তোমাদের ভুলে থাকা যায়না।

রূপালী বলে—দাদা বসুন! চা করছি।

না না, চা করতে হবে না, আমাকে ফিরে যেতে হবে। রোগীরা বসে থাকবে।

আচ্ছা দাদা। আমি অনেকবার আপনাকে এখানে আসতে দেখেছি। অথচ আমাদের বাড়ী আসেননি কেন?

কি বলব রূপালীকে। ওসব কি বলা যায়। প্রসঙ্গ বদলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—রণজিৎ কোথায়?

জানিনা। কোথায় কখন যায়, কোথায় থাকে, ওর খবর কে আর রাখে।

সত্যিই ওরা রাখেনা। রাখলেই বা কি হত। পারতো কি রণজিৎকে নিজের কাছে বেঁধে রাখতে?

ছাড়ল না রূপালী, চা খাওয়াল। একটু গল্প হল। সে গল্পে রণজিৎ নেই। কেবল আতিশয্যের সুপ্ত অহংকার, আর ঋষা।

বেরিয়ে পড়লাম রূপালীর বাড়ী থেকে। রূপালীও বেরুলো আমার সাথে। আমার ফিরে যাওয়ার পথেই বারোয়ারী মেলা। সেখানে আসে বিভিন্ন গাঁ থেকে বহু মানুষ। বিভিন্ন জাতের তারা। আদিবাসীরাও আসে।

পারুকে দেখলাম লখাইয়ের সাথে। মাথায় লাল ফিতে, পরনে লাল ছাপাশাড়ী, চোখে কাজল। আমাকে চিনতে পেরে কাছে এসে বলে—ডাক্তারবাবু। আমি পারু, চিনতে পারছু?

তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে হেঁড়ের গন্ধ। চোখ দুটো হালকা লাল। দু হাতে গাদাগুচ্ছের চুঁড়ি। পায়ে মোটা নপুর। তাকালাম পায়ের দিকে। পারু আবার চড়বড়িয়ে উঠল—কি গো ডাক্তারবাবু আমাকে চিনতে পারছু নাই?

হাসলাম আমি। পেরেছি।

তুবে। কুথা বুলছ নাই কিনে?

এইতো বলছি। তা তোমার সাথে কে এসেছে?

কিনে? ঐ তো আমার বনাই—লখাই এসিছে।

রূপালী দেখছে আমাদেরকে। শুনছে আমাদের কথপোকথন। কিছুটা অবাক হওয়া দৃষ্টিতে।

পারু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল—হুগো ডাক্তারবাবু। তুমার বন্ধু আসে নাই? উয়ার সাথে কিছু কুথা বলতম।

ভাগ্যিস রণজিৎ এর নাম বলেনি। বললে রূপালীর করা অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হত।

আমি আসছি পারু। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কার।

পারু বলে—ই বছর তুষু মেলায় যাবি তো?

না শোনার ভান করে চলে যাই অন্যদিকে। সঙ্গে রূপালী।

বললাম—রূপালী আমি আসছি।

আসবেন দাদা।

রূপালী আমাকে দাদা ভেবেছিল। কারন তার দাদা নেই, ভাই নেই। ওরা তিন বোন। রূপালী মেজ। বাপের বাড়ী গোবরুতে। বাবা ছোটখাট ব্যবসায়ী। শেফালী বড় বোন। বিয়ে হয়েছে মেদিনীপুরে এক শিক্ষকের সাথে। ছোট—মিতালী। বিয়ে হয়েছে বিষ্ণুপুরে। বর খুব বড় ব্যাবসায়ী। রূপালীই এসব গল্প করেছিল। দাদা, ভাই নেই বলে দাদার আসনে আমাকে বসিয়েছিল।

রূপালীর সঙ্গ ছেড়ে বাড়ীর পথ ধরে বেশ কিছুটা চলে এসেছি। আমার যাওয়ার পথেই পড়ে সলেমানের বাড়ী। তার বাড়ীর কাছাকাছি আসতে লক্ষ পড়ল রণজিৎ বেরিয়ে আসছে সলেমানের বাড়ী থেকে।

মুখোমুখি হতে বলল—কিরে অনিন্দ আজকাল যে আর দেখাসাক্ষাৎ করিস্ না?

কি নির্লজ্জের মত কথা বলল রণজিৎ। সে যেন ভুলেই গেছে কি ঘটেছিল। কি দেখেছিলাম।

তাই! বল্ কেমন আছিস্?

বললাম—পারুর সাথে মেলায় দেখা হল। রূপালীও ছিল। সে পারুকে দেখল।

মুখটা কেমন যেন বদলে গেল রণজিৎ-এর। দেখে মনে হল সে ভয় পেয়ে গেছে। হয়তো তার মনে হতে পারে—আমি রূপালীর কাছে পারুর প্রসঙ্গ তুলেছি।

কোথায় সে?

এখনও মেলায় আছে।

আমাদের বাড়ী আয়না। গল্প করা যাবে। কথাগুলো বলেই চলে গেল রণজিৎ। মেলার রাস্তা ছেড়ে ঘুরপথ রাস্তার দিকে।

দেখে মনে হল সে পারুর মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। তাই অন্যপথ ধরে পালানোয় ব্যস্ত।

বাড়ী আসতে আসতে দেখলাম শীলাবতীর যেখানে তুষুমেলা হয় ওখানে বেশ কয়েকজন আদিবাসীর জমায়েত। মধ্যমনি হয়ে বসে আছে সুখচাঁদ। তাদের মধ্যে বেশ একটা বিতর্ক চলছে মনে হল। চেষ্টা করলাম শুনতে।

সুখচাঁদ বেশ চিৎকার করে আমার অচেনা এক বয়স্ক আদিবাসীকে বলছে—আমার কুথার লড়চড় হবেক লাই। তুমরা আসছ খাওদাও ফুর্ত্তি কর। কিন্তু উকথা তুলবেকলাই বলে দিলম।

কোন্ কথা তুলতে বাধা দিচ্ছে সুখচাঁদ! তবে কি.......।

ওরা আমাকে লক্ষ করেনি। এগিয়ে গেলাম শীলাবতীর দক্ষিন পাড়ে জামগাছের তলায়। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আমার অপরিচিত লোকটি বলছে—ই আবার কিমন কুথা বটে। উয়ারা বড় হঈছে। লিখাপড়া শিখছে। উয়ারা একে অপরকে ভালবাসে। ইতে আপত্তিটা কুথায়। ই বিহা হবেক।

চিৎকার করে উঠল সুখচাঁদ—না হবেক লাই। ই সুখচাঁদ বুলছে, হবেকলাই। তুয়ার কি আছেরে? জমিন আছে? লাঙ্গল আছে। কড়ুই পতা ধান আছে, নাকি সার বছরের খাবার আছে? যে আমরা বেটিয়াকে বিহা দিবক?

এইভাবে তর্ক চলছে আর লোক বাড়ছে।

ধর্মা মাণ্ডী বলছে—এ্যা সুখচাঁদ ভাই। উ কথা ছাড়। ছিলে মেয়ে ডাগর হলে। লিখাপড়া করলে অমন হবেক। তুয়ার আপত্তি কিসেরে!

হ্য, তুয়ার কথা আরকি। আমার ছাগল আমি পঁদের দিকে কাটবক। তুয়ার কি?

হো হো করে হেসে উঠল জমায়েত লোকগুলো। তারপর থেমে গেল। সুরত্তির ছেলে, হপন হেঁড়ের বাটিগুলো এক এক জনের সামনে বসিয়ে রেখে সবাইকে বলল ইবার শেষ—বাবু বলে দিল।

ধর্মা মাণ্ডী বলল—কিনে রে হপন ব্যাটা। একটু রাত হলে ক্ষেতি কি? তুয়ার বাবুকে বল—আরও লি আস্‌তে।

সুখচাঁদ বলে—হ্য হ্য হোক আর একটু। সমস্যাতো লেগেই আছে।

রাইমণির সমস্যার সমাধান তখনও হয়নি। কিন্তু হেঁড়ের সমস্যার সমাধান হয়েছে। কারন মুখিয়া সুখচাঁদ বলেছে। কার বুকের এতবড় পাটা যে তার কথা অমান্য করে।

আমি চলে এলাম ওখান থেকে। ফিরে এলাম চেম্বারে।

রণজিৎ আগেই বলেছিল। 'আমরা শাখায় আলোচনা করে রেখেছি। দেখিনা সুখচাঁদ শেষ পর্যন্ত কি করে।' কথাটা মনে পড়ে গেল। মনে ধরার মত কথাই তো। দুটি প্রাণ রাইমনি, বাবুয়া এক হলে কি সুন্দর মানাবে। ওরা দুজনেই লেখাপড়া শিখছে। সংরক্ষিত চাকরীর নিয়ম অনুযায়ী ওরা চাকরী পাবেই। কিন্তু সুখচাঁদ ওসব বোঝেনা। তা না বুঝুক

মেয়েকে লেখাপড়া শিখাচ্ছে, আদিবাসী সম্প্রদায়ে এটাই বা কম কি। যখন বুঝতে পারবে তখন সবকিছু মেনে নেবে। এইসব ভেবে অন্তত শান্তি পেলাম।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না আমার। মনে পড়ে যাচ্ছিল সুখচাঁদের জেহাদ। মনে পড়ছিল রাইমণির মুখ। সুখচাঁদ মুখিয়া যত রূঢ়ই হোক না কেন, একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি ছিল তার। রাইমণির ছিল সরলতা। হপনকে মনে পড়ছিল। বাধ্য সন্তানের মত হেঁড়া নিয়ে আসছিল বাড়ীর থেকে শীলাবতীর চরে। যেখানে সভা চলছিল হেঁড়ের, সিদ্ধান্তের। সবকিছুই ভাল লাগছিল। হঠাৎ রণজিৎ এর মুখটা ওদের ভীড়ে চলে আসতে কেমন যেন মাথা ঘুরতে শুরু হল। মনে হল আমি শুয়ে আছি, পৃথিবীটা ঘুরছে আমার চারিদিকে। অস্থির, এলোমেলো, বিরামবিহীন। পাশে আমার স্ত্রী। সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করছিল অনন্ত ঘুমে।

হঠাৎ দরজায় কে বা কারা যেন ধাক্কা দিল। তারপর ডাকতে শুরু করল—ডাক্তারবাবু একবার উঠুন, আমি বাবুলাল।

কি অদ্ভুৎ ব্যাপার। আমার যত রোগী তার বেশীর ভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। তারা আমাকে ভাবত তাদের মারাংবুরু। আমি জানিনা, চিকিৎসাশাস্ত্র কতখানি রপ্ত করেছি। কখনও কাউকে বলিনা আমি সবকিছু জানি। আমি জানি আমার জ্ঞানের সীমা। আমার চিকিৎসার সীমা।

আমার স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলতে খুব খারাপ লাগছিল। বেচারার মুখটা কি করুন। কি শ্রান্ত। কি শান্ত। কিন্তু দায়ীত্ববোধ বাধ্য করল তাকে তুলতে। এত ক্লান্তিতেও তার বিরক্তি আসেনি।

দরজা খুলে বাবুলালের মুখে শুনলাম—তার স্ত্রীর পায়খানা বমি হচ্ছে। আমার জ্ঞানের সীমানা থেকে প্রস্তুতি নিয়ে চলে গেলাম তাদের বাড়ী। চিকিৎসা করলাম সমস্ত রাত্রি। সকালের দিকে সুস্থ হল বাবুলালের স্ত্রী। নিশ্চিন্ত হলাম। বাড়ী ফিরলাম। বাড়ী ফিরে দেখি এক আকাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে আমার স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘুমোও নি?

পারলাম না।

কেন?

এমনি।

আমার স্ত্রী এনা বাবুলালের স্ত্রীকে চেনে। চেম্বারে যখন আসে, বিশেষ করে আমার অনুপস্থিতিতে, কথা বলে তার সাথে।

এনা একদিন বলেছিল—জান, মেয়েটা আদিবাসী হলে কি হবে, ভীষন ভদ্র। বাঙালী ঘেঁষা। আমার বেশ ভাললাগে মেয়েটাকে। হয়তো ভাললাগার কারণেই তার অসুস্থতায় উৎকণ্ঠিত ছিল এনা। ঘুমোতে পারেনি সমস্ত রাত্রি। এবার সে নিশ্চিন্ত, তার সুস্থতার খবর শুনে।

অদ্ভুৎ মেয়ে এনা। কেউ কষ্ট পেলে তার যেন কষ্ট হচ্ছে, এমনই হয়ে যায় সে। দারীদ্রের যন্ত্রনা সে বোঝে বলেই ভালবাসে গরীবদেরকে। নিজে বিভিন্ন সমস্যায় অসুস্থ বলে উপলব্ধি করে অসুস্থতার যন্ত্রনা। কেউ অসুস্থ হলে এবং কষ্ট পেলে সে বারবার বলে—যা হোক ব্যবস্থা কর, বেচারা ভীষন কষ্ট পাচ্ছে।

আমি ভীষণ খুশিই শুধু নয় ভীষণ সুখী এবং গর্বিত এনার জন্য।

সকালে স্নানা সেরে আবার প্রাত্যহিকীতে মন দিই। এইভাবেই চলছিল একটির পর একটি দিন। রণজিৎদের বাড়ী আর যাওয়া হয়ে ওঠেনা। যেতে ইচ্ছে করেনা ফতিমার বাড়ী। কিন্তু যাদবপুর, হালদারবেড়, শ্রীরামপুর, বাগপোতা যাই। অবশ্যই প্রয়োজন হলে। যেতে যেতে দেখি আমাদের শীলাবতীকে। উদ্ভিন্ন যৌবনা অথচ একরাশ হতাশা। বালিগুলো রোদ্দুর খাচ্ছে মনের দুঃখে। পারের গাছগুলোতে নতুন পাতা গজিয়েছে। তারা দোল খাচ্ছে বাতাসের সাহচর্য্যে।

শীলাবতীর ঐ জায়গাটা যেখানে অহল্যাবাই রোড তার বুক চিরে চলে গেছে চন্দ্রকোনা ঘাটাল রাস্তায়। সেখানের চরে বিকেলে গাঁয়ের ছোট ছেলেরা খেলছে। বালি মাখছে সমস্ত শরীরে। মজুরেরা চরের বালি তুলে বোঝাই করছে লরি। সুখচাঁদরা মাঝে মাঝে হেঁড়ের আসর বসাচ্ছে দলবল নিয়ে।

এখন আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘ জমছে কালো হয়ে। বৃষ্টি নামবে। নদী ভরবে, ভরবে মাঠ। চাষাবাদ হবে মাঠে মাঠে। এমনই যে যার মত করে আসা। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে বৃষ্টি নামল না। যখন নামল তখন শ্রাবণের শেষ। জল আসছে নদীতে, নদী ভরছে, নদীর যৌবন আসছে। আসছে উন্মাদনা। শরীরে শিরশির। পারলে দুকূল ভাসাবে। সাদা হবে মাঠের পর মাঠ। তৃপ্তির আনন্দে খিল খিল হাসবে নদী। লজ্জা নারীর ভূষণ হলেও মানবে না কোন নীতিবাক্য। কেননা দীর্ঘদিন পরে সে মেতেছে রতিক্রিয়ায়। দীর্ঘদিন উপবাসের যন্ত্রনা তাকে পুড়িয়েছে। যেমন সুদীর্ঘ পরবাসে থাকা স্বামী ফিরে আসে তার স্ত্রীর কাছে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান শেষে যেমন স্ত্রী মেতে ওঠে না পাওয়ার যন্ত্রনা ভুলতে। আবার চলে যাবে একটি বৎসরের জন্য। আবার প্রতীক্ষা, না পাওয়ার যন্ত্রনা।

হঠাৎ এসেছে বাবুয়া, আসার কথা ছিল না। রাইমণির মনে আনন্দের নহবত। সুখচাঁদও জেনেছে। তার মনে আগুন জ্বলছে তীব্রতা নিয়ে। সে চায়না রাইমণির সাথে কোনরকম যোগাযোগ হোক বাবুয়ার। নজরবন্দি রাইমণি। তখন ভরন্ত নদী, ভাদ্রের মাঝ

বরাবর। সুখচাঁদ জেহাদ ঘোষনা করেছে। বাবুয়া এদিকে এলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেবে শীলাবতীর স্রোতে।

কথাটা কানে এসেছে আমার।

তখন রাত্রি ন'টা। হঠাৎ রণজিৎ এল আমার চেম্বারে। কোন ভূমিকা না করেই বলল—এই অনিন্দ শুনেছিস? সুখচাঁদ বলেছে বাবুয়াকে দেখলেই মেরে ফেলবে।

শুনেছি।

কি করা যায় বলতো?

আমি কি বলি বল্‌তো, তাছাড়া তোরা তো একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিস্।

তুই একবার যাবি?

কোথায়?

সুখচাঁদের বাড়ীতে।

কেন?

তোকে তো একটু অন্যরকম শ্রদ্ধা করে। যদি বোঝাতে পারিস্।

আরে না, না, ওসব শ্রদ্ধা টদ্ধা থাকলেও কিছু হবে না, বরং রাজনৈতিক ভাবে দেখলে কাজ হবে।

আসলে ভয়টা তো অন্য জায়গায়।

রণজিৎ এর অনুরোধ রাখতে সকালেই গেলাম সুখচাঁদের বাড়ী। সে তখন আকণ্ঠ হেঁড়ে খেয়ে নিজ মূর্তি ধারন করেছে। হাতে টাঙ্গী। চিৎকার করছে সুখচাঁদ—ইখানে সুখচাঁদই সব। কুনু বাপের ব্যাটা বেচাল কুরলে দুফাঁক করাঈ দিবক। উ কিনা লালগড়লে এসে হাতবাড়াইছে আমার বেটিয়ার লগে। কি আছে তুদের, জমিন আছে, লাঙ্গল আছে, হামার আছে? লিখাপড়ার গরম হঈছে না!

রাইমণি ঘরের মধ্যে বসে কান্নায় আকুল। তার কাছে কেউ নেই।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে রণজিৎ বলে—অনিন্দ্য, তুই একবার কথা বল। আমি আড়ালে আছি।

সরে গেল রণজিৎ। যেন কিছুই জানিনা। এভাবেই গেলাম সুখচাঁদের কাছে। বললাম— কি ব্যাপার দাদা, সাত সকালে কি এমন ঘটল, যে চিৎকার করছ?

কে ডাক্তারবাবু। বুসেন বুসেন। হঠাৎ যেন নরম হয়ে গেল সুখচাঁদ। সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করলাম—রাইমণি কি স্কুলে গেছে? দেখছিনা?

না

তা তুমি ভাল আছ?

অসুস্থভাল ত ছিলম। উ বাবুয়াই তো মাথাটা গরম করাঈ দিল।

সুস্থতার যবাক হওয়ার ভান করে জিজ্ঞাসা করলাম— তোমার বেটি?

বেটি হবেক কিনে। হই লালগড়ের পোলাটা। জান ডাক্তার বুলে কিনা—আমরা রাইমণিকে বিহা করবেক। কি আছে উয়ার।

সে কি। এতো খুব অন্যায়। তা ছেলেটি কি করে।

লিখাপড়া শিখছে গো, লিখাপড়া। ইখন লায়েক হইয়েছে।

তা ছেলেটি কেমন?

কিনে বলদিখিনি। অত জেরা কিসের? উ আমার বেটিয়ার যুগ্যি হল?

তা তোমার বেটি কি বলছে?

উ বুলবেক কি। মুখিয়া যা বলবেক তাই হবেক।

সে তো বটেই। কিছু না থাকলে আমাদের রাইমণিকে খাওয়াবে কি?

তুবে! তুই ইতক্ষণে হক কথা কইলি। তুই বলদিখিনি ডাক্তার। তুয়ারও তো বেটিয়া আছে। ছিলার ঘরে, জমিন যদি না থাকে। তুমি কি বিহা দিবেক সে ছিলাটার সাথে? দিবেক নাই। তাহলে, আমার দোষ কুথায়?

কিন্তু রাইমণির কথাও তো ভাবতে হবে। তাছাড়া সে লেখাপড়া শিখছে। তার মতামত বলে তো একটা ব্যাপার আছে।

ইটা তুয়ার কিমন কথা হল বটে। উয়ার বয়স কতটা। বুঝবে কি? আমি মুখিয়া আছি। কুত দেখলম। ভাববারে বিহাতে কেউ ভাল লাই। সুবাই জ্বলাঈ যাচ্ছে। আমার কথাই শেষ কথা। হবেক লাই।

সুখচাঁদ বশে আসেনি। রণজিৎদের চেষ্টাও বৃথা গেছে। বাবুয়া আর আসেনা।

দেখতে দেখতে এসে গেল তুষু মেলা। এখন আর তেমন জমাটি আসর বসেনা। মানুষের হাতে এতখানি সময় নেই। খরচ বাড়ছে দ্বিগুণ। মানুষ রুজিরোজগারের জন্য গতর খাটায় সমস্ত দিন।

বাগতী, দুলেরা খুব কম সংখ্যায় আসে। আদিবাসীদেরও একই হাল। পারুর বয়স বেড়েছে। কিন্তু বর জোটেনি। সবাই বলে লখাই ইচ্ছে করে তার বিয়ে দেয়নি। পারুর দিদি সুরতিমাই দেখছে তার ছেলে দুটোর দেখাশোনা করে, কাজ করে। পারু যা আয় করে সবটাই লাভ। লখাই একটু মেলামেশা করলে ক্ষতি কি!

পারুর ডাগর চোখের তলায় কালি জমছে। শরীরে টানটান বাঁধন আলগা হচ্ছে। হয়তো দীর্ঘশ্বাসে ভরা শীলাবতীর মত। তার চর জেগে আছে, সমস্ত বৎসর। চড়া পড়েছে নদীর গভীরতায়। তবু বর্ষার অপেক্ষায়। যেটুকু তৃপ্তি পাওয়া যায়।

বয়স বেড়েছে রণজিৎ-এর। তবু তাকে টানে তুষু মেলার সন্ধ্যাটা। বছরে ঐ একটি সন্ধ্যায় পারু ছট্‌ফট্ করে। রণজিৎ ডাকতে আসে আমাকে। এড়িয়ে যেতে পারিনা। আমি তো জানি ঐ দিন আমার কি কাজ। রণজিৎ এর কি কাজ।

যথা সম্ভব সেজেছে পারু। হেঁড়ে খেয়েছে। তার চোখে নেশা। তখনও সে সমানে তাল মেলাচ্ছে। পাক ধরে যাওয়া বাউরি চুল লখাই এর সাথে। খিলখিল হাসছে

সুরতিমাই। সামনের দুটো দাঁত নেই। সুরতির ছেলে মেয়েও বড় হয়েছে। তারাও মেতেছে তুষু মেলায়।

আমি দাঁড়িয়ে আছি শীলাবতীর দক্ষিণ পারে। সাথে রণজিৎ।

পারু এসেছে, শ্লথ তার গতি। পা দুটো টলছে একটু একটু করে। বলে—এ্যাই ডাক্তারবাবু। তুকে তো কুনদিন খাওয়ানা গিলনি। তুয়ার মন লাই ইসবেও। উখানেই থাকে।

বললাম— বেশতো দেখছি। তোমরা আনন্দ করছ। গান গাইছ........

হ্যাঁ, ইয়ার নাম তুষু সেরেঙ্গ। আমাদের মারাংবুরু আছে। মাঠে মাঠে ধান ফলবেক, ঘরে ধান আসবেক, মউর তুষুর লগে। উয়াকে সাজাব, উয়াকে লতুন কাপড় পরাব, লখাই সেরেঙ্গ ধরবে। সেরেঙ্গে জুড়া হবে খেউর। কিনে জান। বাগতী, দুলা গুলান আমাদের তুষুকে বড় খারাপ কুথা বলে।

কেন?

উয়াদের স্বভাব।

তোমরাও তো বল।

উয়ারা বলে যে। একটু থেমে যায় পারু। সে উদ্যমতা হয়তো নেই। নইলে এতক্ষণ চলে যেত রণজিৎ কে নিয়ে। হয়তো রণজিৎ এরও নেই, সেও ছট্‌ফট্ করছেনা।

সুরতি ডাকল রণজিৎকে— এ্যা রনভাই। ইখানে আয়না কিনে। শুধু দাঁড়াইঙ্গ থাকলে হবেক।

পারু বলে—যা না কিনে। দিদি ডাকছে।

রণজিৎ চলে যায় সুরতির কাছে। সুরতি হেঁড়ের বাটি ধরিয়ে দিচ্ছে রণজিৎকে।

পারু বলে—জানু ডাক্তারবাবু। তুবে বলতে দোষ লাই। রাইমণির জীবনটাকে উয়ার বাপটাই শেষ করেঙ্গ দিবেক।

ওকে তো দেখছি না।

সুখচাঁদ খুড়া আসতে দেয় নাই।

কেন?

সেটাই তো বলছি। পাছে বাবুয়ার সাথে দেখা হইঙ্গ যায়।

বাবুয়াও তো আসেনি?

আসবেক কি করে। আসলে হইযে দেখছু বুড়া সুখচাঁদ কে, উয়ার হাতে আছে বিষ টাঙ্গি। কাটাইঙ্গ দিবেক বাবুয়াকে।

তোমরা প্রতিবাদ করতে পারনা?

কার বুকে পাটা আছে। উ সবাইকে এক কোপে রাখাইঙ্গ দিবেক। উয়ার মায়া দয়া লাই। কসাই বটে। ইখন তো পাটি আছে, না হলে গিরা ডাকাইঙ্গ একসকার করাইঙ্গ দিত।

রাইমণি। বাবুয়ার জন্য তোমাদের মন খারাপ হয়ে যায়, তাই না?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে পারু। কত সেরেঙ্গ লিখত রাইমণি, সুর দিত, আমাদেরকে শিখাত। কুত গল্প বুলত।

পারুকে দেখছিলাম দু চোখ ভরে। আর ওদের জীবনবোধ, অসহায়তা। আনন্দ বেদনার ছবি।

পারুর চোখেমুখে অনেকখানি শূন্যতা। চাওয়াপাওয়ার অস্থায়ীত্বভরা। পৌষের শীতের মত সবকিছু জুবুথুবু। চেষ্টা করছে একটু আগুনে উত্তপ্ত হওয়ার। তারপর আবার শীত, সবকিছু শীতল। ঠিক নদীটির মত।

সন্ধ্যে নামছে ধীর লয়ে। চলে যাচ্ছে বাগদী, দুলেদের দল। অস্পষ্ট হচ্ছে নদীর বুক আর তার হাহাকার। সামনে বাঁশ, জাম, মাদারের বন। ওখানে পেঁচা ডাকছে—ক্যারর ক্যারর শব্দ তুলে। কয়েকটা কুকুর চিৎকার করে উঠল— ঘেউ, ঘেউ। ঘেউ ঘেউ। নদীর ধারে ধারে গর্তে শৃগালগুলো বাইরে বেরিয়েছিল খাবার খোঁজে। কুকুরের ডাক শুনে তারাও হুক্কাহুয়া শব্দ তুলে ছুটছে প্রাণপনে।

পারু ছুটছেনা। মানব মানবীর অতল স্পর্শ মনের রহস্যের সমাধানের খোঁজে। তার মনের গহন অরণ্যে ধূসরের পোচ। সবুজের গন্ধ হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রতিস্থাপিত হচ্ছে অন্য এক জীবনের বিস্ময়কর জগৎ। যা ছিলনা। যা কল্পনায় আনেনি কিছুদিন আগেও।

আমিও দেখিনি আজকের পারুকে। গত বৎসরেও। দেখেনি এমন বিবর্ণ চোখ। ক্ষুরধারহীন। তার বুকে স্তম্ভিত বিগত ইতিহাস। নেতিয়ে পড়া ঝলসানো গাছের পাতার মত। মনটাও কি ঝলসে গেছে! হয়তো, কিংবা নাও হতে পারে। অথবা শুরু করেছে বসন্ত শেষে বেহাগের মত।

বললাম—পারু।

যেন চমকে উঠল পারু। তারপর ধাতস্থ হয়ে একটু দূরে রণজিৎ-এর দিকে তাকিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল—রণজিৎ ভীষণ ভাল। আজও উয়ার মনের মধ্যে আমাকে রাখিছে।

পারু কি রণজিৎকে দেখছিল। শেষ অবলম্বন ভেবে। শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ভেবে অথবা সূর্যের বিদায়বেলায় পশ্চিমের সৌন্দির্য ভেবে।

আবার যেন আত্মস্থ হয়ে গেল পারু। ওদিকে আজ যেন অনেক বেশী হেঁড়ে খাচ্ছে রণজিৎ। নাকি নির্ভয়। রূপালী বাড়ীতে নেই বলে। বিগত কয়েক বৎসর এত খেতে দেখিনি। যেমন দেখিনি পারুকে। আমার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে। ডাকলাম—পারু!

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু।

তুমি রণজিৎকে খুব ভালবাস, তাই না।

হাসল পারু। সে হাসিতে অহংকার, সে হাসিতে অদ্ভুত বিমর্ষতা। সে হাসিতে ফুরিয়ে যেতে চাওয়া স্বাদের শেষাংশ।

কাউকে বিহা করার মন টানল না ডাক্তারবাবু। উনেক এসেছিল। লখাইও আমাকে ভালবাসে বটে। আমার ভাললাগে রণজিৎকে।

আমার মনে আর কোন প্রশ্ন জাগেনি। কেবল দেখছিলাম, নাকি স্বপ্ন দেখছিলাম—পারু অপূর্ব সুন্দরী। তার চোখেমুখে মায়াবী সম্মোহন। আর যে কোন পুরুষের জ্বলেপুড়ে যাওয়ার ইচ্ছা।

হঠাৎ বদলে গেল পারু। সেই চেনা পারু। রণজিৎ আসছে। রণজিৎ ধরেছে পারুর হাতে। পারু উচ্ছল, ভাটার মতো উচ্ছল। ওরা দুজনে চলে গেল সামনেই, ক্ষেতে। আমি অপেক্ষায়। রণজিৎ আসবে। ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছিল। আসছেনা কেন? গিয়ে দেখব? না থাক। কিন্তু আমার দুটো পা যেন কথা শুনছিল না। চলে এলাম ওদের কাছে।

যা দেখলাম, কেবল অবাক হওয়ার পালা। পারু বসে আছে, তার কোলে রণজিৎ-এর মাথা। হয়তো অতিরিক্ত নেশায়। পারু একাই বলে চলেছে—ই জীবনটা তুই লিয়ে লিলি রণজিৎ। ই জীবনটা তুয়ার জন্যেই। তুই কিনে যে এলি!

তারা কাটাকুটি খেলায় মাতেনি। চড়া পড়ে যাওয়া নদী কথা বলছে তার পারের সাথে। কেন বাঁধ হয়ে রয়ে গেলি।

ডাকলাম—পারু!

হ্যাঁ বাবু, ইবার যাতি হবেক। তুই রণজিৎকে তুল না কিনে। উযে উঠছেক লাই।

আজকের পারুকে দেখে মনে হল—এ রূপালীর থেকেও অনেক অনেক ভাল। ভালবাসাও ভীষণ গভীর। রূপালীর ভালবাসার থেকেও।

জানু ডাক্তারবাবু, ই বছরটা বোধহয় শেষ বছর।

একথা কেন বলছ পারু?

কিনে কে জানে। মনটা বুলছে, তাই............

আগের বছর তুই দেখবি, পারু লাই। পারুর গলায় তুষু সেরেঙ্গ লাই। হুই শীলাবতীর চরে হয়ত আমার কাঠগুলান থাকবেক, সব পুড়াপুড়া, কাল কাল।

টর্চ জ্বেলে দেখলাম। পারুর চোখে জল। নেশা নেই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তখনও রণজিৎ শুয়ে আছে পারুর কোলে মাথা রেখে।

রাত্রি তখন দশটা। আমার ডাক্তারখানায় জমে থাকা রোগীরা অপেক্ষা করে ফিরে গেছে। রণজিৎ চলে গেছে তার বাড়ী। ডাক্তারখানা বন্ধ করে আমি আমার ঘরে ঢুকছি। অন্যান্য দিনের মত খাওয়া দাওয়া সেরেছি। কিছু গল্প। কিছু হাসি ঠাট্টায় কেটেছে খাবার সময়। তারপর বিছানায়। ঘুমিয়ে গেছে আমার মেয়ে, স্ত্রী। আমার কাছে রাত্রিটা যেন অন্য রাত্রি। কেবল বিনিদ্র উদ্‌যাপনের। চোখের তারায় পারু। মনের অন্দরমহলে পারু। ঘ্রানেন্দ্রিয়ে পারুর মুখনিসৃত হেঁড়ের ঘ্রাণ। সবাইকে কেন্দ্র করে অবর্তিত হচ্ছে পারুর কথা কটি। "আগের বছর তুই দেখবি পারু লাই। পারুর গলায় তুষু সেরেঙ্গে লাই। হুই শীলাবতীর চরে হয়ত আমার কাঠগুলান থাকবেক। সব পুড়াপুড়া কাল।"

কি অদ্ভুৎ এক প্রেমের উপাখ্যান। স্থায়ীত্ব নেই। বাঁচার আশা নেই। সে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন একই বিছানায় নয়। শুধু একটি সন্ধ্যা, সে সন্ধ্যা তুষুগানের, পৌষসংক্রান্তিতে। একটি সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ মিলন। মনে রাখা সমস্ত বৎসর। তারপর অপেক্ষা। পারুর জীবনের বৃত্ত। তবে কি পারু জেনেছে সে আর বাঁচবে না। পারুর চোখের তলায় কালি কেন। কেন আলগা হয়ে যাওয়া মাসংপিণ্ড!

একটা বৎসর কেটে গেল সময়ের সারণি বেয়ে। পূজোর গন্ধ বাতাসে বাতাসে। শীলাবতীর তীরে কাশের বনে ভিজে হাওয়া। আনন্দে দোল খাচ্ছে সাদা সাদা কাশফুল। নলবনেও বাতাস ছুটছে সন্ সন্ শব্দ তুলে। নদীতে জল, হাঁটুর নিচে। তার বয়ে চলার শব্দ—কুল, কুল, কুল কুল। আর কিছুদিন পরে সে জলটুকুও থাকবেনা। আবার অপেক্ষা করবে শীলাবতী আগামী বরষার জন্য।

নদীর পারে আমার বুড়ো গাড়ীটা আমাকে আরোহী করে চলেছে শ্রীরামপুরের পথে। হালদারবেড় গ্রামটাকে বাঁয়ে রেখে যেতে যেতে গাড়ীর আয়নাতে দেখি একটা লাল রঙের মোটর বাইক আসছে খুব দ্রুত গতি নিয়ে। গাড়ীর গতি কমিয়ে দাঁড়ালাম রাস্তায়। বুঝতেই পেরেছিলাম—ঐ গাড়ী রণজিৎ এর ছাড়া অন্য কারও নয়।

পাশে এসে দাঁড়ালো রণজিৎ। তার চোখে মুখে অস্থিরতা। বলল—অনিন্দ, একবার আমার সাথে যাবি?

কোথায়?

লখাই এর বাড়ী।

কেন?

পারুর ভীষণ জ্বর। চিকিৎসা চলছে, কিন্তু কমছে না। এখন অবস্থা খুব খারাপ।

কতদিন জ্বর হয়েছে?

প্রায় একমাস।

সে কি! কিন্তু আমি কি করব?

চলনা। অন্তত একবার দেখে কি করা যায় বলে দিবি।

লখাইএর বাড়ীতে গিয়ে দেখি মুখিয়া সুখচাঁদ বসে আছে গালে হাত রেখে। সুরতির চোখে জল। বিভ্রান্ত লখাই।

একটা ওঝা নিম পাতার গুচ্ছ নিয়ে ঝাড়ছে পারুকে। এই বিংশ শতকের শেষেও!

পারুর চোখ শীলাবতীর পারে কাশফুলের দিকে। সে কয়েক বছর আগে লেখা রাইমণির তুষু সেরেঙ্গ গাইছে সুর করে—

তুষু আমাদের
ভাল বটে
কুনুই ক্ষতি করেনা
তবু তোরা দিবি খেউর
কিসের জ্বালায় বলনা।
উয়া ডাগর ডাগর
চোখের কোণে
জলের ধারা বইছেরে
বুঝবি সে দিন
তুয়াদের ছেড়ে
তুষু চলে যাবেরে।

পারুর কাছে গিয়ে ডাকলাম—পারু। পারু তার ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল—শীলাবতীর চরলে আমাদের তুষু আয়রে। তুয়ারে সাজাব লতুন সাজে, বসাব আমার বুকের মাঝে। ধান ভাঙ্গব, ভাত রাঁধব, খাবি তুই লিজের ভেবে, আমাদের সাঁওতাল ঘরে। থেমে গেল পারু। তার দুচোখ বেয়ে নামছে জল। একটা হাত যেন কোনকিছু খুঁজছে। রণজিৎকে ঈশারা করলাম। কাছে গেল রণজিৎ। ডাকল—পারু! সামনেই বসেছিল লখাই। তার ডান হাতটা লখাইয়ের দুটো পা স্পর্শ করল, স্পর্শ করল রণজিৎ এর দুটো পা।

হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল পারু। বলল—ডাক্তার! তুয়ার মনে আছেই পারুকে?

কিছু বলতে পারিনি। কোন কিছু বলার সুযোগ দেয়নি পারু। চোখদুটো বন্ধ করল সারাজীবনের মত।

কান্নার রোল উঠল পাড়ায়। সুখচাঁদ হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল—পারুরে, তুই যে আমার বেটিয়ার মতন রে। ই বুড়হা বাপটাকে ছেড়ে চলেঙ্গঁ গেলি।

আমি ওখানে থাকতে পারিনি। পারিনি গোটা পাড়ার শেষ দৃশ্যের সংলাপ শুনতে। আমি চলে এলাম মাথা নিচু করে। রণজিৎকে থাকতে বলল মুখিয়া সুখচাঁদ। কারণ কাঠ চাই। ওদের কাঠ নেই। গাছ নেই বলে। তাছাড়া রণজিৎকে তো থাকতেই হবে। কারন সে ওদের এলাকার জননেতা। পারুর ভালবাসার পাত্র।

সূর্য হেলে গেছে মধ্য আকাশ থেকে। বাতাস বইছে না একটুও। কাশফুলে দোলা নেই। সবাই যেন নিরবতা পালনে রত।

যেতে যেতে ভেবেছি কতবার। জীবন কি অদ্ভুৎ। কত অস্থায়ী। সমস্ত চাওয়া পাওয়া, আদান প্রদানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আশা জাগিয়ে চলে যায় একবুক হতাশার ছোঁয়া প্রতিবেশীদের শরীরে ছিটিয়ে দিয়ে। এইভাবে চলে যাবে সবাই। কিছুদিন মনে রাখবে অনেকেই। তারপর বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাবে কোন প্রিয়দর্শিনী। কোন সুপুরুষ অথবা কোন বদ্‌লোক, কলঙ্কিনী।

রয়ে গেছে রণজিৎ দায়িত্বের প্রশ্নে। রয়ে গেছে রণজিৎ তার এক প্রিয়তমার প্রয়াণে শেষ কাজটুকু সেরে নিতে।

ভাবতে ইচ্ছে হয়, রণজিৎ কি শুধুই নারীপিপাসু। নাকি ওর মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত ভালবাসা। শুধু কামনা নয়। আগুনে পুড়ে যাওয়া নয়। সে ভালবাসা হতে পারে বহুগামী পারুর প্রতি, ফতিমার প্রতি, রূপালীর প্রতি অথবা আরও অন্য কারুর প্রতি। কিন্তু খাদহীন, হৃদয় থেকে উৎসারিত।

তাই যদি না হয়, তাহলে কি দরকার ছিল সলেমানের জন্য কাজ জুটিয়ে দেওয়ার। যাতে করে স্বচ্ছলতায় চলে যায় ফতিমার সংসার। কেনই বা সে প্রায় প্রতিদিন ফতিমাকে না দেখে থাকতে পারতনা। অথবা ফতিমার সাথে কেউ মিশলে অভিমানে ভরে যেত মন।

ফতিমারও বয়স হয়েছে। কিছুটা হলেও হারিয়েছে তার সৌন্দর্য। পারুর তো অনেক আগেই হারিয়েছিল। রণজিৎ-এর যা চেহারা, এখনও যা সৌন্দর্য এবং তার প্রতি কোন কোন সদ্য বিংশ শেষ মেয়েদের যে হাতছানি তাদের এড়িয়ে কেন সে চলে আসে ফতিমার কাছে। কেন সুমধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে সমস্ত শরীরে চর্বি জমে অপহৃত সৌন্দর্য রূপালীর সাথে।

ভালবাসা আসলে এমনই। ভালবাসার জাত নেই, ধর্ম নেই, বয়স নেই, সুন্দর, সুন্দরী আলাদা কিছু নেই। এ সত্য অস্বীকার করার কারও ক্ষমতাও নেই। তবু বিভাজন, তবু সন্দেহ, সেখান থেকে সৃষ্ট ঝড় এলোমেলো করে দেয় অনেক কিছু। মুখিয়া সুখচাঁদ মানতে চায়না বাবুয়াকে। রূপালীর কানে ফুসমন্তর দেয় শিবুর বৌ। যে অন্য এক পুরুষের সাথে শরীরী খেলায় মত্ত। ফতিমা ভালবাসে নাকি কৃতজ্ঞতা বোধ তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। কে বলে দেবে।

দাপুটে রণজিৎ, বুঝতে দেয়না কোন কিছু। তবু ধরা পড়ে যায় আমার কাছে। সে পারুর প্রয়াণে এক বুক ব্যাথা নিয়েও স্বাভাবিকতা বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টায়। কেন?

চার বছর কেটে গেছে। বদলে গেছে অনেক কিছু। সনাতন মুর্মু মরে গেছে পারুর দুঃখ ভুলতে না পেরে। সে তো পারুর বাবা। লখাই দুমড়ে মুচড়ে গেছে। শীলাবতীর দুপার সবুজ ছিল। বিবর্ণ হয়ে গেছে। কারণ গাছগুলো কেটে নিয়ে গেছে ফড়েরা। নদীর গর্ভে আরও বালী জমেছে। পারুর স্মৃতিও বিবর্ণ হয়ে গেছে তাদের পাড়ায়। রাইমনি স্কুল ছেড়ে পাড়ী দিয়েছে কলেজে। বাবুয়া স্নাতক হওয়ার পথে।

বদলায়নি সুখচাঁদ। সরে দাঁড়ায়নি তার অহংকার আর জেদ থেকে। বদলায়নি সরকার। মানুষ বদলায়নি বলে।

রূপালী এখন বেশীর ভাগ সময় তার ঠাকুর ঘরে কাটায়। ঋষা বড় হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের দোরগড়ায়। আবু কলেজে যাবে।

কানাঘুষো এসেছে প্রকাশ্যে। একদিন রণজিৎকে বলি—হ্যাঁরে কি সব শুনছি?

আমিও শুনেছি।

কি ভাবছিস্?

আমি ওসব মানিনা।

কিন্তু রূপালী।

ও আর কি বলবে। আমিই শেষ কথা বলব।

সমাজ?

ভালবাসা অনেক বড়।

তা বলে একজন মুসলমান আর হিন্দু।

রক্তটা তো লাল। একই রক্তকণিকা দিয়ে তৈরী।

ফতিমা, সলেমান ওরা মেনে নেবে?

না নেওয়ার কি আছে। তাছাড়া ওদের মধ্যে এমন কিছু হয়ে যায়নি যে........।

বুঝলাম। রণজিৎ আর যাই হোক তার আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াবেনা। গর্ব হচ্ছিল। ভাবতে ভাল লাগছিল। বিভিন্ন সংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামেও এমন কেউ কেউ আছে যে বা যারা সংস্কারের নামে বজ্জাতিকে আমল না দিয়ে গুরুত্ব দেয় সত্যিকারের ভালবাসাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় তুষু মেলাকে আর কয়েকদিন বাকী। পৌষের শেষ অথচ তেমন শীত নেই। কিছুটা গুমোট আবহাওয়া। রণজিৎ ডাকল, অনিন্দ! আজ দেখছি কেউ নেই। চল একটু ঘুরে আসি।

কোথায়?

শীলাবতীর ধারে।

হঠাৎ!

কয়েকদিন পরে তুষুর আসর বসবে। অথচ পারু নেই। তাই মনটা খারাপ লাগছে। চলে এলাম রণজিৎ এর সাথে। বসলাম শ্মশান ঘাটের বাঁকটায়। কেউ কোথাও নেই।

অন্ধকার রাত্রি। কয়েকটা শৃগাল দলবদ্ধভাবে চলে গেল আমাদেরকে দেখে দেখে। তাদের চোখগুলো যেন জ্বলছিল।

দেখছিস্ অনিন্দ। ব্যাটাদের সাহস। কেমন হেলে দুলে চলে গেল আমাদের সামনে দিয়ে।

তাই তো দেখলাম।

হঠাৎ শুনতে পেলাম নাকি বিভ্রম বুঝলাম না—একটা মেয়ে যেন কাঁদছে। রণজিৎকে বললাম—এই রণজিৎ। শুনছিস্।

কি?

একটা কান্নার শব্দ।

রণজিৎ তখন তার ব্যাগে রাখা স্কচ্ বের করে ঢালছে দুটো গ্লাসে। বলল—কই আমার কানে এল নাতো।

সেকি, আমি কি ভুল শুনলাম!

হয়তো তাই।

অথচ আমার কানে আসছে একটানা কান্নার শব্দ। গায়ে কাঁটা আসছে। আমি ঘামতে শুরু করছি। তখনই রণজিৎ আমার হাতে ধরিয়ে দিল স্কচের গ্লাসটা। গোগ্রাসে পান করে রণজিৎ-এর সামনে রাখা বোতল থেকে আমার গ্লাসে ঢাললাম বেশ কিছুটা। পান করলাম খুব দ্রুততায়। রণজিৎ দেখছে আমাকে। হয়তো অবাক হচ্ছে। কেননা এভাবে কোনদিন খাইনি।

আমি চেষ্টা করছি সবকিছু ভুলতে। ঠিক তখনই একটা বিড়াল আমার থেকে কয়েক ফুট দূরে ডেকে উঠল ম্যাউ, ম্যাউ। হাসল রণজিৎ, অনিন্দ এবার বুঝতে পারছিস্ কার কান্না?

এটাই যদি হয় তাহলে তুই শুনতে পাস্নি কেন?

হয়তো অন্যমনস্ক ছিলাম।

মদ্যপ মনে ঢুকে গেল বিড়ালের কান্না। কিছু লজ্জা বোধ ভর করল মনে। আমার কুসংস্কারচ্ছন্ন মনটার জন্য।

বিড়ালটা আমাদের কাছ থেকে সরে গেল না। বসে রইল ভিজে বেড়ালের মতই। রণজিৎ বেশ কয়েক পেগ খেল। আমিও খেলাম।

ফুরফুরে হয়ে যাচ্ছিল মনটা। শীত এমনিতেই প্রায় ছিলনা। এখন গরম লাগছে। রণজিৎ তার সোয়েটার খুলে ফেলল। আমি খুলে ফেললাম আমার সোয়েটার।

সিগারেট ধরাল রণজিৎ। আমাকেও দিল। কয়েক টান নেওয়ার পর রণজিৎ বলল—অনিন্দ।

তার গলা যেন বিগত স্মৃতি রোমন্থনে ভারাক্রান্ত। অথবা বন্ধু হয়ে বন্ধুত্বের প্রতি অবিশ্বাসের আবহাওয়াকে সরিয়ে দক্ষিণা সমিরণে অবগাহনের প্রচেষ্টা।

বল?

আমাকে তুই ঘৃণা করিস্, তাইনা!

এ কোন্ রণজিৎকে দেখছি। যে কোনদিন কাউকে কৈফিয়ৎ দেয়না। নিজের প্রতি অগাধ যার আস্থা। নিজেকে মনে করে সমাজের শ্রেষ্ঠ অত্যাধুনিক মানুষ। যে কুসংস্কার মানে না। তার গলায় এ কোন বেহাগ।

আমি নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিনা। মনে হচ্ছে সেই কান্নার আওয়াজ যা স্কচ খাওয়ার আগে শুনেছিলাম। নেশাটা জমছে আস্তে আস্তে স্কচের ধর্ম অনুযায়ী। বাতাসের সান্নিধ্যে এসে। ইচ্ছে করছে নিজের শরীরে চিমটি কেটে দেখি। শরীর সংবেদন কিনা! তাকিয়ে আছে রণজিৎ আমার চোখের দিকে।

রণজিৎ! তুই নিজেকে ভীষন অপরাধী ভাবছিস্, তাই না?

Please অনিন্দ। আমার প্রশ্নের উত্তর দে। কেন মাঝে মাঝে তুই আমাকে এড়িয়ে থাকিস্, কেন রূপালী আমাকে প্রশ্ন করেনা। যা শুনেছি, তা কি মিথ্যে?

তোর নেশা হয়ে গেছে রণজিৎ।

না অনিন্দ। আজ তোকে বলতে হবে। তুই আমাকে ঘৃণা করিস্ কিনা?

যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে..........।

কিছু মনে করব না। কারণ.............।

বাধা দিলাম, সিদ্ধান্তে আসার প্রয়াসে। শেষ করতে দে রণজিৎ।

তার মানে?

যদি বলি না।

কেন না। না কেন? আমি যে অনেক অন্যায় করেছি অনিন্দ। আমার চরিত্র....

তোর বোধ কি তাই বলছে?

জানিনা।

তাহলে বলছিস কেন?

আজ তোকে বলছি অনিন্দ। পারুকে আমি ভীষণ ভালবাসতামরে।

জানি। রণজিৎ এবং আজ যে তুই এখানে এনেছিস্ তার কারনও জানি।

বল তুই। এটা কি অন্যায় নয়। আমি তো জননেতা। জননেতার কি উচিৎ কোন অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া? যেখানে তার স্ত্রী বর্তমান। সে রূপসী।

আজ তোকে বোঝাতে পারব না। কেননা আমার সে মানসিক অবস্থা নেই।

তুই মাতাল হয়ে গেছিস। মাতাল, মাতাল।

হয়তো তাই।

না। অনিন্দ রায় মাতাল হয়না। সে আরও আরও অনেক খেয়েও মাতাল হয়নি। অনিন্দ রায়কে আমি জানি। অনিন্দ রায় সব বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে আছে। সে সবার বঞ্চনায় আহত হতে হতে পাথর হয়ে গেছে। ধারাল পাথর। কেবল প্রত্যাঘাৎ হানার অপেক্ষায়।

আচ্ছা অনিন্দ। পারুর মধ্যে কি ছিল বলতে পারিস। আর তার তুষু গান। বলতে পারিস অনিন্দ, তার জীবনের শেষ তুষুতে কেন গাইল—আমার তুষু থাকবে ঘরে, আমার সাথে, একা একা। সবাই যখন যাবে ছেড়ে, উয়ার লগে মন কেমন করে। আসত, যেত ই মেলরে। জমিন ধারে, নিজের করে লিত মোরে। ইখন কার তরে আসবে চরে, আমায় বলনা তুষু। যখন আমি যাব চলে।

জানিস্ অনিন্দ? গানটা লিখেছিল রাইমণি। সে কি জানত পারু সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে।

তোকে পারু বলেছিল?

বলেছিল নয়। কাগজে লেখা ভাষাগুলো আমাকে দিয়ে পাঠ করিয়েছিল। দুবার পাঠ করার পর মুখস্থ করে নিয়েছিল পারু।

রণজিৎ।

বলনা।

পারু তোকে ভালবাসত, তাই না।

হয়তো।

শেষ বার তোরা শরীর খেলায়...............

না অনিন্দ না। শেষবার সে বার বার বলেছিল—বলনা কিনে রণজিৎ, তুই আমাকে ভালবাসু। আমি মরাঙ্গঁ গিলেও শান্তি হবেক।"

বলেছিলাম—বাসি পারু।

আমার মাথা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল—ই বুকটা জুড়াঙ্গি গিল। ইবার আর দুঃখ লাই। অনেকটা সময় আমার মাথা চেপে রেখেছিল তার বুকে। অনেকটা সময়। তারপর কেন কে জানে আমাকে প্রনাম করল পারু। তারপর বলল—এ্যাই, ইবার থেকে তুই আমাকে ভুলেঙ্গঁ যা।

কি বলছিস পারু।

তুয়ার বহু আছে। ছিলা আছে!

কিন্তু...........

আমি ত জানলম বটে, তুই আমর।

জানিস অনিন্দ তখন আমি জানতামনা পারুর বুকে এতখানি ভালবাসা জমে আছে। ভেবেছিলাম, হয়তো বেশী নেশা হয়ে গেছে বলে পারু এসব বলছে। বুঝলাম—

তুই যাওয়ার আগে। যখন সে কাঁদতে কাঁদতে বলল—রণজিৎ, পরের জন্মে মানুষ হইয়ে ইখানে আসবরে।

বললাম কেন?

তুয়ার তরে আসব।

আর কোন কথা বলেনি পারু। তারপর তুই চলে এসেছিলি। রণজিৎ তার গ্লাস ভর্তি করল স্কচে। বলল—তুই নিবিনা?

দে।

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। শীলাবতীর পারে শ্মশান ঘাট থেকে উঠলাম আমি আর রণজিৎ। বিড়ালটা অনেক আগেই আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেছে, কোথায় কে জানে। আমার কানে আর কান্নার শব্দ আসেনি। কেবল রণজিৎ-এর হৃদয় ভেঙে যাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ভরা কান্না ছাড়া। এবার শীতটা যেন শরীর ছুঁতে শুরু করেছে। সয়েটার চড়ালাম শরীরে। রাত্রিতে রণজিৎ তার বাড়ী যায়নি। যদিও রূপালী বাড়ীতেই আছে। অবশ্য বিভিন্ন কারনে মাঝে মাঝে রণজিৎ বাড়ী না গেলেও রূপালী অশান্তি করেনা। এটুকুই সৌভাগ্য রণজিৎএর। বাড়ী ফিরেও বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছেনা কারও। এত রাত্রিতেও আমাদের গাঁয়ের গাজনপুকুরের পাড়ে আদিবাসীপাড়াতে চলছে আসন্ন তুষুমেলার জন্য তুষুসেরেঙ্গ। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুকুরো টুকরো করে দিচ্ছে—

আমাদের তুষু নাইতে গেল
শীলাবতীর জলে লো,
উয়ার গরা গায়ে সুবাই
হলুদ বেটে মাখাইলো।
বিষন সুন্দর দিখতে লাগে
মন ভরাঈয়ে দেখি লো।

ওদের প্রত্যেকের গলা আমার চেনা। ওরা পানমনি, শুকুমনি, হীরামণি, চুরার বৌ, চুরা, সীতারাম।

প্রতিবৎসর ওরা শীলাবতীর শ্মশানঘাটের চরে যায়। খেউরে মেতে ওঠে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় বুঝতে পেরে। প্রতি বৎসর ওদেরকে হারিয়ে দেয় পারু, লখাই। অবশ্যই রাইমনির লেখা গানে।

কয়েক বৎসর হারতে হয়নি, পারু ছিলনা, এ বৎসরও হারতে হবে না, পারু নেই। লখাই আর তুষুর আসরে যায়না। সুরতিমাই যায়না হেঁড়ের হাঁড়ি নিয়ে।

একঝলক আলো এসে বারান্দায় স্থায়ী হয়েছে। ঘুম থেকে উঠেছি মেয়ের ডাকে। চা দিয়ে গেছে আমার মেয়ে। সকালে বারান্দার রোদ্দুরে বসে চা খেতে খেতে রণজিৎকে জিজ্ঞাসা করলাম—রণজিৎ, একটা সত্যি কথা বলবি?

বলনা। কি কথা?

ফতিমার সাথে...............

সম্পূর্ন জিজ্ঞাসাটা শেষ করতে দেয়নি রণজিৎ। উত্তর দেয়—কি করব বল। এড়িয়ে যোওয়ার চেষ্টা করেছি বহুবার। পারিনি।

কেন?

ভীষন ভাল রে। ভীষণ সরলতা ওর মনে। আমাকে বিশ্বাস করে। ভালবাসে।

আর তোর রূপালী?

জানি তুই কি বলতে চাইছিস্। এর উত্তর আমারও জানা নেই।

ঋৃষা!

সব শুনেছি। ওরা বড় হয়ে যদি পরস্পর পরস্পরকে চায় আমার বাধা দেওয়া উচিৎ না অনুচিৎ—তুই বল।

আমি রণজিৎ এর প্রশ্নের উত্তর জানিনা।

আবুর স্নাতক পার্ট্ ওয়ানের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। একষট্টি শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছে আবু। বাড়ীতে কেউ জানার আগেই জেনে গেছে ঋৃষা। আনন্দ তার চোখে মুখে শরীরের ভাষায়। এক দৌড়ে ছুটে এসে রূপালীকে খবর দেয়—জানো মা আবুদা পার্ট ওয়ানে ফাস্টক্লাস পেয়েছে!

ওমা তাই। তাহলে তো ওকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে। তুই ওকে আসতে বলবি। বলার পরই দুহাত তুলে তার ইষ্ট দেবতাকে প্রনাম জানায় রূপালী। মা আনন্দ পেয়েছে দেখে আহ্লাদে আটখান ঋৃষা। আচ্ছা মা, আবুদা যদি সবেই প্রথম বিভাগ পায়। তাহলে চাকরী কেউ আটকাতে পারবে না। তাই না?

আগে তো পাক্। এখন থেকে ওসব ভাবতে নেই।

না, জিজ্ঞাসা করছি আরকি। ধরো যদি পায়? তাহলে আর ওর বাবাকে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হবেনা। বেচারা সারা জীবন খেটে খেটেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

জানো মা আবুদা বলছিল—দেখিস্ ঋৃষা, আমি ফার্ষ্টক্লাস পাবই। কি ভীষণ জেদ।

জেদ না থাকলে কি আর ফল পাওয়া যায়।

আমি ফার্ষ্ট ডিভিসন পাব, দেখে নিও।

তাই।

হ্যাঁগো মা। আবুদা বলে—প্রথম বিভাগ না পেলে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তুমিই বল, এতবড় কথা সহ্য করা যায়! আমি বলে দিয়েছি—প্রথম বিভাগ যদি না পাই, তোমাকে মুখ দেখাব না।

হাসে রূপালী তার মেয়ের কথা শুনে। মেয়ের চিবুকে হাত রেখে আদর করে বলে— তোকে তো অনেক বড় হতে হবে মা।

আবুদা দেখতে খুব সুন্দর! তাই না মা?

ঠিক ওর বাবার মত।

ফতিমা কাকীমাও তো ভীষণ সুন্দরী।

হুঁ।

মা! সলেমান কাকু ভীষণ পরিশ্রম করে তাই না?

না করলে চলবে কি করে।

জান মা, আমার ভীষন ইচ্ছে করে একবার অন্তত মুর্শিদাবাদ ঘুরে আসি। সেখানে নবাবের খাসমহল, সম্রাটের হারেম, আরও সব কতকি আছে। সেদিন সলেমানকাকু গল্প বলছিল।

তাই নাকি!

জানো মা। সলেমানকাকু বলছিল—আলোর নিচে যেমন অন্ধকার আছে। তেমনই মুর্শিদাবাদের গ্রামীন অর্থনৈতিক অবস্থা। সেখানে প্রচুর গরীব। তারা পেট ভরে খেতে পায়না, গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। তাই অনেকেইত বাইরে চলে যায় রুজিরোজগারের জন্য।

হবে হয়তো। আমি তো ওসব জানিনা।

সলেমানকাকু বলে, এখানে চলে না এলে হয়তো খেতেও পেতামনা। আবুকে লেখাপড়া শিখাতে পারতাম না। কি বলে জানো?

কি?

আমার বাবার জন্যই সলেমানকাকু আজ বড় হতে পেরেছে।

তাই নাকি!

ফতিমা কাকিমা বলে—জানিস্ ঋষা, তোর বাবা মানুষ নয়, আল্লা।

হাসে রূপালী মেয়ের মুখে ফতিমার প্রশংসা শুনে। গর্ব হয় তার। গ্রাম বাংলার প্রতি স্ত্রী-র যা হয় স্বামীর প্রশংসা শুনে। জিজ্ঞাসা করে ঋষাকে—আর কি বলে?

বলে তোর মা ভীষন ভাল।

নিজের প্রশংসা শুনে খুশী হয় রূপালী। অথচ প্রকাশ করতে পারেনা। বলে— যতসব বাড়াবাড়ি।

নাগো মা, সত্যিই বলে।

সেদিন রণজিৎ এর বাড়ী গেলে, রূপালী তার মেয়ের কথাগুলো আমাকে বলে।

তারপর বলে—জানেন দাদা, আমার ঠিক ভাল লাগছেনা। ঋৃষা বড় হচ্ছে। সমাজ বলেতো একটা কথা আছে। তাছাড়া গঙ্গাদি সেদিন যেভাবে বাজে ইঙ্গিত করলো। আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল।

শুধু গঙ্গাবৌদি কেন। সমগ্র গ্রামে কানাঘুষো চলছে, যেন তুষের আগুন হয়ে রয়েছে গ্রাম। কেবল ভয়ে কিছু করতে পারছেনা। ভয় আমারও হয়। মেয়েটা কি সত্যিই ভালবাসতে শুরু করেছে আবুকে। নাকি কেবল ভাললাগা থেকে আবুর প্রতি দুর্বলতা বুঝতে পারিনা। ঋৃষাকে জিজ্ঞাসা করাও যায়না। যা জেদি মেয়ে। হয়তো অপমানবোধ থেকে বাস্তবায়িত করে ফেলতে পারে আমাদের যা ভয়ের কারণ। মনে হচ্ছে—রণজিৎ এর সাথে খোলামেলা আলোচনা করলে বোধহয় ভাল হত। রণজিৎ কি গুরুত্ব দেবে? রূপালীকে বলি—তুমি রণজিৎকে সবকিছু বল। সে কি বলে। কি করে জানা দরকার। কেননা প্রথম অবস্থায় বাঁধ না বাঁধলে দুকূল ছাপাবে। তখন আর আটকানো যাবেনা।

দেখি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপালী। তার চোখেমুখে কেমন যেন ভয়।

ইদানিং রণজিৎ প্রায় প্রতি রাত্রে স্কচ্ খাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে—আর ধকল নিতে পারছি না।

রূপালী জানে?

জানিনা।

সে কিরে। তুই খাচ্ছিস্ কি খাচ্ছিস্ না রূপালী জানেনা।

বিশ্বাস কর। সে আজও জানে কিনা বুঝতে পারিনি।

তোরা............।

নারে। সে পাঠ ঋৃষা বড় হতে রূপালী নিজেই তুলে দিয়েছে।

তার মানে!

কোন কোনদিন যেন আসেনা তা নয়। তবে সেটা দৈবাৎ বলতে পারিস্।

অবাক লাগে রণজিৎ এর কথা শুনে। কত বয়স হল রূপালীর। নাকি ভীষন মোটা হয়ে গেছে বলে অথবা ঋৃষা বড় হুয়ে গেছে বলে হারিয়ে গেছে জীবনের অন্যতম আনন্দ। অথচ রণজিৎ। এই বয়সেও যায় ফতিমার কাছে। এই বয়সেও ফতিমা হারিয়ে ফেলেনি তার সবকিছু।

প্রসঙ্গ বদলে ফেলে রণজিৎ। চলে আসে রাইমণির কথায়। জানিস অনিন্দ, সুখচাঁদকে কোনভাবেই কায়দা করা যাচ্ছেনা। ও বোধহয় রাইমণির পড়া বন্ধ করে দেবে। সেদিন লখাই বলছিল—সুখচাঁদখুড়ো রাইমণির বিয়ে দেবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে।

সে কিরে! তাহলে কি হবে?

সেটাই তো ভাবছি। বুঝতে পারছিনা সুখচাঁদ কেন এমন ব্যবহার করছে। অথচ

দেখ, আমাদের হাত পা বাঁধা। সরাসরি সংঘাতে যেতে পারি না। গেলে আদিবাসী সেন্টিমেন্ট বদলে গিয়ে একটা ভয়ঙ্কর রূপ নেবে।

আমি যা দেখলাম—পাড়াতে সবারই তো মত আছে।

কিন্তু মানুষটা তো সুখচাঁদ। পারে না এমন কিছু কাজ নেই। এখনও সে গাঁয়ের মুখিয়া। আদিবাসী সমাজ তাকে যথেষ্ঠ সমীহ্ করে। আমি অনেকবার তার সাথে আলোচনা করেছি। বরফ গলাতে পারিনি।

ঋষা কোথায় ছিল কে জানে। ওমা, ওমা চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। আমিও তার অস্বস্তি কাটানোর জন্য বলি—কি রে, কি এমন আনন্দের খবর যে মাকে সবার আগে জানাতে হবে?

রূপালী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়ের ডাক শুনে।

কাউকে কিছু বুঝতে না দেওয়ার আছিলায় রূপালীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে দুজনের মধ্যে কি কথা হল বোঝা না গেলেও দুজনের হাসির শব্দ ভেসে আসছে আমাদের কানে।

সেই হাসি মুখ নিয়ে রূপালী দাঁড়ায় আমাদের কাছে। জিজ্ঞাসা করি—কি এমন ব্যাপার হল যে মা মেয়ের হাসি ধরেনা।

জানেন দাদা..............., বলতে পারেনি রূপালী, ঋষা মায়ের মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরে বলে—বলবেনা বলে দিলাম। তাহলে কোনদিন কোনকথা বলবনা। ঋষার হাতে চুমু খায় রূপালী। আচ্ছা বাবা আচ্ছা। বলবনা।

রণজিৎ হেসেফেলে তার মেয়ের কাণ্ড কারখানা দেখে। আমার হাসি আসে। আমাদের হাসি দেখে লজ্জায় লাল ঋষা।

আমি বলি—কি রে মা, তোর গোপনীয়তার একটু করে অন্তত আমাদের বল।

কেন বলব। তোমরা কি কিছু বল?

ঠিক জায়গায় আঘাৎ দিয়েছে ঋষা। সত্যিইতো, আমরা তো কোনদিন আমাদের যা কিছু গোপন, কোনদিন বলিনি। না রূপালী, না ঋষাকে। ঋষা বলবে কেন!

রূপালী মজা করে—এবার হলতো। ঝামা ঘষে দিল আপনাদের মুখে। আর জিজ্ঞাসা করবেন?

তাই তো দেখলাম।

কার মেয়ে দেখতে হবে তো!

আরে বাবা আমি জানি, ঋষা তোমারই মত। তোমার মেয়ে।

রণজিৎ যেন বোবা হয়ে গেছে। তাকি ঋষার কথার ধাক্কায় এবং তার থেকে সৃষ্ট অনুশোচনায়। হয়তো হবে। হয়তো ভাবনায়—রূপালী তাকে আটকে রাখতে পারেনি এলোমেলো পথ চলায়। কিংবা ঋষার কাছে ধরা পড়ে যেতে পারে।

বলি—কিরে রণজিৎ, চুপচাপ যে, কিছু তো বল?

মুখ খোলে রণজিৎ। তোরাই তো সব বলছিস্। আবার আমাকে কেন?

চড়বড় করে ওঠে ঋষা। বাবা কি বলবে। সে কোনদিন কি কিছু শোনে নাকি শুনতে চায়!

অবাক হতে হয় ঋষাকে দেখে। ঋষা আর ছোট নেই। ঋষা বড় হয়েছে। ঋষা বুদ্ধিমতি হয়েছে। দেখতে শিখেছে, আমাদের কলুষিত পৃথিবীকে, হয়তো তারই মাঝে তার নিজের পৃথিবীকে।

দাপুটে রণজিৎ। ডাকসাইটে রণজিৎ। যাকে বাইরে সবাই ভয় পায়। মাঝে মধ্যে আমারও ভয় করে। যার ভয়ে বিরোধীরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। নিন্দুকেরা প্রকাশ্যে নিন্দা করতে সাহস পায়না। সেই রণজিৎ তার মেয়ের কাছে যেন নতজানু। মেয়ের শাসনাধীন।

পৌরুষত্বের জীবন বোধহয় এমনই অদ্ভুৎ ভাটাময়। বেআক্কেল, অসমাজিক পুরুষেরাও তার পৌরুষত্ব প্রমাণ করার জন্য নিজের স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালায়। কেউ কেউ টাইট দেয় জীবনবর্ত্তিকা নিভিয়ে দিয়ে। কিন্তু তারই রক্তে তৈরী তার সন্তান সন্ততি— সে যদি কন্যা হয়। তার কাছে বেকুবের মত হয়ে যায়। হয়তো পরের বাড়ীর মেয়ে নয় বলে। কিংবা কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলের আশঙ্কায়।

বড় অসহায় লাগছে রণজিৎকে দেখে। দুঃখ হয় রণজিৎকে দেখে। এই মানুষটাই ঘরের বাইরে এক মানুষ। ভিতরে অন্য মানুষ।

ঋষা বড় হয়েছে। অপূর্বা ঋষা। রূপালী সুন্দরী। রূপালীর থেকেও সুন্দরী। রণজিৎ-এর উচ্চতাটা পেয়েছে ঋষা। রূপালীর মত অর্ন্তমুখি নয়। দেখে মনে হচ্ছে রণজিৎ-এর মত চরিত্রও নয়। সম্ভ্রম জাগানো, ব্যক্তিত্বসম্পন্না।

সলেমান তাহের সিদ্দিকি এবং ফতিমা যেমন আমার চোখে সিরাজ-লুৎফা। তেমনই ঋষা, আবু, অপূর্ব জুটি। কিন্তু................।

কিন্তু এবং যদি আটকে আছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সমাজই বা বলি কেন! আমি, রূপালী. আমরাও কি মেনে নিতে পারব ওদের সম্পর্কের ঠাস বুনন! রণজিৎ মুখে বলে—মানিনা জাত, ধর্মের গোঁড়ামি। ব্যক্তি জীবনে অবশ্য মানেনি। মানলে তার জীবনে পারু আসতনা। ফতিমার সাথে সম্পর্ক থাকতনা। এসবই তার ব্যক্তিজীবন। কিন্তু ঋষা তার আদরের মেয়ে। তারক্ষেত্রে কি মেনে নেবে রণজিৎ! ঋষা কি সত্যিই ভালবাসে আবুকে, নাকি ভাললাগা।

এই এক ধরনের মন মানুষের। আগাম ভাবনা, আগাম আশঙ্কা, আগাম আনন্দের অনুভূতিতে গা ভাসানো। আগাম সাবধাণতা। ঘটবে কি ঘটবে না, হবে কি হবে না, পাব কি পাবনা। এ বাস্তবের সম্মুখীন হতে যেন কেউ চায়না। ওখানে গাছাড়া ভাব।

জীবনের প্রবাহ নদী। কিন্তু নদীর মত বাস্তবমুখী নয়। নদী স্থির লক্ষ নিয়ে অভিমুখে যায়। সাগরে মিলায়। তার দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, সুখ, শান্তিকে শরীরে গয়নার মত পরে।

ভাবতে ইচ্ছে করে কে বা কারা 'জীবন নদী' আখ্যা দিল।

জীবন ঝড়ও নয়। যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, উড়বে। ধ্বংস না সৃষ্টি সে ওসব ভাবেনা। তার ভাবনায় 'করে যাওয়া' শুধু। জীবন নিদেনপক্ষে দক্ষিণা সমীরনও নয়—যে তৃপ্তি মাখিয়ে, মেখে বয়ে চলে শির্ শির্, শির শির, শির শির।

তাহলে জীবন কী? এর উত্তর আমারও জানা নেই। যে রণজিৎ ভোগের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে চলেছে মধ্যগগন থেকে বিকেলের আকাশে, সেও জানেনা।

অপ্রতুলতায় প্রথম সোপান থেকে বেয়ে বেয়ে প্রাচুর্যের শিখরে থমকে দাঁড়ানোও জীবন নয়। জীবন কুয়াশার ঘন আস্তরন, থমকে দাঁড়ানো সূর্যের আলো। কুয়াশা সরে যাওয়া আলোর আস্তরনে দিক্‌বিদিক চাক্ষুস্‌মান। তবু না দেখা, অশেষ আশা, হতাশা, তৃপ্তি, অতৃপ্তি। অনুসিদ্ধান্তহীন।

ঋষা, আবু ওসব জানেনা। তাদের বিনিময় কেবল ভাললাগা। হয়তো পূর্বরাগ।

একান্তে ডেকে নিই ঋষাকে। যেমন ডাকি আমার মেয়েকে। যেমন আমার মেয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় সাবলীলতায়। সেই আশায়।

রণজিৎকে কে যেন ডাকল। বেরিয়ে গেল বাইরে। রূপালী ব্যস্ত তার পছন্দের খাদ্যতালিকা নিয়ে। আজ না খাইয়ে ছাড়বেনা। তার অভিব্যক্তিই তাই। ঋষা আমার সামনে মুখোমুখি, চোখাচোখি, তার মুখে অমায়িক হাসি। সে হাসিতে নিষ্পাপ সরলতা, আমার প্রতি অগাধ আস্থা।

ডাকি—আয় মা, আমার কাছে আয়। বোস্ আমার পাশে। হাত ধরে টান দিই, শিথিল করে দেয় হাত।

তারপর বল্—পড়াশুনা কেমন চলছে?

খিল খিল করে হেসে ওঠে ঋষা— জ্যেঠু, তুমি কিছুই জানো না।

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। ঋষা বলছে—আমি কিছুই জানিনা, তবু জিজ্ঞাসা করি— কেন?

এখন কেউ পড়ে নাকি?

সে কি!

চুক্ চুক্ শব্দ তোলে ঋষা। জ্যেঠু, তুমি ডাক্তারি করে করে মাথাটা একবারে খারাপ করে ফেলেছ।

সে কি মা! আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! তাহলে তো... ......

তোমাকে ডাক্তার দেখিয়ে আনতে হবে এবং মানসিক ডাক্তার।

কেন মা, আমার কি মনের রোগ হয়েছে?

অবশ্যই। তা না হলে পরীক্ষা শেষের পরে কেউ পড়াশুনার কথা বলে।

সত্যিই তো, আমার একদম খেয়াল ছিলনা তুমি উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছ।

দেখলে তো। একে বলে লস্ অব্ মেমারী। তোমাকে এ্যানাকার্ডিয়াম অথবা ব্রাহ্মীরস খাওয়াতে হবে।

ও বাবা, তুমি যে দেখছি ডাক্তারীটাও জেনে গেছ।

কেন? আমি কি ভুল বলেছি? আমাদের স্কুলে একটা মেয়েকে তাদের ডাক্তার দিয়েছে যে। কেন জানো? সে সবকিছু ভুলে যেত, পড়লেও মনে ধরে রাখতে পারত না। সেই তো বলল—ভুলে গেলে এ্যানাকার্ডিয়াম এবং ব্রাহ্মীরস খাবি।

হো হো করে হেসে উঠি নিজের অজান্তেই। রূপালী হাসি শুনে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করে—কি হল দাদা, অমন করে হাসলেন যে! ঋষা নিশ্চয় বোকা বোকা কথা বলেছে।

নিশ্চয় এ্যানাকার্ডিয়াম আর ব্রাহ্মীরসের কথা বলেছে?

তোমাকেও বোধহয় তাই বলেছিল?

শুধু আমাকে কেন, ওর বাবাকেও বলে।

বোধহয় অভিমান হল ঋষার।— তোমাকে আর কোন কথাই বলবনা।

কেন, কি দোষ করলাম?

মাকে বললে কেন?

বেশ তো, এবার ভুল হয়ে গেছে। আর কোনদিন কোন কথাই বলবনা।

রূপালী চলে গেছে রান্নাঘরে। রণজিৎ-এর দেখা নেই। ঋষার অভিমান ভেঙেছে। সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করলাম—ঋষা।

কি?

আবুকে তোমার খুব ভাল লাগে, তাইনা?

সত্যি জেঠু, ওর মত ছেলে হয়না।

তাই নাকি?

হ্যাঁগো। পড়াশোনায় ভাল। কি সুন্দর ব্যবহার। দেখতে ঠিক যেন সিরাজদ্দৌলা।

ও যদি মুসলিম না হত, খুব ভাল হত তাইনা?

মুসলিম বলে কি মানুষ নয়?

তা বলছিনা। কিন্তু সমাজ তো অনেক কিছুই বলতে পারে।

সে তো বলে। অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। ওকে আমার ভীষন ভাললাগে। ব্যাস্।

মজা করে বলি, আর কিছু লাগেনা তো?

লাগতেই পারে। বাপী কি বলে জানোতো। জাত, ধর্ম, সম্প্রদায় আমাদের সৃষ্টি। কেবল স্বার্থের প্রশ্নে। মানুষের একটাই জাত। সে মানুষ।

দেখলাম ঋষাকে দুচোখ ভরে। যার শরীরময়, মনময় রণজিৎ। ভাল লাগল জেনে

সবাই সবকিছু হারিয়ে মেরুদণ্ডহীন হয়ে যায়নি। খৃষা্রা আছে। আছে সবার জন্য (যদিও হাতে গোনা মানুষের) অফুরন্ত ভালবাসা। তারা রণজিৎ হতে পারে অথবা হতে পারে খৃষা।

রূপালীর পরিবেশিত খাবার খেয়ে বাড়ী ফিরলাম নদীর পার ধরে। ফেরার পথে দেখলাম শবদাহ চলছে শীলাবতীর চরে। শ্মশান ঘাটে। যেখানে পারুকে দাহ করেছিল লখাই। যেখানে বসে সুখচাঁদ জেহাদ ঘোষনা করেছিল বাবুয়ার বিরুদ্ধে। যেখানে তুষুর আসর বসত, আজও বসে। যেখানে হারিয়েও রয়ে গেছে রণজিৎ-এর পারু।

রণজিৎ যেন বদলে যাচ্ছে। আগের উচ্ছলতা হারিয়ে গেছে। কেমন যেন অন্যমনস্ক। হয়তো বয়সের ভার তার শরীরে মনে ভর করেছে। কিংবা কাজের চাপ ভীষন বেড়ে গেছে। অথবা খৃষা বড় হয়েছে। খোলাচোখে দেখতে, জানতে শিখেছে সমাজ আর তার সংস্কারগুলোকে। হয়তো গ্রামের অলিগলি, জামতলা, বাঁশতলা, নদীর পারের আড্ডা খানায় তাকে, ফতিমাকে নিয়ে মুখর চোখ আলোচনা তার কানে এসে পৌঁছেছে। সেখান থেকেই শুরু হয়েছে তার সাবধানী হওয়ার পালা। ফতিমার ঘরে প্রায় প্রতিদিন আর যায় না। কিন্তু কেন কে জানে শ্মশানঘাট তাকে নিশিডাক ডাকে। সে নিশিডাক কি পারুর!

জিজ্ঞাসা করি—হ্যাঁরে রণজিৎ, তোর কি হয়েছে? কেমন যেন বদলে যাচ্ছিস?

ভাল লাগছে নারে।

কি ভাল লাগছে না?

তাই তো জানিনা। অনিন্দ?

বল।

এখন আশ্বিন মাস, তাইনা?

হ্যাঁ, এবার শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়বে মনে হচ্ছে।

শীলাবতীতে এখনও বেশ জল, তাইনা অনিন্দ!

এ বছর যেন ব্যতিক্রম।

তুই দেখেছিস অনিন্দ, শ্মশানঘাটের হিজল গাছটা মরে গেছে!

কই, খেয়াল করিনিতো।

যে গাছটার তলায় সেই প্রথম বৎসর পারু আমার হাতে হেঁড়ের বাটীটা ধরিয়ে দিয়েছিল।

রণজিৎ! তোর আজ কি হয়েছে রে!

অনিন্দ! এই হিজলের তলায় পারুর শবদাহ হয়েছিল। আজ থেকে কয়েক বৎসর আগে। তোর মনে আছে?

আছে। কিন্তু ওসব কেন মনে আসছে?

কেন তাতো জানিনা। এই অনিন্দ?

বলনা।

রাইমণিকে বলনা। এবৎসর বেশ ভাল একটা গান লিখে সুর দিতে।

গাইবে কে?

রাইমণি।

সে গাইবে কেন?

ওর লেখা গান পারু গাইতো। পারুতো নেই, তাই রাইমণি গাইবে।

ওর যা মনের অবস্থা।

জানিস অনিন্দ, বাবুয়াটা একটা কাওয়াড়।

কেন?

রাইমণির কিছু হয়ে গেলে, তারজন্য বাবুয়াই দায়ী থাকবে। অন্তত আমার চোখে। তুই দেখিস্। আমি ওকে ক্ষমা করবনা।

এসব বলছিস কেন?

পারু হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে তার গলায় রাইমণির লেখা গান। যে গান আমাকে..........।

বুঝেছি রণজিৎ। তাই স্থপতিকে হারাতে চাইছিস্ না। কিন্তু ওদের সমাজ..........।

মানিনা, মানিনা সুখচাঁদের ফতোয়া। ওকে হারতে দেবনা। হারাতে দেবনা। ওর গানের মধ্যে লুকিয়ে আছে পারু। জানিস্ আমি যেন প্রায় প্রতিদিন শুনতে পাই পারু গাইছে।

জীবন আমার ধন্যি হল
শীলাবতীর চরে লো
ই গাঁ উ গাঁ ঘুরে ফিরে
তুষু আমার এললো,
সাথে এল নাগর আমার
উয়ার ঘর পাশের গাঁয়ে রলো
ই পারুর বুকে রাখল মাথা
কুরল যত সোহাগলে।
তবু আমায় বলেইঙ্গ দিল

উয়ার মনে তুই আছিস্ লো
জীবন আমার ধন্যি হল
উকে পেয়ে শীলাবতীর চরেলো।

পারু বলেছিল—ই রণজিৎ। ই গানটা তুকে লিয়ে আমাকে লিয়ে বোধহয় রাইমণি লিখাইঙ্গ দিছে। বুলনা কিনে ভাল লয়? সেই সেবার ও আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। তখনই গানটা গেয়েছিল এবং সেই শেষ বার।

তোর হৃদয়ে এতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে পারু!

হ্যাঁরে অনিন্দ।

তাহলে ফতিমা, রূপালী?

রূপালী আমার স্ত্রী। আমার একমাত্র মেয়ের মা। চাওয়া পাওয়াময়। ফতিমা সলেমানের অভাববোধে এক রূঢ় বাস্তব। পারুর কোন চাওয়া ছিলনা। চাওয়ার স্থায়ী আশাও করেনি।

অনিন্দ!

বল।

চলনা শ্মশানঘাটে যাই।

আজ সময় হবেনা রে। অন্য একদিন যাব।

কিন্তু, আজই যে আমাক যেতে হবে।

কেন?

আজকের দিনেই পারুকে ওখানে দাহ করা হয়েছিল।

কি হবে গিয়ে?

পারু যেন তার গানের সম্মোহনে আমাকে ডাকছেরে অনিন্দ!

এড়িয়ে থাকতে পারিনি। গেলাম রণজিৎ-এর সাথে শ্মশান ঘাটে—জ্যোৎস্না রাত্রি। পথের দুধারে আকাশমনি, ইউক্যালিপটাশ, শিশুগাছ। সত্যিই ওরা শিশু। এই সেদিন পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে লাগানো হয়েছে গাছগুলো। দিনের বেলা পাহাড়ায় থাকে পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় একটা বনরক্ষী। যেতে যেতে পড়ে মাটির কালীমন্দীর। পাশে ফুলের বাগান। জবা, করবী, অপরাজীতা, গোলাপ ফুল ফুটে আছে। স্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছে ফুলগুলো। জ্যোৎস্নার আলোকে আড়াল করছে বেড়ে ওঠা গাছগুলো। রাস্তাটা যেন সাদা কাল ডোরাকাটা বাঘের মত মনে হচ্ছে।

রণজিৎ-এর মোটর বাইক রয়েছে আমার চেম্বারে। হেঁটে চলেছি দুজনে। গতি শ্লথ। যেতে যেতে বললাম রণজিৎ!

বল।

কি ছিল পারুর চোখে, যে প্রথম দর্শনেই........

মায়াবী জোৎস্না, যেন কালমেঘের আস্তরন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে।

একটা অনুরোধ করব রাখবি?

বলনা।

পারুকে ভুলে যা রণজিৎ।

চেষ্টা তো করি।

পারছিস্ না তাইতো। কিন্তু না পারলে তোর নিজের সংসারের প্রতি ইম্প্রেশান হারিয়ে যাবে।

জানি অনিন্দ। পারি না যে।

পথচলতি চেনা লোকগুলো একটু অবাক হয়ে যাচ্ছে রাত্রিতে আমাদের দুজনকে ঐ পথের পথিক হতে দেখে। একজনতো জিজ্ঞাসাই করে ফেলল—কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু, এত রাত্রে কোথায় যাবেন, রোগী দেখতে?

না ভাই। ওপারে যাব, একটু কাজ আছে।

কেউ বলে ভাল আছেন?

প্রত্যুত্তরে বলি হ্যাঁ দাদা।

শ্মরানঘাট বা শ্মশানঘাটে এসে দেখলাম সত্যিই হিজল গাছটা মরে গেছে। কে বা কারা জ্বালানীর জন্য মরা গাছের কয়েকটা ডাল নিয়ে চলে গেছে রাতের অন্ধকারে। রণজিৎ তাকিয়ে আছে হিজলগাছের তলায় উঁচু জায়গাটার দিকে। হঠাৎ বলে ওঠে রণজিৎ— অনিন্দ দেখছিস্ ঐ যে উঁচু জায়গাটা!

কেন?

শবদাহ শেষে পারুর শারীরীক অবয়ব।

রণজিৎ।

বল।

কি হয়েছে তোর?

জানি নারে।

আমরা বসেছিলাম। হঠাৎ একটা মেঘ উড়ে আসল শব্দ তুলে। কিছুক্ষণ আগেও ছিলনা। বোধহয় বৃষ্টি হবে। বাতাসটা বইছে জোরে জোরে। সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় শিহরন। হিজল গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল মড়মড় করে। অলৌকিক ভাবে থেমে গেল বাতাস। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল আমাদের শরীরে। তারপর থেমে গেল। দূরে একটা শৃগাল ডাকল হুক্কা হুয়া। বাগপোতা গ্রাম থেকে ডেকে উঠল একদল কুকুর— ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ।

বললাম—রণজিৎ, এবার ওঠ বাড়ী ফিরতে হবে।

বোধহয় শুনতে পায়নি রণজিৎ। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—অনিন্দ শুনতে পাচ্ছিস্?

কি?

একটা কান্নার শব্দ। আর তুষু সেরেঙ্গ!

কই না তো!

ঐ তো আবার। পারুর গলার সুর ভাসছে শীলাবতীর চরে।

রণজিৎ, খুব হয়েছে এবার ওঠ।

আর একটু বোসনা অনিন্দ। গানটা শেষ হলে অবশ্যই চলে যাব। একটা টর্চের আলো যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমার বুকে যেন ভয় ভর করল। শুরু হল অদৃশ্য কাঁপন। ডাকলাম এই রণজিৎ ওঠ। দেখছিস্ না কে টর্চ জ্বেলে এদিকে আসছে।

আরও কাছাকাছি আসল আলোটা। আলোটা স্থির হল মাদার গাছের তলায়। তারপর নিভে গেল। হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে আমার। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে যেন। রণজিৎকে বললাম—রণজিৎ, দেখলি। টর্চের আলোটা গিয়ে থামল মাদারের তলায়।

জানি অনিন্দ।

জানিস?

হ্যাঁ। গতকাল বাবুয়া এসেছে। সুখচাঁদ বাড়ীতে। রাইমণিকে লখাই দিয়ে গেল মাদারের তলায়। ওখানে বাবুয়া আছে।

সেকি! সুখচাঁদ জানলে যে বিপদ হয়ে যাবে!

হবে না। সুরতি সুখচাঁদকে মদে চুবিয়ে রেখেছে।

ছি ছিঃ এটা ঠিক হচ্ছে না। সাহস যার নেই। রাতের অন্ধকারে নদীর ধারে এসে প্রেম বিনিময় করা তাদের মানায় না।

পারুর সাথে কি আমার মানাতো! তবু.........।

রণজিৎ-এর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিনি।

হঠাৎ রণজিৎ বলে—জানিস্ অনিন্দ! পারুর মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর আমি এখানে আসি। একা একা। এবার তোকে সাথে নিয়ে এলাম।

কেন?

জানিনা।

টর্চের আলোটা ফিরে এল মাদারের তলা থেকে। ফস্ করে একটু করে আগুন জ্বলে উঠল। নিভে গেল। তারপর একটা ছোট্ট অগ্নিপিণ্ড কখনও গন্‌গনে কখন স্তিমিত হচ্ছে। রণজিৎ বোধহয় বুঝতে পারল আমি ভয় পেয়েছি। বলে উঠল সে—লখাই বিড়ি ধরিয়েছে। ওকে ডাকব?

আমার উত্তর জানার অপেক্ষা না করেই ডাকদিল রণজিৎ—লখাই?

বলল— কে রনদা?

হ্যাঁরে। আয় এদিকে।

লখাই এসেই অবাক হল আমাকে দেখে—ডাক্তারবাবু! আপনিও এসেছেন।

তোমার রণদার জেদে আসতেই হল।

আমাদের পাশে বসল লখাই। মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলছে ওপারে। লক্ষ করছে কেউ আসছে না কি। নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—রণাদা একটা সিগরেট দাও দিখিন্।

সিগারেট বের করে রণজিৎ লখাই এর হাতে দিতেই ধরিয়ে নিল লখাই। কয়েকটা টান মারার পরে বলে—জানু ডাক্তারবাবু, আমাদের মুখিয়াটা কিমন যেন একরোখা। কুমু কথা শুনে নাই। কুত বললম, দিনা কিনে রাইমণির সাথে বাবুয়ার বিহাটা।........

কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম—তুমি যে ওভাবে ওদেরকে মিশতে দিচ্ছ, যদি মুখিয়া জানতে পারে!

না না, পারবেক লাই। সুরতি আছে না। উয়াকে মদ খাইয়ে ফেলাটা করাইঙ্গ দিচ্ছে।

সে না হয় হল। বাবুয়া যদি ছেড়ে দেয় রাইমণিকে। কি হবে ভেবে দেখেছ?

কিনে ছাড়বেক। আমি কি সুরতিকে ছাড়াইঙ্গ দিছিলম। আমিও ত বিদেশ থেকে ইখানে এসেছিলম কাজ করতে। ইখন ত রইয়ে গেলম।

তবুও তোমাদের ভেবে দেখা দরকার।

কি ভাববক বলেন দিখি ডাক্তার। উ বুড়াটা যদি না শুনে। ই পথেই ত যাতি হবেক। ইযে দিখনা—রণাদা কি আজও ভুলেছে পারুকে। আজের দিনে পারু মারঙ্গিল। ই দিনটাই রনাদা আসল ইখানে। ইকেই বলে মনের টান।

কিন্তু...........

হ্যা, হ্যা। রাইমণি বাবুয়ার কুথা বলতে। উয়াদের বিহা দিয়ে তবে ছাড়বক। উ মুখিয়া কিছু করতে পারবেক লাই। যতই গঁদর গঁদর করুক না কিনে।

এই ভালবাসার টানেই এসেছিল লখাই। তখন বরষা নেমেছে গাঁয়ে গাঁয়ে। নদীর কানায় ছুঁয়েছে জল। বীজধান বুনেছে চাষারা। প্রতি বৎসরের মত সে বৎসরও মজুর খাটতে আসবে সারেঙ্গা, লালগড় থেকে আদিবাসীরা, দোমনি, গুইয়াদহ থেকে মুসলিমরা। বিনপুর থেকে আদিবাসী, লোধারা। এসে জমা হবে বাঁকা, কালিকাপুর, ক্ষীরপাইতে। চাষীরা জানে, ওরা আসবে। সবাই জুটবে ঐ সব জায়গায়। তারপর ভাগাভাগি করে নেবে যার যেমন প্রয়োজন। বেতন হয়তো একটু বেশী। তা হোক কাজে পুষিয়ে দেয় ওরা। চাষীর বাড়ীর কাছাকাছি কুঁড়ে বাঁধবে। যেন নতুন সংসার। নতুন পরিবেশ। সেবারও এসেছিল। বরষা নেমেছিল বেশ জাঁকিয়ে। নদীতে বন্যা এল। নদী তীরবর্তী কাজে ভাঁটা। বসে বসে খাচ্ছে ওরা। আর বেড়াতে যাচ্ছে যে যার জাত ভাইদের ঘরে। প্রতিদিন বেড়াতে বেরিয়ে সুরতির সাথে দেখা হত লখাইয়ের। সুরতি ডাগর ডুগর।

চোখের চাউনিতে মাদকতা। বুকের সৌন্দর্যে সম্মোহন। লখাইয়ের বাউরি চুল। লখাই সেরেঙ্গ জানে। বাঁশিতে তুলে সুর। সুরতির বুক দুর দুর। এইভাবে কাছাকাছি আসে দুজনে।

সুখচাঁদ চায়নি। কিন্তু লখাইয়ের জেদ আর সুরতির ভালবাসা সুখচাঁদকে হারিয়ে দেয়। এক সময় দুজন দুজনকে বিয়ে করে ঘর বাঁধে শীলাবতীর তীরবর্তী অঞ্চলেই।

এ সবই শুনিয়েছিল লখাই আমাকে। এই রাত্রির আঁধারে। মরে যাওয়া হিজলের তলায় বসে। আর রণজিৎ। সে স্কচ্ উপুড় করছিল নিজের মুখে।

মাদার গাছের তলায় যেন একটা আলোর শিখা দপ করে জ্বলে নিভিয়ে গেল। লখাই বলল—এ্যা ডাক্তার বাবু। ইবার উঠতি হবেক।

তুই তাহলে এসবই করছিস্।

কিনে, দোষটা কুথায়? আজযে তুই বসাইঙ্গ আছু ইখানে। কার লগে। পারুর লগেত? উয়াকে কে তুয়ার কাছে পাঠাইঙ্গ ছিল? ই লখাই।

কথা বলতে পারেনি রণজিৎ। নিঃশব্দে বোতল শেষ করে শুধু বলল—যা, সাবধানে যাবি।

হ্য হ্য—ই লখাই যা করে সাবধানেই করে। লেশার ঘোরে লয়।

দ্রুত চলে গেল লখাই। একটা আলো চলে গেল পশ্চিম মুখে। আলোটা বাবুয়ার। ফিরে যাবে কামারবাঁদী। আর একটা নদী পেরুলো। যাবে মনসাতলার আদিবাসী পাড়া।

আমরা উঠলাম শ্মশানঘাট থেকে। খুব বেশী খেয়েছিল রণজিৎ। অথচ সেই অবস্থাতেই এদিক ওদিক করতে করতে চলে এল আমার বাড়ী। সেখানে ওর গাড়ীটা রাখা আছে। আসতে আসতে স্বগতোক্তি করল। আবার দেখা হবে পারু। তুই কাঁদিসনা। সামনেই তো তুষুর আসর বসবে। রাইমণিকে বলেছি, ও গান লিখবে। তুই গাইবি। হ্যাঁ, খুব সুন্দর করে। আমার মনের মত করে।

আমার বাড়ী ফিরে এলাম দুজনেই। বাধা দিলাম, শুনলনা রণজিৎ। মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল শ্রীরামপুর।

রূপালী জানে রণজিৎ মদ খায়। রূপালী অভ্যস্ত হয়ে গেছে দেখে দেখে। কিন্তু ঋষা। সে কি ভাববে! হয়তো সেই জন্যই যেদিন খায় অনেক দেরী করে বাড়ী ফেরে। ততক্ষনে ঋষা ঘুমিয়ে যায়। এ যুগের মেয়েরা টিভির পর্দায় এই অদ্ভুৎ কালচার দেখে দেখে এটাকে জীবনযাপনের একটা অঙ্গ হিসেবে ভেবে নিয়েছে অথবা ভাবতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে রূপালী যে বাধা দেয়না তা নয়। অথবা একটু আধটু মতান্তর বা মনান্তর হয়না তা নয়। কিন্তু কিছু করতে পারেনা রূপালী।

দেখতে দেখতে এসে গেল তুষু মেলা। সেদিন সকালে ঋষা তার বাবাকে বলে—ও বাপী, আমাকে তুষু মেলা নিয়ে যাবে?

তুই যাবি?

যাব। জান বাপী, আবুও যাবে বলেছে।

বেশতো। তাকে বলে রাখবি।

তুষু মেলার দিন ফোন করল রণজিৎ, আমার চেম্বারের পাশেই একটা দোকানে। ঋ্ষা, আবুর কথাও বলল। তখন সকাল দশটা। আমি পৌঁছে গেলাম শীলাবতীর সেই পরিচিত চরে। নদীতে তখনও জল বইছে কানি বেয়ে। নদীর পারের গাছে গাছে পত্রমোচন শুরু হয়েছে। গিয়ে দেখি রণজিৎরা তখনও আসেনি। দুলে, বাগদীরা যথাক্রমে লক্ষ্মণ, আর সামুর নেতৃত্বে তুষুগান গাইছে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে। লখাইকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না সুরতিমাইকে। সুখচাঁদ বসেছে হেঁড়ের বাটি নিয়ে। বসেছে সীতারাম, হপন, ধর্মা, সুকুমণি, পানমণিরা।

ভাঙ্গা বাংলায় সেরেঙ্গ ধরেছে হপন। জুড়িদার বাকীরা। বেশ কিছুক্ষন অপেক্ষার পর গেলাম শ্রীরামপুরে। গিয়ে দেখলাম রণজিৎ-এর বাড়ীর সামনে অনেক মানুষের জটলা। ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম, এর থেকে আমার মাথায় বজ্রপাত হলে বোধহয় ভাল হত। বিভ্রান্ত রণজিৎ। ডাক্তার তখনও তার স্টেথোস্কোপ বসিয়ে রেখেছে রূপালীর বুকে। নাড়ীর স্পন্দন বোঝার চেষ্টা করছে রূপালীর বাম হাতের কব্জি ধরে। ঋ্ষা তার মায়ের মুখে নিজের মুখ ঘষে চলেছে সমানে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আবু। এসেছিল তুষুমেলা দেখতে যাবে বলে রণজিৎ-এর বাড়ীতে। ঋ্ষাও তৈরী হয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন কয়েকবার। তারপর তার স্টেথো ভাঁজ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ধীর গতিতে। সমবেত কান্নার আওয়াজে ভরে উঠল রণজিৎ এর ঘর। রণজিৎ কাঁদতে পারছেনা। কিন্তু তার দুচোখে জল টলটল করছে। ঋ্ষার বাহ্যিক চেতনা নেই। মনে আসেনি সে আধুনিকা। মাথা খুঁড়ছে রূপালী বুকে। চিৎকার করছে—ওমা কথা বলনা। ওমা তুমি যে বললে তুষুমেলা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলে একসাথে খাবে। আবুও খাবে আমাদের বাড়ীতে। ওমা, তুমি কথা বলছনা কেন? পাড়ার গঙ্গাবৌদি চেষ্টা করছে ঋ্ষাকে সরিয়ে নিতে। চেষ্টা করছে শিবুর বৌ।

রণজিৎ একা। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রূপালীর মুখের দিকে তাকিয়ে। তার তীক্ষ্ণ চেতনা যেন বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। মূক হয়ে গেছে মুখ। অশাড়তা গ্রাস করেছে রণজিৎকে।

রণজিৎ-এর কাঁধে হাত রেখে বললাম—রণজিৎ!

তাকাল রণজিৎ। তার দৃষ্টিতে আকাশ মাটির মাঝখানের শূন্যতা। চোখে আর জল নেই। হয়তো সবচেয়ে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আগামী দিনকে স্বাগত জানানোর বেদনায় প্রস্তুতি সারছে রণজিৎ।

নাড়া দিলাম তার কাঁধ ধরে—এই রণজিৎ। কি হল?

যেন কোন সুদূর থেকে ভেসে আসা শব্দ আমার কানে ধরা দিল—কি হল বলতো? তারপর নিরবতায় ডুবে গেল রণজিৎ।

সলেমান এসেছে। এসেছে ফতিমা। এ বাড়ীর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাদের চেনা। চেনা হয়ে গেছে এখানকার মানুষের মনগুলো। উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে তারা রূপালীকে দেখছে। দেখছে এই মূহুর্তে অসহায় হয়ে যাওয়া ঋষাকে।

আবু ঋষার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কিংবর্ত্তব্যমূঢ়তা নিয়ে। অনেকের চোখ আবুর দিকে। তাদের মনে হয়তো হাজারো প্রশ্ন। এবার কি হবে—আবু-ঋষার?

নিশ্চেষ্ট ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। কারণ ঋষা কাঁদছে। শেষবারের জন্য মাকে আদর করছে। কিন্তু প্রত্যুত্তর পাচ্ছেনা।

ঋষা আরও একটুক্ষণ কাঁদুক। ধুয়ে যাক চোখের জলে, হা হুতাশে তার মা হারানোর বেদনা। কাঁদতে কাঁদতেই তো স্থির করে নিতে পারবে তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিৎ।

বোধহয় সহ্য করতে পারেনি আবু। অজস্র লোকের সামনেই ঋষার হাত ধরে। ঋষাকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেয় আবু। তা দেখে কেউ কেউ মুখ বাঁকিয়ে চলে যাচ্ছে যে যার বাড়ী। কারও চোখ ঋষার হাতে ধরা আবুর হাতের দিকে। যদিও পরিবেশটা শোকের, তবুও তাদের চোখেমুখে স্পষ্ট ছাপ। সে ছাপ ঘৃণার। জিজ্ঞাসার, বিস্ময়ের, সন্দেহের।

অসহায় ঋষা কুল খোঁজে হয়তো। আবুর বুকে তার মাথা। ওদিকে নজর নেই রণজিৎ এর। রণজিৎ এর চোখ সদ্যমৃতা স্ত্রীর মুখের দিকে।

পরিবেশের গুরুত্ব বুঝে ঋষার মাথায় হাত রাখি ঋষা। আবুর বুক থেকে মাথা সরিয়ে নিয়ে আমার বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

জ্যেঠু, কেন এমন হল! কেউ বাঁচাতে পারলনা আমার মাকে। আমি কি করব জ্যেঠু। মা যে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা জানা ছিলনা আমার। সান্ত্বনা হয়তো রণজিৎ দিতে পারতো। কিন্তু রণজিৎ তো সান্ত্বনা খুঁজছে। দেবে কিভাবে।

পাড়ার বয়স্করা এসেছেন। শবদাহের আয়োজন করছেন সবাই। নিরব রণজিৎ এর কোন দিকে মন নেই। বললাম—রণজিৎ, এবার তো............।

জানি অনিন্দ। এবার নিয়ে যেতে হবে শ্মশান ঘাটে। যেখানে চলছে তুষুর আসর। শীলাবতীর চরে। যেখানে দাহ করা হয়েছে পারুকে। সেখানেই দাহ করা হবে রূপালীকে। ঐ জায়গাতে জাত, ধর্ম, সম্প্রদায় বিভাজন নেই। লোকচক্ষুর ভয় নেই। সমালোচনার তীব্র বিষ নেই। সে বিষের জ্বালাও নেই।

সম্ভুবাবু এসে বললেন—ডাক্তারবাবু, রণকে নিয়ে আসুন, গাছ কাটত হবে।

বাঙালী হিন্দুদের এইটেই নিয়ম। যে মুখাগ্নি করবে সে গাছে প্রথম কোপ দেবে। নিয়ে গেল রণজিৎকে গাছের গোড়ায়। তার হাতে কুড়ুল। প্রথম কোপ দেবে সে।

প্রথম কোপ দিয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল রণজিৎ। এই প্রথমবার তাকে এইভাবে কাঁদতে দেখলাম। কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে শুরু করল আনিন্দ। আমার স্বপ্নের প্রাসাদ যে ভেঙে গেলরে!

এসব ভাবছিস্ কেন? মানুষকে তো একদিন এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতেই হবে। এটাই তো নিয়ম।

তাই বলে এভাবে। এত তাড়াতাড়ি। ঋষাকে ছেড়ে।

কেউ কাউকে ছাড়েনা রণজিৎ। কেউ কারও জন্য অপেক্ষাও করেনা। ভাবনাটা শুধুমাত্র ভাবনাই। তার কোন বাস্তবতা নেই।

ঋষাকে নিয়ে যে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল রূপালী।

তোকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

কিন্তু কিভাবে তার শূন্যস্থান পুরন করব বলতে পারিস্?

যেমন বয়ে যাওয়া বাতাস শূন্যস্থান সৃষ্টি কবে। বয়ে আসা বাতাস পুরণ করে তার শূন্যস্থান। যেমন নদীর প্রবাহিত জল সাগরে বিলীন হয়, কিন্তু শেষ হয়না। জল বয়ে চলে উৎস থেকে অনন্ত যাত্রায়।

গাছ কাটা শেষ হয়েছে। নিয়ে চলে গেছে শীলাবতীর চরে, শ্মশানঘাটে। এবার নিয়ে যেতে হবে রূপালীর দেহ।

সুসজ্জিত খাটিয়ায় শুয়ে আছে রূপালী। সলেমান আতর এনেছিল। সেই আতর ঢেলে দেওয়া হয়েছে তার শরীরে। রজনীগন্ধার মালা এনেছে শিবু। পরানো হয়েছে রূপালীর গলায়। মাথার পাশে, ধূপদানিতে জ্বলছে সুগন্ধি ধূপ। রূপালীর সিঁথি রাঙিয়ে দিয়েছে গঙ্গা বৌদি। আলতায় সাজিয়েছে পা দুটি। শববাহীরা এবার নিয়ে যাবে রূপালীকে।

কিন্তু ঋষা। সে যে ছাড়তে চাইছেনা তার মাকে। কেউ কোনভাবেই সরিয়ে আনতে পারছেনা ঋষাকে। আমিও পারিনি। বাধ্য হয়ে আবুকে বললাম—আবু তুমি ঋষাকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

আমার বলা কথাটা যেন সবাইকে স্তম্ভিত করে দিল। সবাই তাকাচ্ছে একবার আমার দিকে। একবার আবুর দিকে। আবু ইতস্তত করছে। হয়তো ভাবছে পরিস্থিতির কথা। আবার বললাম—আবু ঋষাকে নিয়ে যাও।

তাকালাম রণজিৎ-এর দিকে। চেষ্টা করছি তার মন বুঝতে। আমাকে বোকা বানিয়ে রণজিৎ বলে—আবু, ঋষাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাও।

স্থবির আবু। আসতে পারেনি ঋষার কাছে। ফতিমা এগিয়ে আসে। বুকে টেনে নেয়

ঋৃষাকে। ঋৃষার ঘন কালো চুলে ফতিমা তার সুন্দর আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে। মুছিয়ে দিচ্ছে চোখের জল।

এক মুসলিম নারী। আসলে তো নারী। জাতপাতহীন মা। তার মতই আর এক মাকে হারিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন আঁধার স্থানে দিক দিশাহীন ঋৃষাকে মাতৃত্বের উত্তাপে ভরিয়ে দিচ্ছে সবার সামনে। যেখানে সবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে প্রচেষ্টা হয়তো হৃদয় থেকে উৎসারিত নয়।

রণজিৎ-এর চোখে মুখে এত বেদনার চিহ্ন, তবু মনে হচ্ছে সে যেন স্বস্তি অনুভব করছে। সে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে মাতৃহীনতার বেদনায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া তার একমাত্র মেয়ে ঋৃষাকে আর এক স্থায়ী ঠিকানার খোঁজ পাওয়া দেখে।

রূপালীর নিথর দেহটা শায়িত আছে সেই খাটটায়, যেখানে সে অসুস্থ হয়েছিল। সেই খাটটা সমেত রূপালীকে নিয়ে চলেছে শিবু, বুটন, সোমনাথ, আশীষ, শম্ভুবাবুরা। সামনে পৃথিবীর সবকিছু শূন্য মনে হওয়া রণজিৎ। ঋৃষা তার বর্তমান ঠিকানার বুকে মাথা গুঁজে নিরব।

মানুষের ঢল নেমেছিল রণজিৎ-এর বাড়ীতে। চলে গেছে অনেকে। রূপালী কি এমন ছিল? কে এমন ছিল? যার জন্য রাস্তার দুপাশে মানুষের ঢল। মানুষের চোখে জল। নাকি রণজিৎ দাপুটে নেতা বলে তোষামোদ!

মানুষের মন বোঝা যায়না বলে আমিও বুঝতে পারিনি। অবশ্য বুঝে লাভ নেই। আর যদি তাই হয় তাহলে তো রণজিৎ-এর কাছে সবাই সহানুভূতি দেখাতে নতজানু হত, কিন্তু কেউ তো তা করছে না।

নিথর দেহটা কাঁধে চড়ে এসেছে শ্মশান ঘাটে। সেখানে তুষু সেরেঙ্গে মেতেছিল উঠতি ছেলেমেয়েরা। সুখচাঁদ ছিল। ছিল লখাই, সুরতি, পারুহীন তুষুর আসর।

সুখচাঁদ মাঝে মাঝে যেত রণজিৎ-এর বাড়ী। যখন রণজিৎ বাড়ীতে থাকতনা, কেন যেত? রণজিৎ কি জানত না? হয়তো না। জানলেওবা কি করত সে। হঠাৎ কি হল কে জানে ছুটে এল রূপালীর নিথর দেহটার কাছে। চিৎকার করে উঠল সুখচাঁদ। মাগো তুই চলাইঙ্গ গিলি; ই ব্যাটাটার কথা, ভুলাঈ গিলি। দিখে গিলি নাই তুয়ার বুড়া বিটাটা রাইমণিকে বাবুয়ার হাতে তুলাই দিবেক বলে...........।

সুখচাঁদ রূপালীর খাটিয়ার পাশে মাথা খুঁড়তে লাগল পাগলের মত। চুল ছিঁড়তে শুরু করল নিজের। কিন্তু একবারের জন্যও স্পর্শ করল না রূপালীর নিথর দেহ, অথবা যে খাটে শায়িত আছে সেই খাট। কেন? সে কি সামাজিক বাধার জন্য। কোন্ সমাজ?

বন্ধ হয়ে গেছে তুষুর বন্দনা। অথবা খেউর মাখা সেরেঙ্গ। সবাই হেঁড়ের নেশায় বুঁদ। কিন্তু ভুলে যায়নি। মুখিয়া যা করে তাই করতে হয় সবাইকে। সবাই কাঁদছে, সবাই সমস্বরে উচ্চারণ করছে মুখিয়ার বলা কথা কটি।

রণজিৎ ছুঁয়ে আছে রূপালীর শবদেহ। মাথা নিচু ছিল তার। চোখদুটো ছিল রূপালীর নিমিলিত চোখে স্থির।

ঘটনার অভিঘাতে সবারই চোখ সুখচাঁদের দিকে। রণজিৎ অনেক কিছু হারিয়েও জিতল সুখচাঁদকে। তার গোঁড়ামী থেকে সে সরে এসেছে।

তাহলে, রূপালী কি..........।

জানেনা কেউ। কি বলেছিল রূপালী। কি বলে অবশ করেছিল সুখচাঁদের জেদ। যা না রণজিৎ, না আমি, কেউ পারিনি।

সলেমান দাঁড়িয়ে আছে জামগাছের তলায়। আবু হিজলের মাটি ফুড়ে বেরিয়ে আসা শিকড়ের উপর বসে আছে শীলাবতীর দিকে চেয়ে। ঋষাকে বাড়ীতে আগলে রেখেছে ফতিমা, আসেনি সে।

শীলাবতীর চরে, যেখানে পারুকে দাহ করা হয়েছিল, তারই পাশে সাজানো চিতা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। সুখচাঁদ দেখছে আগুনের লক্‌লকে শিখাটাকে। বিলাপ করছে—

মাগো, তুয়ার কথা রাখবক মা, হুই যে আগুনটা জ্বলছে, উয়ার নামে দিব্যি কেটে বুলছি, তুই উয়াদের আশীর্বাদ করবি যিখানেই থাকনা কিনে। তুই আমার ভুল ভাঙ্গাঈ দিছু মা। তুই আমর বুজা চোখ দুটা খুলাইঙ্গ দিছু মা। তুই আমার...........।

নিরব হয়ে গেছে সুখচাঁদ। মায়াবী পরিবেশ, আগুনের শিখা আর কাঠ ফাটার শব্দে অদ্ভুত বেদনা। বেদনা কির্ত্তনীয়াদের বিদায়ী সুরে, বিদেহী আত্মার প্রতি।

আর সলেমান? দূরে হাঁটু মুড়ে বসে দুহাত তুলে দোয়া চাইছে তার আরাধ্যের কাছে।

শেষ হল শবদাহ। কির্ত্তনীয়াদের গলার ভাঙা সুর শেষ। শেষ হয়ে গেছে আগেই তুষু সেরেঙ্গে সর্বোচ্চ খেউর। সুখচাঁদ পিছন ফিরে দেখছে। আর বিলাপ করতে করতে চলে যাচ্ছে বাড়ীর পথে। আবু অনেক আগেই চলে গেছে। উদাস দৃষ্টি রণজিৎ-এর। চিতায় জল ঢালার পর উড়তে থাকা শেষ ধুঁয়াটুকু দেখছে সে। হয়তো রূপালী ঐ ধুঁয়ার ভর করে চলে যাবার আগে বলছে—বিদায় রণজিৎ। প্রিয়তম আমার। তুমি আমার ঋষাকে দেখ। ও যেন কষ্ট না পায়।

বিড় বিড় করছে রণজিৎ। ঠোঁট দুটো তার নড়ছে ক্রমাগত। একটা হাত তুলেছে শরীর থেকে প্রায় একশ দশ ডিগ্রী কোণ করে। হাতের আঙ্গুল, আর পাতা আলগা। নাড়ছে রণজিৎ তার ডান হাতটা। বিদায় জানাচ্ছে রূপালীকে। চির বিদায়। শীলাবতীর পারে হিজলের তলায় যেন রাত্রির নিস্তব্ধতা। কেউ কথা বলছেনা। যেন বিকালেই রাত্রি গভীর।

সবাই চলে গেছে যে যার জায়গায়। একা রণজিৎ আর আমি বাড়ীর পথে। যেতে যেতে বললাম—রণজিৎ?

বলল—অনিন্দ! বলতো আমি কি হারালাম।

জীবন তো এই রকমই। হারতে হয়, হারাতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়।

সে কথা বলছিল, অনিন্দ। বলছি আমি আমার ক্লান্তিতে শান্তির শ্রেষ্ঠ আশ্রয়কে হারালাম।

আর ঋষা!

সে যেন দগ্ধ দিনের ক্লান্ত ছায়া, একা!

এভাবে বলছিস্ কেন? ঋষা বড় হয়েছে। সে মানিয়ে নিতে পারবে সবকিছু। মানিয়ে নিতে হবে। সে জানে। অন্ততঃ আজ জেনে গেছে জীবন পর্যাপ্ত সময়ের জন্য নয়। জীবন অনন্ত নয়। জীবন শরতের মেঘেব মত। যেটুকু সময় পায় মাটি ভেজায়, উম্মাদনা এনে দেয় ফসলের মনে। নতনের সন্ধানে।

কিন্তু.........।

কোন কিন্তুর স্থান নেই রণজিৎ। আজ এখান থেকে ঋষাকে ভাবা তুই তার বর্তমান। তুই তার মা, বাবা। ওর পিছনে সময় দে। ভুলে যা তোর অতীত।

রণজিৎ-এর চোখে আবার একবার জল দেখলাম। রূপালীর জন্য। দেখলাম ধীর পদবিক্ষেপে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে যাওয়া।

আমি সাথে গেলাম রণজিৎ এর বাড়ী। অনেক মানুষ সেখানে। আছে ঋষা। ফতিমার বুকে সংলগ্না হয়ে। তার চোখ লাল, অনেক কান্না শেষে। তার টুকটুকে ফর্সা মুখ লাল। তার পরিপাটি কুঁকড়ানো মাথার চুল এলোমেলো। দষ্টি উদাস দুপুরের মত! নাকি মধ্যরাত্রির শূন্যতার মত।

হঠাৎ একটা কালো মেঘ এসে ঢাকা দিল নীল আকাশ। একটা দমকা বাতাস নাড়ালো নদীর ধারে, ঘরের পিছনে, বাঁশ বাগানের বাঁশগুলোকে।

পৌষের শেষ দিনটার বিষাদ বোধহয় এভাবেই সরিয়ে দিচ্ছে আকাশের ঘন কালো মেঘ, আর ঝোড়ো বাতাস। কিন্তু আগামী দিন!

রূপালীর মৃত্যু নিয়ে গেল অনেক কিছু। রণজিৎ-এর উদ্যাম জীবন, এক বল্গা আচরণ। ঋষার মসৃনতা, চলার পথে। দিয়ে গেল স্থিরতা, একাগ্রতা, দায়িত্ব। বর্ষা শেষে ফসলের প্রতি মাঠের যেমন।

রণজিৎ বাড়ী থেকে বেরোয় কম। সব মিটিংয়ে যায়না। পার্টীও বোধহয় সহানুভূতিশীল হয়ে মুক্তি দিয়েছে অনেক কিছু থেকে। কিন্তু পাশে আছে সবসময়। কখনও ছায়া হয়ে, কখনও কায়া নিয়ে। কেবল যেতে হয় কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে, অন্যান্যরা যখন ইতস্তত করে। যেতে হয় ঋষার অনুমতি নিয়ে। ঋষা তো রণজিৎকে বাধা দেয় না। তবু যেন রণজিৎ তাকিয়ে থাকে ঋষার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

রণজিৎ ফতিমার বাড়ী আর তেমন যায়না। ফতিমা বরং মাঝে মাঝে আসে। আসে

ঋষার কাছে। মাতৃস্নেহ নিয়ে। ফতিমাও তো পেরিয়ে এসেছে তার বাঁধন ছাড়া দিনগুলো। সে চাওয়া নেই। রণজিৎ এরও বোধহয় আর ভাললাগে না। অথবা স্থির হয়েছে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্মাদনা। কিন্তু সমাজ। সমালোচনা, বিদ্বেষ, হিংসা ওদের তো শৈশব নেই, বার্ধক্য নেই, জ্বরা নেই, মৃত্যু নেই। প্রতি মূহুর্তেই ওদের যৌবন। টগ্‌বগ্‌ যৌবন। ক্ষুরধার প্রজ্বলিত।

ওরা বাসা বাঁধে মানুষের যৌবনে। মানুষের প্রৌঢ়তায়। মানুষের বার্ধক্যে। এমনকি মানুষের অসুস্থতাও। ওরা বোধহয় অমরত্ব বর নিয়ে কাটিয়ে চলেছে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বৎসর, যুগ, যুগের পর যুগ।

ঋষা বদলাচ্ছে আস্তে আস্তে। রূপালী নেই। নিসঙ্গতার বন্ধু নেই। বন্ধ ঘরে গুমোট, শেকলবাঁধা একাকিত্ব। রণজিৎ সঙ্গ দেয়। কিন্তু সেতো মা নয় অথবা মা-এর মত বন্ধু নয়। তাছাড়া রণজিৎও তো বদলে গিয়ে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে একটা ব্যূহ। সেখানে প্রবেশাধিকার কারও তেমন নেই। এমনকি ফতিমারও। আগে ছিল। আজ নেই। আজ থেকেও নেই।

আবু আসেনা কেন? জিজ্ঞাসা করে ঋষা তার নিজের মনকেই। কেন আসবে সে। সমাজ বলে তো কিছু আছে। সে তো দেখেছে। তার কানে তো গেছে সমালোচনার তীব্রতা। তাছাড়া সে পড়াশুনা করছে মেদিনীপুর কলেজে। সেখানেই থাকে সে। আসে প্রতি শনিবার। চলে যায় সোমবার।

একটা দিনও তো থাকে। অথচ আসেনা। কার কাছে প্রকাশ করবে ঋষা তার মনের ব্যাকুলতা। কার সান্নিধ্যে উন্মুক্ত করবে নিজেকে।

কথায় কথায় ঋষা জিজ্ঞাসা করে ফতিমাকে—আবুদা আসেনি? আসলে আসে না কেন?

ফতিমাও তো অস্থির হত, রণজিৎ একদিন না গেলে। যাওয়া মানেই তো মিলনের মুহূর্ত নয়। মিলন সুখে অবগাহন নয়। তার থেকেও বড় কথা সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে দেখা। তার প্রতি বিশ্বাস, আস্থা প্রতিদিন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

ফতিমা বুঝতে পারে ঋষার অন্তরমহল। সস্নেহে মাথায় হাত রেখে বলে—আসবে, সময় হলেই আসবে।

কবে আসবে?

যে কোন দিন।

না কাকীমা। আমি জানি সে আসবেনা।

না মা। তোমার ভাবনা ভুল। সে আসবে।

আচ্ছা কাকীমা। আবু আমার কথা বলেনা? জিজ্ঞাসা করেনা—আমি কেমন আছি? কি করছি?

বলে। জিজ্ঞাসা করে।

নিরব হয়ে যায় ঋষা। হয়তো ফতিমার দেওয়া উত্তর দুটো নিজের মনে প্রতিস্থাপিত করে চেপে রাখে বেশ কিছুক্ষণ। যেমন থার্মোমিটার চেপে রাখে জিভের তলায়। শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য।

হয়তো আবুর মনের তাপমাত্রা মাপছে ঋষা।

প্রায় প্রতি রাত্রে ঋষা ঘুমিয়ে পড়ার পর রণজিৎ মদ খায়। ঋষা জানে। হঠাৎ এক রাত্রে ঘুম ভেঙে বাবাকে দেখতে না পেয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখেছিল। রণজিৎ আকণ্ঠ পান করে দূর আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা। কোন কিছু না বলে নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল ঋষা। ঘুমোতে পারেনি সেদিন।

পরের দিন বলে—বাপী, এইভাবে না ঘুমোলে শরীর খারাপ করবে যে!

ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় মাথা নিচু করে বলেছিল রণজিৎ এবং সেই প্রথম কারও কাছে নয়, নিজের মেয়ের ভয়ে কথা দিয়েছিল রণজিৎ। আর ওভাবে রাত্রি জাগবেনা। কিন্তু কথা দিতে পারেনি—মদ খাবেনা বলে।

রণজিৎ সকালে এসেই আমাকে বলে—জানিস্ অনিন্দ, ঋষা চায়না আমি মদ খাই।

সেতো কোন মেয়েই চায়না, তার বাবা ওসব খায়। কোন স্ত্রী চায়না তার স্বামী ওসব খায়।

না, আমি ঠিক তা বলছি না। তুই বিশ্বাস কর, আমি কোন কিছুই ভুলতে পারছি না। কেমন যেন অসহায়তা আমাকে গ্রাস করছে। চেষ্টা করছি। তার থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু পারছি না।

কিন্তু তুই যা করছিস্, শান্তি কি আসবে? মনে রাখা ভাল ঋষা বড় হয়েছে। ওর মতামত বা ইচ্ছা অনিচ্ছার একটা দাম আছে।

জানি, জানি অনিন্দ, কিন্তু..........।

একাকিত্বের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে হলে, ঋষার পিছনে সময় দিতে হবে। ঋষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই বুঝতে পারবি তুই অসহায় নয়। ঋষারও অসহায়তায় তুই উপযুক্ত সাথী।

সেদিনই মনে মনে প্রতীজ্ঞা করে রণজিৎ। সেদিন থেকেই ঋষার সাথে আরও একাত্ম হয় রণজিৎ। ঋষা যেন শ্রেষ্ঠ নির্ভরতার খোঁজ পায় রণজিৎ-এর কাছে। রূপালীর অভাব ভুলতে থাকে একটু একটু করে। তবু যেন কেমন ছটফট্ করে তার মন। একটা শূন্যতায় ভরে যায় তার অন্তরমহল। বুঝতে পারেনা, বাবাকে বলবে কিনা। লজ্জাবোধ তাকে নিস্পৃহ করে দেয়। কিভাবে বলবে। কি ভাববে বাবা। মনে মনে ঠিক করে নেয় ফতিমাকাকীমাকে দিয়ে ব্যাপারটা বাবার কানে তুলবে।

কিন্তু ফতিমাকাকীমাকেও তো সবকিছু বলা যাবেনা। সে তো জানেনা ঋষা আবুকে সত্যিই ভালবাসে। সে তো জানে আবু-ঋষা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সেই ছোটবেলা থেকে। যদিও বিভিন্ন সমালোচনা তার কানে গেছে। বিভিন্ন কটূক্তি শুনতে হচ্ছে বিভিন্ন সময়। তবুও।

সিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্তহীনতায় কেটে গেছে আরও দুটি বৎসর। পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছু। রণজিৎ-এর মাথার চুলে সাদা পোচ পড়েছে। চোখে উঠেছে চশমা। ফতিমার শরীর ভেঙে গেছে কয়েকবারের জ্বরে। সলেমান হারিয়েছে তার আব্বা আম্মাকে। নিজেও বুড়ো হয়েছে। ঠিকাদারী আর সহ্য হয়না বলে দেশওয়ালী একটা ছেলেকে এনে দায়িত্ব দিয়েছে তার হাতে। জমিও কিনেছে কয়েক বিঘা। চাষআবাদ করে। তেমন রোজগার নেই বলে দুশ্চিন্তাও গ্রাস করেছে সলেমানকে।

আবু মেদিনীপুরের পড়া শেষ করে স্নানোকোত্তর করার জন্য ভর্তি হয়েছে বর্ধমানে। সেখানে কিছু টিউশন পড়ায়। নিজে পড়াশোনা করে। আবু জানে, তার আব্বার আয় কমেছে। সমস্ত খরচ জোগাতে হয়তো পারবেনা, তাই আব্বাকে আর্থিক দিক থেকে যতটা সম্ভব মুক্তি দেওয়াই তার ইচ্ছে।

ঋষাও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। অঢেল টাকা ঋষাদের। তবুও কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেনা ঋষা। এরই মধ্যে গাঁয়ের কিছু হিতৈষী মানুষ রণজিৎকে ঋষার বিয়ের ব্যাপারে বললে, শোনার পর ঋষা জানিয়ে দিয়েছে— সে এখন বিয়ে করবে না। কোন চাপ দেয়নি রণজিৎ। মা হারা মেয়ের মতকেই বেশী গুরুত্ব দেয় সে। ঋষাও খুশি। কলেজ হোস্টেলে না থাকার কারণ রণজিৎ জানে। রণজিৎ জানে ঋষা রূপালীর প্রাত্যহিকতার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। ঋষা ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। ঋষা স্নান সারে সকাল হতে না হতেই। ফুল তুলে। মায়ের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরকে পুজো করে। শঙ্খ বাজায়। সব সারা হলে রান্নাঘরে যায়। চা তৈরী করে। নিজে খায়। বাবার বিছানায় দিয়ে আসে। যেমনটি করত রূপালী। তারপর কাজের মেয়ে আসে। ছুটি হয় ঋষার। বই নিয়ে বসে তার পড়ার ঘরে। নটা বাজলে খাওয়া সেরে বেরিয়ে যায় কলেজের উদ্দেশ্যে। ফেরার পথে টিউশান সেরে বাড়ী ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়। রণজিৎ দাঁড়িয়ে থাকে বাসস্টপে। ঋষা ফিরলে একসাথে আসে বাড়ী। সবদিন যে কলেজ যায় তা নয়। যেদিন টিউশন থাকে সেই দিনগুলো কখনও কলেজ বন্ধ করেনা ঋষা।

সেদিন রবিবার। স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছে ঋষা। বাথরুমের পিছনেই পুকুর। পুকুরের ঘাটও বাথরুমের লাগোয়া। ঋষার কানে আসে পাড়ার দুজন মেয়ের কথপোকথন।

এবং বিভিন্ন মেয়েলি সমালোচনা। আজ তারা অন্য সমালোচনায় মশগুল। আবু বাড়ী এসেছে। কালিপদর স্ত্রী বলছে—এবার দেখনা, কি সব হয়।

বিশুর বউ বলছে—কি আবার হবে। হতে কি কিছু বাকী আছে। মাগে মা, রুচিকে বলিহারি যাই। জাত, বেজাত মানল না, একেবারে মুছুরের সাথে!

ঘেন্না ধরে যায়। ইচ্ছা যায় বেশ করে দুকথা শুনিয়ে দিই। তোমার দেওর দেখাশুনা আনল, বলে কিনা, বিয়ে করব না। চৌধেতালী মেয়ে কোথাকার!

তা করবে কেন? করলে আবুর সাথে ঢলাঢলি করবে কে? যেমনি বাপ, তেমনি হয়েছে তার ঝি। ছি ছি গায়ে কি চামড়া নেই?

রক্ত যাবে কোথায়। এমনিকি রূপাদিদি মরেছে। চিন্তায় চিন্তায়। সত্যি, মাটির মানুষ ছিল। তবে যাই বল, মরে শান্তি পেয়েছে। নাহলে আরও কত কি দেখতে হত। মেয়ের যা উড়নচণ্ডী মন।

হঠাৎ বোধহয় কেউ এসে গেছে। তাই বন্ধ হয়ে গেল সমালোচনা। কিন্তু ঋষা যা জানার জেনে গেল।

জেনে গেল, গাঁয়ে তাদের অবস্থান। তার প্রতি পাড়ার মেয়েদের লোকদেখানো ভালোবাসা। জেনে গেল আবু এসেছে। অনেক দিন পরে। এসেছে গতকাল।

কান্না পাচ্ছিল ঋষার। গতকাল আবু এসেছে, অথচ কেউ তাকে খবর দেয়নি। অথবা দেখাও করতে আসেনি আবু। কান্না পাচ্ছিল, তাকে নিয়ে এসব খারাপ সমালোচনা শুনে। এরা তো জানে, প্রতিদিন ঋষা এই সময় বাথরুমে থাকে। স্নান করে। তাহলে কি ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋষাকে শুনিয়ে বলছিল। ঘৃণা জন্মাতে শুরু করে ঋষার। ঐসব মেকি ভালমানুষদের প্রতি। ওরা সামনে কত প্রশংসাই না করে। কত ভালভাল কথা—ঋষা, মা আমার জানিস, তোর জন্য আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। কি হতভাগা তুই!

কান্না শুকিয়ে যেন আগুন ঝরতে থাকে ঋষার চোখ থেকে। ইচ্ছা করে বাপিকে বলতো—দেখ বাপি তোমার সামনে কারা? তোমার পিছনে ছুরি হাতে কারা।

সবকিছু ছাড়িয়ে আবুর কথা মনে আসে ঋষার। কতদিন দেখিনি। প্রায় একবৎসর। আবু কি বদলে গেছে? আবু কি আর ভালবাসে না? আবু কি অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে? হাজার প্রশ্ন মনে ভীড় করে ঋষার। যার উত্তর তার জানা নেই।

চোখে মুখে বার বার জলের ঝাট নেয় ঋষা। জলগুলো জমে এক একটি বড় বিন্দু হয়। বিন্দু ফেটে আবার ঝরে পড়ে মুখ থেকে। বাথরুমের আয়নায় নিজেকে বার বার দ্যাখে ঋষা। দ্যাখে তার অনাবৃত শরীর। যে শরীর-মন আবুকে সমর্পণ করবে বলে অনেক আগেই স্থির করে রেখেছে।

অথচ সেই আবু গতকাল এসেও তার সাথে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। নাকি, তার কানেও এসেছে এমনই সব সমালোচনা। যা তাকে ভীতু, দুর্বল করে দিয়েছে।

আজ অনেক দেরী হচ্ছে ঋষার। সে দেরী নিজেকে অন্যভাবে আবিষ্কার করার জন্য।

অন্যান্য দিন ঋষা বাথরুম থেকে বেরিয়ে রণজিৎকে বলে—বাপী স্নান সেরে নাও। বাধ্য সন্তানের মত রণজিৎ ঢুকে বাথরুমে। প্রাতঃকালীন কাজ সারে। স্নান করে। তারপর বাপবেটি একসাথে টিফিন খায়।

দেরী দেখে রণজিৎ ডাক দেয়। কিরে মা বেরো। অনেকক্ষণ ঢুকেছিস যে।

ঋষা কি শুনছেনা, নাকি শুনতে পাচ্ছে না। অখণ্ড অন্যমনস্কতার জন্য।

আবার ডাক দেয় রণজিৎ—ঋষা, বেরো। আমি বাথরুমে যাব।

অন্যমনস্কতা ভাঙে ঋষার। লজ্জা পায়। ছিঃ ছিঃ। কখন ঢুকেছি। বাথরুম থেকেই বলে—যাচ্ছি বাপী।

বেরিয়ে আসে ঋষা। তার চোখেমুখে এক অদ্ভুৎ বেদনার স্পষ্ট চিহ্ন। লক্ষ করে রণজিৎ। কিছু বলতে সাহস হয়না। শুধু বলে—খাবার জোগাড় কর। আজ আমাকে একটু বেরুতে হবে।

স্নান সেরে এসে খাবার টেবিলে মুখোমুখি ঋষা, রণজিৎ। জিজ্ঞাসা করে—কিরে মা, আজ এত থম্‌থমে। কি ব্যাপার!

উত্তর দেয়না ঋষা। তাছাড়া কি উত্তর দেবে সে। আবুর জন্য মন খারাপ, নাকি পাড়ার মেয়েদের সমালোচনায় সে বিধ্বস্ত।

খাওয়া সারা হলে পড়ার ঘরে ঢুকে যার ঋষা। রণজিৎ জামাপ্যান্ট পরতে ঢুকে যায় তার ঘরে। বেরিয়ে এসে ঋষাকে বলে—আমি একবার ক্ষীরপাই যাব।

কখন ফিরবে? জিজ্ঞাস করে ঋষা।

ঘন্টা দুই পরে।

চলে গেছে রণজিৎ। ঋষা অন্যমনস্কতা থেকে স্থিরতার লক্ষে চোখ রেখেছে বইয়ে। কিন্তু মন বসছেনা। কেবলই চোখের কোণে জল জমছে তার। একরাশ অভিমান তার মনে। আবু বাড়ী এসেছে অথচ দেখা করতে আসেনি। ফতিমা কাকীমা কথা দিয়েছিল আবু আসলে খবর দেবে। অথচ দেয়নি। অজস্র প্রশ্ন তার মনটাকে ছিন্নভিন্ন করে চলেছে।

হঠাৎ দরজার কড়া নাড়াচ্ছে কেউ। ঋষা যেন উন্মুখ। এই বোধহয় আবু এল। অভিমান থেকে লজ্জা তাকে গ্রাস করছে। কাজের মেয়েকে ডাক দেয়—বিন্দুকাকী? দেখতো কে কড়া নাড়ছে। বোধহয় শুনতে পায়নি বিন্দু। আবার ডাক দেয় ঋষা।

বিন্দু এসে জিজ্ঞাসা করে—কিছু বলছ?

দেখতো। কে আসছে?

দরজা খুলে দেয় বিন্দু। সুখচাঁদ এসেছে। তার হাতে কিছু পেয়ারা।

ডাক দেয়—বেটিয়া আছু নাকি?

বেরিয়ে আসে ঋষা। কি ব্যাপার সুখচাঁদ জ্যেঠু?

বাবা কুথায়?

সে তো ক্ষীরপাই গেছে। কিছু বলবে?

না। তিমন কিছু লয়। পিয়ারাগুলান রেখে দে। খাবি।

পেয়ারাগুলো হাতে নেয়া ঋষা। খুব বড় বড় পেয়ারা। সুখচাঁদের গাছে হয়েছিল।

দাঁড়িয়ে আছে সুখচাঁদ। কোন ভাষা নেই। তার চোখ দুটো কেবল দেখে চলেছে ঋষাকে। সে চোখে অদ্ভুৎ এক মায়া। সে চোখে এক অদ্ভুৎ তৃপ্তি। হাসছে ঋষা, সুখচাঁদকে দেখে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বিন্দু। কারও মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক চলচিত্র যেন।

প্রথম কথা বলল ঋষা। কি হল সুখচাঁদ জ্যেঠু। কি দেখছ, তোমার যে চোখের পাতা পড়ছে না।

কথাটা শোনামাত্রই যেন একটা প্রবল ঝড় উঠলো সুখচাঁদের মনে। সে ঝড় থামলো চোখের কোণ থেকে বৃষ্টি নেমে। দুটো হাত মুঠো করে তার উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল সুখচাঁদ। তারপর বরফের নিরুত্তাপ গলায়, প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল—রূপাবৌদিতো লাই। উ খিত আমর গাছের পিয়ারা। আজ তুয়ার জন্য আনলম। তুই খাবিতো?

পরিবেশ আরও থম্থমে হয়ে গেল মূহুর্তের মধ্যে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ঋষার ছোট্ট সাজানো বুক থেকে। একটা পেয়ারা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ঋষা। চোখদুটো যেন শ্রাবণের মেঘ হতে চাইল সেই মূহুর্তে। তারপর সামলে নিল।

লক্ষ করছে সুখচাঁদ। তুয়ার মা আমার মনটাক্যে বদলাইঙ্গ দিল। আমার বেটিয়া রাইমণির সাথে ইবার বাবুয়ার বিহা দিবক। ই কুথাই বলতে এসেছিলম তুয়ার বাপকে। হ্যাঁরে মা তুই যাবিক ত।

ঋষা জানত সবকিছুই। কিন্তু জানতনা সুখচাঁদ তার সিদ্ধান্ত কেন বদলে ফেলেছে? কি করে?

ঋষার ভাবনাগুলো হয়তো বুঝতে পেরেছে সুখচাঁদ। সে বলে—তুয়ার মাটা মানুষ ছিলনা রে। উ যেন মারাংবুরু। আমার মত খচ্চড় লুককেও বশে আনল।

কি বলছ জ্যেঠু!

হ্যঁরে। আমি ত বলেছিলম বাবুয়ার সাথে রাইমণির বিহা হবেক লাই। কি আছে উয়ার। জমি লাই, লাঙ্গল লাই, হামার লাই, ঘর লাই। উ কিসের যুগ্যি আমার মাইয়ার কাছে। তুয়ার মা আমার ভুলটা ভাঙ্গাই দিল। বুলল—সুখচাঁদ মানুষ কিছুই লিয়ে আসে লাই। সবকিছু তৈরী কুরতে হয়। বুলল—নদীর বাঁধ বাঁধতে লাই। উকে বাঁধলে উ বাঁধ ভাঙে। মাঠ ভাসায়, ক্ষেতি করে। তুখন হাজার মাথা খুঁড়লেও উয়াকে রুখা যাবেক লাই। উয়াকে চলতে দিতে হবেক উয়ার পথে। হ্যঁ বটে। উটাই ঠিক কুথা। উয়াকে চলতে দিতে হবেক উয়ার পথে। তুয়ার মাটা মারাংবুরু বটে ঋষা। ইখন সেলাই। তুই আছা, তুই ই বুড়হাটকে বুদ্ধি দিবিত বেটিয়া?

সুখচাঁদ কথা শেষ করে তাকিয়ে আছে ঋষার দিকে। একরাশ জিজ্ঞাসা নিয়ে।

কি উত্তর দেবে ঋষা। সুখচাঁদ জ্যেঠ যে তাকে রূপালীর আসনে বসাতে চাইছে। সুখচাঁদ রূপালীকে বসিয়েছে দেবীর আসনে। কি ছিল মায়ের মধ্যে?

সুখচাঁদ যেন কথাটা জেনে যেতে চায়। চোখ ফেরায়নি ঋষার চোখ থেকে।

হেসে ফেলে ঋষা। তারপর বলে— জ্যেঠু কিছু খেয়ে এসেছ? নাকি সকালেই............।

বলতে পারেনি ঋষা। জ্বিভে আটকে গেছে কথাগুলো। প্রায় সমস্ত দিনই হেঁড়ে খায় সুখচাঁদ। খেতে হয় তাকে। সে মুখিয়া। সাঁওতাল সমাজের বিচারক। বিভিন্ন গাঁয়ে বিচার করতে যেতে হয়। সাঁওতাল সমাজে বিচারসভা অথচ হেঁড়ে খাবেনা। এতো অবাস্তাব। মুখিয়ার খাতির তার বিড়ম্বনার কারণ। হাসি পায় ঋষার। চেয়ার আছে অথচ বসতে পারছেনা সুখচাঁদ। বার বার চেষ্টা করছে। প্রতিবারই বিফল হয়ে বসে পড়েছে মেঝেতেই।

কি হল জ্যেঠু। চেয়ার খুঁজে পেলেনা? বলার সাথে সাথে হেসে উঠেছে বিন্দু। সুখচাঁদের চোখাচোখি হয়ে যেতে তাড়াতাড়ি রান্নাশালায় ঢুকে পড়েছে বিন্দু।

ভয় পাচ্ছে ঋষাকে। নেশার ঘোরে সুখচাঁদ না জানি কি করে বসে। না কিছুই করেনি সুখচাঁদ। বলে ওঠে, বুঝলি বেটিয়া। সুরতি ছাড়ল লাই। প্রথম কাটেরটা ছ'সাত বাটি খাওয়াঙ্গ দিল। কুথ করে বললম—রনদার ঘর যাব। ইবার বল দিখিনি। কিমনটা হল।

কি আর হল। ওখানেই বস। বিন্দুকে বলি। তোমাকে খাবার দিতে।

ইটাই হল যত কাল। ইমন করেই তুয়ার মাটা আমার মনটাকে গলাইঙ্গ ছিল। কুত যত্ন করে খিতে দিত। আর শুধুই বলত—তুমরা আস, আমার ভীষন ভাললাগে। মনে হয় তুমরা আমার সাহস। আমার মনের জোর।

ও! তাই!

হুঁ রে বেটিয়া। এই সব বুলতে বুলতেই একদিন আমার রাইমণি আর বাবুয়ার কথাগুলান চলেইঈ এল। তুয়ার মা সব শুনে বললকি—সুখচাঁদ, আমরা কদিন বাঁচবেক ছিলে মাইয়ারা সুখী হলে, উদের দিখে মরলে খুব ভাল হয়। তুয়ার কুথা বুলল। সলেমন মিস্ত্রির কুথা বুলল। উয়ার ব্যাটার কুথা বুলল।

তারপর?

সেদিন লগে মনটায় তুয়ার মায়ের কথাগুলান ঘুরপাক খেতি লাগল। কুতযে নিসা করলম। কিন্তু কুথাগুলান রইঙ্গ গিল। ঘুম লাই। কেবল ভাবছি ত ভাবছি। কুখন যে ঘুমাইঙ্গ গিলম। মালুম হল লাই। ঘুমের ঘোরে দেখি কি আমর বেটিয়া আর বাবুয়া! কি সুন্দর লাগছে। দুজনেই আসিছে আমার কাছে। আমাকে গড় কুরছে। বলছে কিনা—বাবুগো, আমরা চলাইঙ্গ যাচ্ছি। তুমি সময় মত খাবেক। ভাল থাকবেক।

ঘুমটা ভাঙ্গাই গিল। উঠে কি, গিলম রাইমণির কাছে। উ তখন লম্ফর আলোয় বসে বসে বই পড়ছে। বসলম উয়ার কাছে। দেখলম উয়াকে। মাথায় হাত রাখি কি বললাম—বেটিয়া! বাবুয়া খুব ভাল ছিলে, না করে?

আমকে জড়াইঙ্গ ধরল আমর বেটিয়া, উয়ার চোখে বান ভাসাইঙ্গ গিল। বললম, ই বুড়হা বাপটকে ভুলাইঙ্গ যাবি লাইত? আসবিক ত তুয়ার বাপটর কাছে?

তারপর?

কেউ জানললাই। বাপ বেটিয়া ছাড়া। বাবুয়া আসে। লুকাইঙ্গ লুকাইঙ্গ। আমর চোখকে ফাঁকি দিবেক কি করে। লক্ষাই উয়াদের লিয়ে যেত মাদার বনে। আমি যেন জেনেও জানিলাই।

বিন্দু খাবার নিয়ে এল। ধরে দিল সুখচাঁদের সামনে। থামে ঠেস্ দিয়ে বসল সুখচাঁদ। ততক্ষণে নেশাটা পাতলা হয়ে গেছে। খাবার শেষ করে বাসন ধুতে যাবে বলে উঠতে গেল সুখচাঁদ।

বাধা দিল ঋষা। জ্যেঠু রাখ বলছি। তোমাকে কে বলেছে সব ধুতে যেতে?

হয়তো ভয়ে। স্রেফ ঋষার ভয়ে রেখে দিল সুখচাঁদ।

ঋষার দিকে তাকিয়ে বলল—বেটিয়া। তুয়ার মা মরে লাই। তুয়ার কাছেই আছে।

আরও কিছুটা সময় কাটিয়ে চলে গেল সুখচাঁদ। তখনও রণজিৎ ফেরেনি। দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে এসে আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখল ঋষা। মনটা বেশ ভাল লাগছে সুখচাঁদের সান্নিধ্যে এসে। ঋষা দেখেছে দারিদ্রের মধ্যে অফুরন্ত সরলতা, সততা, বিনয়। কত সহজে মনকে হ্যাঁচকা টান মেরে নামিয়ে দেয় সোঁদা মাটির মাঠে। কত মসৃন ভাবে মনটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় বন্ধুর পথেও। এরা বা এদের মত মানুষ আছে বলেই সমাজ এখনও টিকে আছে। যদিও ঝড়ে ভেঙে যাওয়া গাছ। তবুও অবশিষ্ঠ গাছের মত।

এরা কত সহজে অবুঝ হয়ে যায়। রেগে যায়। বিদ্রোহী হয়ে যায়। আবার একটু সহানুভুতি, ভালবাসা পেলে হয়ে যায় মাটির মানুষ। অথচ এরা রয়ে যায় তার অবজ্ঞার পাত্র হয়ে। কেননা সমাজ এখন ভীষন জটিল রোগে আক্রান্ত। যারা এই রোগ ছড়াচ্ছে তারা সব জটিল মনের ধান্ধাবাজ মানুষ। যারা যেনতেন প্রকারো নিজের স্বার্থকে কেন্দ্রীয়করণ করে চলেছে চক্ষুলজ্জাহীন হয়ে।

আবু বাড়ী এসেছে অথচ ঋষার কাছে আসেনি। এমনকি তার উপস্থিতিটাও জানায়নি ফতিমা। অথচ সে কথা দিয়েছিল। ঋষার ইচ্ছে করে, সে না আসুক, নিজেই একবার দেখা করতে যাবে। মূহুর্তের মধ্যে বদলে যায় সিদ্ধান্তের পথটা।—না যাবনা। দেখিনা ও কি করে।

রবিবারটা চলে যায় সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তহীনতায়। রাত্রি আসে ভারি হয়ে। এবার ঘুমাবে ঋষা। রণজিৎ এখনও ঘুমায়নি। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করে চলেছে। লক্ষ পড়ে ঋষার। বিছানা ছেড়ে উঠে যায় বাপীর কাছে। বাপীর কাঁধে হাত রেখে বলে—বাপী, ঘুমাবে চল।

ঘুম আসছে নারে।

এত সিগারেট খেলে ঘুম আসবে কি করে!

ঋষার হাত দুটো কাঁধ থেকে সরিয়ে নিজের হাতের বাঁধনে আনে ঋষাকে। বলে—ঋষা!

বলনা।

মানুষ দাঁত থাকতে তার মর্যাদা বোঝেনা—তাই নারে?

হবে হয়তো। কিন্তু তুমি একথা বলছ কেন?

উত্তর দেয়নি রণজিৎ। ঋষার মাথায় হাত রেখে বলে—হ্যাঁরে আবু আসেনি?

চমকে ওঠে ঋষা। হঠাৎ বাপী আবুর কথা তুলল কেন?

ঋষার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে রণজিৎ বলে—জানিস্ ঋষা, আবু কেমন বদলে গেছে!

ঋষার বুকের ভেতরের হাপরটা কে যেন জোরে আরও জোরে টান মারছে। প্রায় নিভিয়ে থাকা আগুনটা গন্‌গনে হচ্ছে ধীরে ধীরে। কিন্তু কোন কিছু প্রকাশ করতে চায়নি ঋষা।

রণজিৎ বলতে থাকে—সকালে আমার সাথে দেখা হল। আমি ডাকলাম। সে সাড়া দিল না। একটুক্ষণ মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করে দাঁড়ালাম। পিছন ফিরে তাকাল আবু। তারপর আবার চলে গেল।

জানিস্ ঋষা, কেন জানি না। আমার খুব খারাপ লাগল। ওদের বাড়ী গেলাম, তোর ফতিমাকাকীকে বললাম। সেও যেন নিরুৎসাহিতের মত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এড়িয়ে যেতে চাইল।

ঋষা কি শুনতে চাইছেনা। নাকি শুনছে বলে বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ। সেই আগুনকে নেভানোর প্রাণপন চেষ্টা করছে ঋষা। তাই তার কথা বলার সময় নেই।

চুপ করে যায় রণজিৎ। নতুন একটা সিগারেট ধরায় সে। ঋষাকে টেনে নিয়ে নিজের কোলে বসায়। তারপর ঋষার খোলা চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলে—ঋষা তোর কি হয়েছে রে? কোন কথা বলছিস্‌না!

কথা বলে ঋষা—বাপী কটা বাজছে?

হাতের ঘড়ি দেখে রণজিৎ। এখন সাড়ে বারটা বাজছে।

বাপী এবার ঘুমাবে চল।

বেশ চল্।

রণজিৎ-এর হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে ফেলে দেয় ঋষা। হাসে রণজিৎ। বুঝতে পারে তার ঔদ্ধত্যের দিন শেষ। রূপালী যা পারেনি ঋষা তাই করছে। বলে—কিরে সিগারেটটা ফেলে দিলি যে?

এবার থেকে কমাতে হবে।

বাধ্য ছেলের মত রণজিৎ বলে— বেশ চেষ্টা করব।

কথা দিলে তো?

দিলাম।

বাপী!

বল্।

আজ তুমি আমার কাছে ঘুমোবে?

কেন? ভয় করে?

না।

তাহলে?

আজ থেকে তুমি আমার কাছেই ঘুমোবে।

হাসে রণজিৎ। সে হাসিতে অদ্ভুৎ তৃপ্তি। সে তৃপ্তি পরাজয়ের। সে তৃপ্তি শ্রেষ্ঠ পিতৃত্বের।

মানুষের এই এক ধরনের অদ্ভুত চরিত্র। কখনও কখনও পরাজয় বরণ করতে ভীষন ভাললাগে। সে পরাজয়ে রাগ হয়না। প্রতিশোধস্পৃহা জন্ম নেয়না। ভেঙে খানখান করে দিতে ইচ্ছে করেনা। মনে হয় যেন এই পরাজয়ে বেলফুলের হালকা মিষ্টি সুবাস। একনাগাড়ে ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে করে। মনে হয় এই পরাজয় যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। ঋষার কাছে ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে রণজিৎ। রূপালীর মধ্যে ছিল অফুরন্ত ভালবাসা। তবু সে বশ্যতা স্বীকার করানোর চেষ্টা করত না। তার মধ্যে ভয় ক্রিয়াশীল ছিল। ছিল সমঝোতার প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টাতে যুক্তির বিন্যাস ছিল। একতরফা ছিল না। ঋষার মধ্যে আছে সবকিছুতে একতরফা মনোভাব। সে মনোভাবের প্রতি রণজিৎ এর সৃষ্টি হচ্ছিল শ্রদ্ধা।

রণজিৎ-এর চরিত্রের একটা অদ্ভুৎ গুণ ছিল। সে গুণ স্থির সিদ্ধান্তের। কারও কাছে বশ্যস্তা স্বীকার না করার। পার্টির সবাই যে পছন্দ করত তা হয়তো নয়। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেতনা। সে কেবল তার ব্যক্তিত্বের জন্য। যদিও তার ব্যক্তিজীবন ছিল অন্যরকম। যা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হত সবাই।

কথায় বলে—মদ আর রক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেনা। তেমনি রণজিৎ-এর চরিত্রের না হারা মানসিকতাটা অর্জন করেছে ঋষা। আবার রূপালীর মত অপরের প্রতি বিশেষ করে দরিদ্রের প্রতি স্নেহ এবং শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শ্রেষ্ঠ গুণটাও দখল করে নিয়েছে ঋষা।

কিন্তু এত নিরুত্তাপ থাকার, বিশেষ করে বুকের মধ্যে যখন আগুন জ্বলছে পূর্ণবিক্রমে, তখনও অপ্রকাশিত রাখার গুণ কোথা থেকে পেল এই ঋষা।

রণজিৎ তা বুঝতে পারেনা। যখন একাই বিছানায় শুয়ে রণজিৎ তাকে প্রশ্ন করে আবুকে নিয়ে। এড়িয়ে যায় ঋষা।

ঋষা রণজিৎ-এর করা প্রশ্নের মাঝেই বলে—জান বাপী তোমাকে বলাই হয়নি।

কি কথা মা?

সুখচাঁদ জ্যেঠু এসেছিল। কয়েকটা পেয়ারাও এনেছে। তোমার জন্য রাখা আছে।

তুই খেয়েছিস?

হ্যাঁ। জান বাপী, সুখচাঁদ জেঠু রাজী হয়ে গেছে।

কি ব্যাপারে?

রাইমণি, বাবুয়ার ব্যাপারে।

ও! তাই নাকি!

হ্যাঁগো বাপী।

বাঃ খুব ভাল খবর। কখন এসেছিল সে?

তুমি চলে যাওয়ার পরে। খুব নেশা করেছিল জ্যেঠু। চেয়ারে বসতে পারেনি।

তাই! হেসে ওঠে রণজিৎ।

এইভাবেই গল্প চলতে চলতে ঘুমিয়ে যায় রণজিৎ, ঋষা।

ভোর হয়েছে। ঘুমোচ্ছে রণজিৎ। ঋষা উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। প্রাতঃকালীন যা কিছু সেরে চা করে বাপীকে ঘুম থেকে তুলে চা দিয়েছে। আজ সে কলেজে যাবে। আজ তার টিউশন আছে।

কলেজে যাওয়ার পথে দেখেছে, আবু কার যেন মোটর বাইকে চড়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ফিরে দেখলনা ঋষাকে।

একবুক অভিমানে একটি মনখারাপের সকাল নিয়ে ঋষা তার হাঁটার গতিকে আরও মন্থর করে মেদিনীপুরের বাস ধরতে গেল বাসস্টপেজে।

কি এমন অপরাধ করেছে ঋষা! অথবা এমন কি ঘটেছে, যার জন্য ওভাবে এড়িয়ে চলে গেল আবু! বুঝতে পারেনা ঋষা।

কলেজে গিয়ে মন বসাতে পারেনি। তার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী অনুষা ব্যানার্জী, যাকে ঋষা তার জীবনের সবকিছু বলে। তাকে বলার পর সে বলে—ছাড়তো ওসব।

এত মন খারাপের কি আছে। তোর কি নেই যে ঐ ছেলেটার জন্য হ্যাংলামো করতে হবে।

কোন উত্তর দিতে পারেনি ঋষা, উত্তর কিই বা দেবে। কার কাছে? অনুষার জীবনেও তো এমন ঘটনা ঘটেছে। সেও তো ভালবাসত তারই গ্রামের দিব্যেন্দুকে।

দিব্যেন্দু গরীব চাষী বাড়ীর একমাত্র ছেলে। নিম্নবর্গীয়। হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, পড়াশুনায় বেশ ভাল। ওদের দুজনেরই বাড়ী ময়নার দনাচক বলে একটা গ্রামে। অনুষারা ভীষন অবস্থাপন্ন বাড়ীর মেয়ে। বাবা অন্নদাশংকর ব্যানার্জী এম.বি.বি.এস. ডাক্তার। পসার বেশ ভাল।

দিব্যেন্দুকে দেখে ভাল লেগেছিল অন্নদাবাবুর। সেই থেকে প্রশ্রয়। শুধু তাই নয়। দিব্যেন্দুর বাবা বিশ্বনাথ কোটাল অভাবের যন্ত্রনায় যখন দিব্যেন্দুর পড়া ছাড়িয়ে দেবে বলে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিজের কাছে রেখে কাঠের কাজ শিখাবে, তখন অন্নদাবাবুই অর্থসাহায্য করে তার পড়াশুনা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। সেই থেকে দিব্যেন্দুর যাতায়াত অনুষার বাড়ীতে। সেখান থেকে ভালবাসা।

দিব্যেন্দু এখন ইঞ্জিনীয়ারীং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। যাতায়াত থেকে ধীরে ধীরে ভালবাসার গভীরতায় ঢুকে পড়ে দুজনেই। যদিও অনুষার মা অপর্নাদেবী চাননি বিজাতীয় সম্পর্ক। কিন্তু বাধ্য হয়েছিলেন মেনে নিতে তার পতিদেবতার যুক্তির কাছে হার মেনে।

তখন অনুষা এবং দিব্যেন্দু আকণ্ঠ পান করে চলেছে একজন অপরজনকে। গ্রামের কানাঘুষোকে পাত্তা না দিয়ে অন্নদাবাবুও তার একমাত্র মেয়ের সুখ স্বপ্নে বিভোর।

হঠাৎ দিব্যেন্দু যেন হাওয়ায় মিলিয় গেল। আসেনা। দেখা করেনা অনুষার সাথে। এইভাবে পাঁচমাস কেটে গেল। একদিন অনুষা শুনল দিব্যেন্দু তার কলেজের একটি মেয়েকে ভালবাসে। শুধু তাই নয় তাকে বাড়ীতেও নিয়ে এসেছে। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য অনুষা তার পাড়ার এক বান্ধবীকে পাঠিয়ে জানতে পারে, ঘটনাটা রটনা নয়।

কথাটা কানে যায় অন্নদাবাবুর। অপমানের যন্ত্রনায় বন্ধ করে দেন আর্থিক সাহায্য।

তার তিন মাস পরে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় অনুষার বাড়ী আসে দিব্যেন্দু। সে যেন রিক্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত একটি মানুষ। অবাক হন অপর্নাদেবী তার গলার শব্দ শুনে। সেদিন অন্নদাবাবু বাড়ীতে ছিলেন না। দিব্যেন্দু ঘরে ঢুকে অপর্নাদেবীকে প্রণাম করতে গিয়েই বুঝতে পারে এ বাড়ীতে যে সুর ছিল, যে সুর সে তুলেছিল তার তাল, লয়, ছন্দতে পতন হয়ে গেছে। তবু একরাশ বিনয় নিয়ে সে তার ভুল স্বীকার করতে গেলে অপর্নাদেবী বলেন—জানি বাবা মানুষ ভুল করে। কিন্তু তার জন্য অন্য কেউ খেসারত দেবে, এমন আশা করা নিশ্চয় কাম্য নয়।

মাসীমা! আসলে...............।

থাক্ বাবা। আমি সব জানি। কারন আমিতো মেয়ে এবং সন্তানের মা।

আমি কি অনুষার সাথে একবারের জন্যও দেখা করতে পারব না?

তা তো আমি বলিনি। তবে যে মন নিয়ে তুমি আগে এ বাড়ী আসতে সে মন নিয়ে নয়।

মাসীমা!

যাও অনুষা ভিতরে আছে।

ভিতরে যায় দিব্যেন্দু। অনুষা তখন টিভিতে একটা সিরিয়াল দেখছিল। দিব্যেন্দুকে দেখেও যেন না দেখার অছিলায় রিমোট নিয়ে চ্যানেল পরিবর্তন করতে লাগল।

ডাকদিল দিব্যেন্দু—অনুষা!

সে যেন শুনতেই পায়নি।

অপর্নাদেবী বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন এমনটিই হবে। তিনি এসে ডাক দিলেন—অনু, দিব্যেন্দু এসেছে। তোর সাথে দেখা করতে চায়।

শুনতে পায় অনুষা। টিভির চ্যানেল ঘুরাতে ঘুরাতে বলে—কে দিব্যেন্দু?

কে দিব্যেন্দু? এর উত্তর মায়ের জানা ছিলনা।

প্রতিশোধ নিয়েছিল অনুষা। দিব্যেন্দুকে একরকম বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে।

সেই দিব্যেন্দু আর আসেনা। এমনকি কখনও সখনও দেখা হলেও তার সাথে কথা বলেনা অনুষা।

মন দিয়ে অনুষার জীবনের একটা অধ্যায়, বলা ভাল প্রথম জীবনের কদম ফুল যখন ফুটল, তার ঝরে পড়ার ইতিবৃত্ত শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল ঋষা। তাকিয়ে ছিল অনুষার দিকে। সে যেন দেখছিল এক অপূর্বাসুন্দরী, দৃঢ়প্রত্যয়ের মানুষকে।

অনুষা বলেছিল—জানিস্ ঋষা, দিব্যেন্দু হয়তো আসতনা।

তাহলে এসেছিল কেন?

আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছল বলে।

তাহলে তোদের ভালবাসা!

হয়তো ছিল, সেটা অতীত।

না অনুষা, তুই ওকে তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করিস্নি। After all সে তোকে ভালবাসে। একটা ভুল হয়তো করে ফেলেছিল।

নারে, আমি তোর যুক্তি মানতে পারছিনা। পুরুষ জাতটাই অন্যরকম। অদেখায় নতুনের খোঁজে চলে যায়। সেখানে মধু খায়। পুরানো হলে অথবা যার মধু খায় সে যখন স্থায়ীত্বের দাবী করে, উড়ে চলে যায় অন্য ফুলের সন্ধানে। অথবা পুরানো ফুলে। কিছু সংলাপ, কিছু নাটক, কিছু অনুশোচণা এবং ক্ষমা চেয়ে আবার মধু খেতে চায়।

আমার মনে হয়, দিব্যেন্দুর সম্বন্ধে তুই যেন বেশী রুঢ় হয়েছিস্।

তা কেন? যে মানুষটার সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ থাকার কথা, সে যদি বিপথে যায়, তাহলে তুই হলে কি করতিস্।

বাজিয়ে দেখতাম।

হেরে যেতিস্, কেন জানিস্, আমরা দুর্বল বলে। আমাদের ভালবাসার ঘরটা বালির ঘর নয় বলে।

হয়তো হতে পারে।

হতে পারে নয়। এই যে আবু! তুই কি ভেবেছিস্, সে সম্পূর্ণই তোর আছে। খোঁজ নিয়ে দেখ, তার মন এখন চতুর্ভুজ হয়ে গেছে। হয়তো অন্য কাউকে নিবেদন করে দিয়েছে তার মন, শরীর।

বিশ্বাস করি না।

পরে করবি। যখন তোর স্বপ্ন ভঙ্গ হবে। ভাল কথা, তোকেতো জিজ্ঞাসাই করা হয়নি।

কি?

শুধু মন দিয়েছিস্ নাকি শরীরটাও।

কিছুটা অংশ।

.তার মানে স্বাদ পায়নি, তাইতো? তাহলে ধরে নে সে চলে গেছে।

কিন্তু তুই তো সব দিয়েছিলি।

সেই জন্যই চলে গেছে।

বুঝলাম না। কোনটা ঠিক্।

দুটোই ঠিক। ওরা পেলেও যায়। না পেলেও যায়। ওরা ঘুরে বেড়ায় ফুলে ফুলে, মধু খেতে খেতে।

সেতো বিয়ের পরেও পারে।

পারে। কিন্তু তৎক্ষনে বাঁধা পড়ে গেছি। পথ খোলা নেই। বাধ্যতামূলক স্থায়িত্ব।

যাঃ, তা আবার হয় নাকি?

হয় হয় খুষা।

সে তো আমরা অর্থাৎ মেয়েরাও একই পথের যাত্রী হতে পারি।

কিন্তু লক্ষ্ণণরেখা...... ।

মানে?

ননদ, শশুড়ী, ভাসুর, দেবর, পাড়াপ্রতিবেশী। তারাতো তখন চর, অনুচর, পাহারাদার, সমালোচক—সবকিছু। অবশ্য তারই মধ্যে যে কেউ কেউ হাতছুট হয়না, তা নয়।

তাহলে।

সেখানেও ঐ একই কথা। হয় অযোগ্য নয় ভ্রমর।

সত্যি অনুষা। তোর তো এসব নিয়ে পি এইচ ডি করা দরকার।

মজা করছিস?

নারে।

অনুষার অভিজ্ঞতার ঝুলিটা থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করছিল ঋষা। সেই সঞ্চিতগুলো যে ঝড় হতে পারে বুঝতে পারেনি। সেই ঝড়ে আবু যেন সরে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে।, কিন্তু উড়ে যায়নি। উড়ে যায়নি, কারন আবুর শিকড়টা তার সমস্ত মনে এমনভাবে প্রোথিত হয়ে আছে যে তাকে নিয়ে উড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্তত মূহুর্তের মধ্যে। ডাল পাতা ভাঙছিল, ভাঙছিল এক একটা মোটা কাণ্ড।

তবু মন খারাপের সন্দেহগুলো বিদায় নিচ্ছিল না। কিছু কিছু প্রশ্ন ঋষার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করছিল। কি করে সেই ছোট্টবেলা থেকে তৈরী হওয়া সম্পর্কের ঠাস বুনন ছিঁড়ে গেল? কেন এড়িয়ে গেল? নাকি মুসলিম বলে তাদের গোঁড়ামী তার মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তাহলে কিসের শিক্ষা, কিসের চেতনা!

সেদিন শুক্রবার। সন্ধ্যেতেই রণজিৎ বাড়ী চলে এসেছে। খেয়াল ছিলনা ঋষার। রণজিৎকে জিজ্ঞাসা করে বলল—বাপী আজ সাততাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলে যে?

ভাল লাগছিল নারে।

কেন শরীর খারাপ?

না না। শরীর খারাপ নয়।

তাহলে?

আজই তোর মা এ বাড়ীতে প্রথম পা রেখেছিল।

চুপ করে গেল ঋষা। কেননা স্মৃতি বড় বেদনার। এটুকু বোঝার বয়স তার হয়েছে। বুঝেছে, মা এ বাড়ীর পুত্রবধু হয়ে আজকের দিনেই এসেছিল।

রণজিৎ হঠাৎ বলে—জানিস্ ঋষা, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছিনা, রূপালী নেই।

ঋষা রণজিতের মাথায় হাত রেখে বলে—বাপী?

বল।

তুমি যেন দিন দিন বদলে যাচ্ছ। এভাবে চললে যে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

তার থেকে তুমি আগে যেমন পার্টির পিছনে সময় দিতে সেভাবেই দাও। মানুষের মধ্যে থাকলে মনটা ভাল থাকবে।

আর ভাল লাগে নারে, ভাবছি, সবকিছু ছেড়ে দেব।

না বাপী। তুমি ছেড় না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে ফেলে রণজিৎ। ভাবতে পারেনি ঋষা।

হ্যাঁরে মা, আবুর সাথে তোর দেখা হয়না? সে কি তোকে ভুলেই গেছে?

কি বলছে রণজিৎ। ঋষা যেন নিজের কানকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেনা। কেননা, এই প্রথম রণজিৎ তার মেয়ের কাছে আবুর সম্বন্ধে হতাশা প্রকাশ করল।

কি উত্তর দেবে ঋষা। আবু তো সত্যি সত্যিই আসে না। দেখাও হয়না তার সাথে। সে এড়িয়ে চলে প্রতিটি সময়। ফতিমা কাকীমা আর আগের মত আসেনা। অথচ রূপালী মারা যাওয়ার পর একটা বৎসর সে আসত প্রায় প্রতিদিন। কি এমন ঘটল যে সবাই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে যাচ্ছে। রণজিৎ একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করে। তার চোখ ঋষার চোখে; উত্তরের অপেক্ষায়।

বিন্দুকাকী চা দিয়ে গেল এই মাত্র। সাথে বাদাম, পেঁয়াজ মেখে আরও অনেক কিছু দিয়ে মসলামুড়ি।

সেই কবে থেকে, ঋষা তখন বেশ ছোট। বোধহয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। বিন্দুকাকীর শশুড়ীই আগে কাজ করত। একদিনের জ্বরে মারা যাওয়ার পর থেকে বিন্দুকাকী স্থলাভিষিক্ত হল তার শশুড়ীর। তার হাতের রান্না তো নয়, যেন হোটেলে খাওয়া হচ্ছে। মশলামুড়ি মাখত খুব সুন্দর।

প্রথম প্রথম রূপালী বলত— বিন্দু, তুই এই মশলামুড়ি মাখা কার কাছে শিখলি বলতো। সবাইকে একেবারে লোভী করে দিচ্ছিস্।

বিন্দু বলত— কেন? ঘরেই তো শিখেছি।

তাহলে তো তোকেই দেখছি গুরু করে নিতে হবে।

কি যে বল বৌদি!

নারে। দেখছিস্ না, তোর দাদা কেমন গোগ্রাসে খাচ্ছে। অথচ আমি মাখিয়ে দিলে ওভাবে খায় না।

লজ্জা পেত বিন্দু। তার লজ্জা পাওয়া দেখে রণজিৎ বলত, তা যাই বলো রূপা, তোমাকে ওর কাছে অনেক কিছু শিখতে হবে।

ঋষা বলত— ও কাকীমা, আমাকে একটু বেশী দেবে। অথচ ঐ ঋষার খাওয়ার জন্য মাথা খারাপ হয়ে যেত রূপালীর। কিছুই খাওয়ানো যাবেনা। ভাত দেখলেই তার কান্না পেত। বিন্দুর হাতে মুড়ি দেখলেই জিভে জল আসত।

রূপালী বলত— বুঝলি বিন্দু, আমি যদি মরেও যাই, তোর মরে যাওয়া চলবে না। মরে গেলে ঋষা আর তোর দাদার অরুচী শুরু হয়ে যাবে।

মজা করে রণজিৎ বলত— ঠিকইতো।

লজ্জায় রান্নাঘরে ঢুকে যেত বিন্দু। রূপালী বলত—জান, বিন্দুর রান্নার হাতটা সত্যিই ভাল। যা কিছুই করে সবই ভাল।

তাহলে তুমি স্বীকার করছ।

যা ভাল তাকে তো বলতেই হবে।

যাক্ বাবা, আমি ভাবলাম তোমার মুখ আষাঢ়ে মেঘ হবে। দেখছি নীল আকাশই আছে।

ডাক দেয় ঋষা—ও বিন্দুকাকী। আমাকে আর একটু মুড়ি দাও। কতটুকু করেছ?

রণজিৎ ঢেলে দিতে চায় তার কিছুটা। বাধা দেয় ঋষা, না না তোমারটা দিতে হবেনা।

বিন্দুকে মাঝে মাঝেই এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। চেয়ে বসে ঋষা, কখনও রণজিৎ। বিন্দু তাই সবার খাওয়া শেষ না হলে তার নিজের ভাগটা খায়না। এতেই তার তৃপ্তি। এইটুকু ভালবাসা পায় বলেই মায়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারেনা বিন্দু। এমনকি তার আত্মীয়স্বজনের বাড়ীও না।

বিন্দু তার ভাগের মুড়ি নিয়ে এসে ঋষাকে দিতে গেলে ঋষা বলে দাও দাও, তোমারটাও দাও।

বিন্দুকাকী। আজ তুমি আমি একসাথে খাব। বলেই বিন্দুর মুড়িটা ঢেলে নেয় ঋষা তার নিজের জায়গায়। রণজিৎ বুঝতে পারে বিন্দু লজ্জা পাচ্ছে। উঠে যায় তার নিজের ঘরে।

টিভি দেখছে রণজিৎ। কি সব হচ্ছে বুঝতে পারছেনা। কেবল জঙ্গিহা॰া, খুন, অপহরণ। দেশের উন্নয়নের খবর নেই। নেই সরকারের নির্দ্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা। আবার পেট্রোল, ডিজের দাম বাড়বে। এমনই দুঃসংবাদ দিলেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। বিশ্ববাজারে নাকি অশোধিত তেলের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে।

কেন যে আমাদের দল সমর্থন তুলে নিচ্ছেনা কে জানে। আমরা যতই প্রতিবাদ করিনা কেন, দায়বদ্ধতা তো থেকেই যাচ্ছে। মাঝখান থেকে আমাদের জনগণের প্রতি এবং জনগণের আমাদের প্রতি বিশ্বাসের যে সেতু, সেই সেতুতে ফাটল ধরছে।

এসবই ঋষার কাছে বলছে রণজিৎ। ঋষা উত্তরে বলে—কিন্তু বাপী, এটা তো তোমাকে বোঝাতে হবে না যে সমর্থন তুলে নিলে দেশ আরেকটা অন্তবর্ত্তী নির্বাচনের সামনে পড়বে। নির্বাচনের খরচ পরোক্ষভাবে চেপে যাবে সাধারণ মানুষের উপর। এটা তো কাম্য নয়।

তা অবশ্য ঠিক।

তাহলে। তোমার মত মানুষের মুখে সমর্থন তুলে নেওয়ার কথা শোভা পায় কি করে?

পাক্কা রাজনীতিবিদের মত কথা বলছে ঋষা। হাসছে রণজিৎ।

কি হাসছ যে? জিজ্ঞাসা করে ঋষা।

হাসব না। তুই যেভাবে তোর মতামত দিলি, শুনেতো মনে হল তুই তাত্ত্বিক রাজনীতিক হয়ে গেছিস্।

এইতো, কিছু বললেই তোমরা মজা করো। ভাবো আমরা এখনও শৈশবকালে আছি। যাই বলি—ভাব, সব বড় বড় কথা।

নারে মা না, তা বলছি না।

হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। বিন্দু হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল ঋষা রণজিৎ-এর কাছে। জিজ্ঞাসা করল—দাদা আর একবার চা খাবে নাকি?

কেন? তোমারও কি ইচ্ছে করছে? তাহলে করে ফেল।

সলজ্জ বিন্দু চলে যায় রান্নাঘরে। চা নিয়ে আসে।

চা খেতে খেতে রণজিৎ ফিরে আসে আবু প্রসঙ্গে। জিজ্ঞাসা করে—ঋষা!

বলনা।

আবুর সাথে দেখা হয়?

না বাপী। কতবার বলব।

বুঝতে পারছিনা। কেন সে এভাবে এড়িয়ে চলছে। জানিস্ ঋষা, মানুষ সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধগুলোও হারিয়ে ফেলছে!

তাকিয়ে থাকে ঋষা রণজিৎ এর মুখের দিকে।

আলো এল এইমাত্র। প্রায় একঘন্টা পরে। ভাগ্যিস অগ্রহায়ণ মাস। নইলে একঘন্টা কাটানো যে কি কঠিন হত, যাদের বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো এসেছে তারাই জানে।

এ বৎসর মাঠে মাঠে ফসলের উন্মাদনা ভীষন। চাষীদের মনে আনন্দের বান ডেকেছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির জন্যই এইসব। রণজিৎ-এর বাড়ীতে চাষের কাজ করতে আসে ক্ষীরপাই, মনসাতলা চাতালের আদিবাসীরা। তারা খবর দেয়—রনাদা এ বৎসর তোমার যা ধান হয়েছে না!

তাই নাকি? তোরাই তো জানিস্। আমি তো মাঠের আল পর্যন্ত দেখিনি।

রণজিৎ বিগত দশ, বার বৎসর মাঠে যাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত করতে পারেনি। কাজের লোকেরা যা বলে তাই আনিয়ে দেয়। ওরাই দায়ীত্ব নিয়ে সবকিছু করে। তখন রূপালীই ওদের মাঝে মাঝে ভুরিভোজ দিত। ওরাও আনন্দে গলে যেত। এখানেতো অনেক চাষী আছে। কই কেউতো এভাবে মজুরদের ভালবাসে না। এভাবে একাত্ম করে

নেয় না। ভালবাসার টান মানুষকে কত যে কাছে আনে! সুখচাঁদ ঠিকই বলেছিল। রূপালী যেন মারাংবুরু। এই ভালবাসার টানেই একগুঁয়ে সুখচাঁদ রাজী হয়েছে রাইমণির সাথে বাবুয়ার বিয়ে দিতে। এই ভালবাসার অধিকার নিয়েই কাজে অকাজে ওরা চলে আসে রণজিৎদের বাড়ী। রণজিৎও ওদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য করে বিপদে আপদে। আর্থিক অনটনে।

এখন রূপালী নেই। সবাই জানে। তবু সবাই আসে। সবাই সহানুভূতির ছোঁয়া দিয়ে যায় ঋষাকে। তারা ঋষার মধ্যে দেখেছে রূপালীকে। ঋষাও যেন তার মায়ের গুনগুলো পেয়েছে জন্মসূত্রে। রণজিৎ খুশি। খুশি ওরাও।

এইতো কদিন আগে পুজো গেল। যারা কাজ করে তারা এসে আবদার করল—এ্য রনাদা, ই বছর হাতটান হইঙ্গ গিছে। ছিলাগুলান পূজা দিখবেক লাই?

ঋষা শুনেছিল ওদের আবদার। সেও বাড়ীতে ছিল। রণজিৎকে ডেকে নিয়েছিল তার পড়ার ঘরে। বলেছিল বাপী—আমাদের তো অনেক আছে। দাওনা ওদেরকে। ওরাতো আমাদের জন্য সবকিছু করে। রণজিৎ পরের দিন সবাইকে একশ টাকা করে দিয়েছিল। অবশ্য নিজে দেয়নি। ঋষার মারফৎ দিয়েছিল।

ঋষা দেখেছিল। ওদের চোখেমুখে অঢেল আনন্দ। ওরা সবাই বলেছিল—তুয়ার মাও ইমন ছিল। সে লাই, তুয়ার মুখের দিকে চেয়েই আমরা ইখেনে আসি। তুয়ার বাপটা বড় ভাল মানুষ বটে।

অথচ রণজিৎ জানত না। রূপালী প্রতি পুজোর সময় ওদেরকে আনন্দ করার জন্য টাকা দেয়।

গর্বে বুক ভরে উঠেছিল ঋষার। মনে পড়ছিল মাকে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল। জীবন যেন এইভাবেই চলে যায়।

রণজিৎ ভাবছিল—এরা যেন সমস্ত জীবন বংশ পরম্পরায় এমনই বিশ্বস্ত থাকে।

সেদিন অঘ্রানের মাঝামাঝি। লখাই এল, এল সুখচাঁদ। রণজিৎ বাড়ীতে নেই। কলেজ যাবে বলে তৈরী হচ্ছিল ঋষা। দরজা খোলা ছিল হাট করে। বিন্দু ঋষার খাওয়া শেষে তার বাসন ধুতে বসেছিল বাথরুমে।

ডাকদিল—ঋষা-রণদা আছু নাকি?

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঋষা বলে—বাপীতো বাড়ীতে নেই।

কুথা গিছে?

জানিনাতো। বোধহয় ক্ষীরপাই গেছে। কেন? কি দরকার ছিল নাকি?

হ্যাঁ ছিলত বটেই। তবে তুকে বলেগিলেও হবেক।

কিন্তু আমি যে কলেজে যাব। আজতো সময় হবেনা। কাল এসনা জ্যেঠু।

কাল? তুই থাকবি?

হ্যাঁ, থাকব।

তাহলে চলরে লখা। বেটিয়া কাল থাকবে বুলছে। কালকেই আসবক। একটা কুথা বেটিয়া, তুয়ার বাপকেও থাকতে বলবি। দরকার আছে।

বেশ তাই বলব।

চলে গেল সুখচাঁদ, লখাই। কি যেন বলতে এসেছিল অথচ বলা হল না।

ঋষা বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ফতিমা এসে হাজির। প্রায় একযুগ পরে।

অবাক ঋষা। কি হল। এ সময় ফতিমা কাকি কেন? অথচ সময় নেই, বেরুতে না পারলে সাড়ে নটার বাসটা ধরা যাবে না। ব্যস্ততার মধ্যে জিজ্ঞাসা করল—কি কাকীমা, হঠাৎ কি মনে করে? কিছু বলবে? ফতিমার চোখে জল, শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে বলল— তোমার বাবা কোথায়?

সে বোধহয় ক্ষীরপাই গেছে।

তার সাথে খুব জরুরী দরকার ছিল।

বেশতো। আপনি অপেক্ষা করুন। বিন্দুকাকী আছে। আমারতো সময় নেই। এক্ষুনি কলেজে যেতে হবে।

হতাশ ফতিমা, তাকাল ঋষার নিরুত্তাপ মুখের দিকে। তারপর বলল, তাহলে এখন আসি। কাল সকালেই আসব।

তাহ আসবেন।

বেরিয়ে গেল ফতিমা। বার বার বাধা পেরিয়ে বেরুলো ঋষা। আজ অনুষা আসবে। তেমনই কথা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। তাছাড়া টিউশন আছে।

কলেজে গিয়ে দেখে, সেখানে ক্লাশ বন্ধ রেখে ছাত্র ফেডারেশন আন্দোলনে নেমেছে। অনিয়মিত ক্লাশ, সময়ে সিলেবাস শেষ না হওয়া, শিক্ষায় বৈষম্যের প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।

ঋষাকে দেখে ছুটে আসে তাদের ক্লাশের নির্বাচিত প্রতিনিধি সায়ন। সায়ন ঘোষ। কি ঋষা। এত দেরী হল। গত সপ্তাহেই সবাইকে বললাম সকাল দশটার মধ্যে কলেজে পৌঁছাতে।

শুনেনি ঋষা, হয়তো বলেছিল। অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বলে, বলনা কি করতে হবে?

কি আর করতে হবে। আজ তোমাকে আজকের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে একটা বক্তব্য রাখতে হবে।

সেকি, আমি কি করে রাখব।

বারে। আমরা সব খবর রাখি। তুমি যার মেয়ে তিনি বেশ উঁচু দরের নেতৃত্বে আছেন। তার মেয়ে হয়ে পারবেনা!

বিশ্বাস কর। আমি কোনদিন মঞ্চতো দূরের কথা, দু দশজনের মাঝেও কোন বক্তব্য রাখিনি। Please অন্য কিছু থাকলে বল, আমি থাকব।

অনুষা ঠেলে দেয় ঋষাকে। ন্যাকামো করিস্‌না, যাতো, দু চার কথা বলে চলে আসবি।

সায়ন যেন একটু ভরসা পায়। কেননা সেই গত দিনের মিটিংতে ঋষার নামটা ঢুকিয়েছিল। অবশ্য ঋষার সম্মতি না নিয়েই। সে জানত ঋষা আসলে, তার হাতে বক্তৃতার একটা গাইডলাইন ধরিয়ে দেবে। সেটা দেখে বাকীটা সাজিয়ে নেবে ঋষা।

অনুষার চাপাচাপিতে শেষমেশ রাজী হল ঋষা। সায়নও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রাজী না হলে মুখে চুনকালি দিয়ে দিত অন্যান্যরা।

সায়ন তার হাতের কাগজটা ধরিয়ে দিল ঋষার হাতে। ঋষা বারবার কাগজ পড়ে প্রস্তুতি সেরে নিল। তারপর ডাক পড়লে জীবনে প্রথম কোন জনসভায়, তার উপর আবার মঞ্চেও বক্তৃতা রাখতে উঠল।

বক্তব্য শেষ হলে ধীর পদক্ষেপে নেমে এসে ডেকে নিল অনুষাকে। ততক্ষণে তার কাছে হামলে পড়েছে সবাই। সবাই বলছে অপূর্ব। ভাবতে পারিনি। সত্যি এতদিনে একজন সুবক্তা পেলাম। এইসব বিশেষণে উদ্বুদ্ধ করছে ঋষাকে।

সায়ন ছিলনা। দৌড়ে এসে ঋষার হাত দুটো ধরে বলে ফেলল।

ঋষা, আমার চোখ ভুল দেখেনা। ইচ্ছে করছে একটা kiss করি।

একটা চাবুক যেন চাবকে দিল ঋষাকে। কুঁচকে গেল দুটো চোখ। বুকের মধ্যে কে যেন ভীষন দ্রুতগতিতে হাপর টানতে শুরু করছে।

আর সায়ন! কথাটা বলে দিয়েই কেমন যেন কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঋষার হ্যান্ডসেকিং দূরত্বে ঋষার হাতদুটো ধরেই।

ছাড়িয়ে নিলনা ঋষা। হয়তো ভাল লাগছিল। কিংবা মনে পড়ে যাচ্ছিল আবুর কথা। সেও ধরে রাখত ঋষার হাত। সায়ন বলল kiss করবে? আবু বলতনা কোনকিছু। কিন্তু তার দুটো চোখ লাল হয়ে যেত। উদাস হয়ে যেত। তারপর সে তার মাথাটা রাখত ঋষার নরম বুকে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ত তার। চুমু খেত ঋষা আবুর কপালে। ব্যাস ওখানেই শেষ।

সেই আবু সরে গেছে। তবে কি প্রতিশোধ নিতে চায় ঋষা। যেন আবুর মনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। যেভাবে সে তার মনটাকে ভেঙে দিয়েছে। যেভাবে সে তারই কলেজে অন্য একটি মেয়েকে সবকিছু সমর্পণ করে রিক্ত, হতাশ করে দিয়েছে ঋষাকে।

অনুষা হাসছে, ঋষা আর সায়নকে দেখে। কে যেন বলল—আরে সায়ন এবার ছেড়ে দে। এখনও অভিনন্দন জানানো শেষ হল না।

সম্বিৎ ফেরে সায়নের। ছেড়ে দেয় ঋষার হাত। চলে যায় ঋষার কাছ থেকে ভীড়ের

মাঝে। হয়তো লজ্জায়। কিন্তু ঋষা। সে তখনও দাঁড়িয়ে আছে স্থানুবত। হয়তো তখনও সায়নের হাতের উত্তাপ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে আছে সে। অথবা আবুর প্রতি মধুর প্রতিশোধ নিয়ে সে শীতল হয়ে গেছে। আর নড়তে পারছে না।

অনুষা ঠেলা দেয়, এই ঋষা! কি হল! ফ্রিজ হয়ে গেলি যে!

যেন লুপ্ত চেতনা ফিরে আসে ঋষার। অনুষাকে দেখে হেসে ফেলে।

অনুষা বলে—বাব্বা, যেন পূর্বরাগ।

কি বললি— যেন পূর্বরাগ?

তাইতো দেখলাম। সায়নকেও বলিহারি। এতক্ষণ কেউ হাত ধরে রাখে। সবাই দেখল, এবার ঠেলাটা বোঝ।

এটাতো ভাবেনি ঋষা। সত্যিইতো, সায়নের হাতের বাঁধন থেকে আগেই মুক্তি নেওয়া উচিৎ ছিল। এবার লজ্জা ভর করে ঋষাকে। কলেজে তার নামে কোন স্ক্যান্ডেল ছিল না। সবাই সমীহ করত তাকে। এবার তো সবাই পেয়ে বসবে।

এই অনুষা, চল, এখান থেকে চলে যাই।

কেনরে ভয় লাগছে?

কেন? ভয় পাবো কেন?

তাহলে চলে যাবি বলছিস্?

এমনি বললাম।

সায়নকে ডাকব?

ইচ্ছে যাচ্ছিল ঋষার, সায়ন আসুক। সায়ন রাজনীতির কথা ছাড়া অন্য কথা বলুক। কিন্তু কি করে অনুষাকে বলবে। সায়নকে ডেকে নে! বলতে হয়নি ঋষাকে। সায়নের কাছে গিয়ে অনুষা কি যেন বলে নেয় সায়নকে। তারপর ফিরে এসে ঋষাকে বলে চলরে বটতলায় দত্ত কেবিনে গিয়ে আজকের দিনটা সেলিব্রেট করি।

তার মানে?

এই যে তুই, এত সুন্দর বক্তব্য রাখলি।

তাই!

হ্যাঁরে। আজকের খরচ সব...............।

আর খোলসা করে বলেনি অনুষা। ঋষাও চাইছিল কলেজ থেকে যত তাড়াতাড়ি চলে যেতে। মনে মনে ভাবছিল—সায়ন ঠিক করেনি। অথচ চাইছিল সায়ন আসুক।

দত্ত কেবিনের কেবিনে বসে আছে ঋষা, অনুষা। আবুর কথাই চলছিল। চলছিল দিব্যেন্দুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা। অনুষা বলে জানিস্, এবার ভাবছি একটা ছেলেকে ধরব।

ঋষা অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করে—ধরব মানে!

ধরব মানে—ধরব।

মানে, নতুন করে প্রেম করবি?

প্রেম করব কিনা জানিনা, তবে বাজাতে হবে।

যা খুশি কর। আমি যেন ওসবে না থাকি।

নারে বাবা না। তোর কোন ভয় নেই। তুই শুধু থাকবি। আর আমার কথায় সমর্থন দিয়ে যাবি।

বুঝলাম না।

বুঝবি, আগেতো আসুক।

আসুক মানে?

রনিকে দেখেছিস্ তো? আরে ঐযে কোঁকড়ানো চুল, শ্যামবর্ণ, লম্বা ছেলেটা। তুই যখন বক্তব্য রাখছিলি, তখন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ও বেশ কিছুদিন পিছনে লেগেছে। ওকে আজ ডেকেছি।

সত্যি অনুষা। তুই পারিস্।

পারি কিরে। আজ সায়ন আর রনির ঘাড় ভেঙে খাব।

না না। ওসব করিস্না। তাছাড়া তুইতো খাওয়াবি বললি!

কখন?

কলেজে।

আমি কি তাই বললাম। আমি বললাম—আজকের খরচ সব......। আমি তো শেষ করিনি।

ও, তাই বল। আমি কিন্তু এসবে নেই।

নেই মানে!

সায়ন, রনি এসেছে গেছে। সোজা কেবিনে। এসেই বলে—-বসতে পারি?

অনুষা চড়বড় কবে ওঠে। বসতে পারি মানে। কতক্ষণ অপেক্ষা করছি।

কি করব বল। দাদা ছাড়ছিল না যে।

তা ছাড়বে কেন? যতসব। বল্ কে খাওয়াবি?

রনি বলে আমি।

সায়ন বলে—না না আমি।

অনুষা সমাধানসূত্র বের করে— বেশ আমি বলছি? তোরা মানবি তো?

দুজনেই বলে—বল্।

আজ রনি খাওয়াবে। পরের বুধবার সায়ন খাওয়াবে। কিরে সায়ন কেটে পড়বি নাতো?

রনি বেয়ারাকে ডেকে নিয়ে মেনু বলে দেয়। বেয়ারা পনের মিনিটের মধ্যে দিয়ে যায় রনির বলে দেওয়া মেনু।

খেতে খেতে অনুষা বলে—হ্যাঁরে সায়ন। তোর হাতে কি ফেভিকল ছিল?

কেন?

তেমনই তো মনো হল। বেচারা ঋৃষার হাতটা যে জ্বলে গেল।

যাঃ। কি সব আজেবাজে বলিস্।

আজে বাজে। নাকি ঋৃষাকে...............

ঋৃষা বলে ওঠে তুই থামবি? নাকি আমি চলে যাব।

না না, তুই চলে যাবি কেন? তুই তো আজকের মূল আকর্ষণ!

রনি বলে ওঠে—Yes, Exectly so.

লজ্জা পায় ঋৃষা, একটু sentimental হয়ে যায়। প্রসঙ্গ বদলে বলে—তা যাই বল ঋৃষা। তুমি যখন মঞ্চে উঠলে, আমার ভীষন ভয় করছিল। একবারে নতুন তো। যদি ফ্রিজ হয়ে বসে। কিন্তু তুমি প্রমান করলে আমাদের ভাবনাই বল আর আশঙ্কাই বল সবটাই ভুল।

কথাটা ঠিকই বলেছে সায়ন। মঞ্চে ওঠার পর ঋৃষার পা দুটো কাঁপছিল ঠক্ ঠক্ করে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বাথরুমে যেতে।

সায়ন ঋৃষার চোখে চোখ রেখে বলে—কি ঠিক বলিনি।

জানিনা।

সায়ন হঠাৎ যেন বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে তার সম্বোধনের ভাষা—থাক ওসব কথা। এবার বলো, তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

উত্তর দেয় অনুষা—ওর কি হল, তোর জেনে লাভ কি?

আরে মূর্খ, তোকে জিজ্ঞাসা করছিনা। যাকে করছি, উত্তরটাতো সেই দেবে। উনি যেন অভিভাবক হয়ে গেছেন।

দেখ্ সায়ন। অভিভাবক হয়তো আমি নয়। কিন্তু আজতো ঋৃষার দায়িত্ব নিয়েছি আমি।

কেন? ঋৃষা কি নাবালিকা। এখনও রাস্তা হাঁটতে শেখেনি?

হেসে ফেলে ঋৃষা। সায়নের কথা শুনে।

রনি যে সেই গাম্ভীর্যের আড়ালে নিজেকে ঢেকেছে, ঋৃষার কাছে ঝাড় খেয়ে। তার মুখে হাসি নেই।

লক্ষ করে অনুষা—কি রনি? তুই যে কালা, বোবা হয়ে গেছিস্। নাকি এ শুকনো রস ভাল লাগছেনা?

ফোড়ন কাটে সায়ন—রনি একটু ভেজা পছন্দ করেতো। তা অনুষা, দাওনা ভাই ওকে একটু ভিজিয়ে।

হাসিতে যেন ফেটে পড়ে ঋষা।

আসলে যাকে যার ভাল লাগে তার সব কথাই মধুর লাগে।

অনুষা বলে—এবার তাহলে ওঠা যাক। কি বলিস্ সব।

ঋষা সম্মতি জানিয়ে বলে—হ্যাঁ উঠে পড়তে তো হবেই। তাছাড়া অনুষা আমাদের বাড়ী যাবে। একটু তাড়াতাড়ি উঠলে আমারও ভাল হয়।

সায়ন বলে—সেকি শুধু অনুষা, আমরা নয়!

উঠে পড়ে ঋষা, তারপর সবাই।

অনুষা আসেনি। কথা ছিল ঋষার সাথে আসবে। সায়ন বলেছে, একদিন আসবে ঋষার বাড়ী। ওরা সব রাজনীতির মানুষ। সময় কোথায়। কলেজ, পড়াশুনা, মিটিং, মিছিল নিয়ে ওদের দিন কাটে। সায়নকে দেখে মনে হয় সে বেশ ভদ্র ছেলে। কলেজে ঐটুকু ব্যাপার ছাড়া দত্ত কেবিনে ছিল ভীষণ শান্ত। ভীষণ রকমের romantic। অনুষাও প্রশংসা করেছে সায়নের। কিন্তু রনিকে কেবল লোভ দেখিয়েছে। কেবিন থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসার সময় অনুষা বলেছিল, জানিস ঋষা কোন ছেলের প্রতি আর ভরসা হয়না। ওরা সবাই দিব্যেন্দু। কিন্তু সায়ন অন্যরকম। ওর সম্বন্ধে কোন স্ক্যান্ডেল নেই। অথচ ভীষন বড়লোকের বাড়ীর ছেলে সায়ন।

তারপর বলে—তুই ভুলে যা আবুকে। ওরা বিশ্বাসঘাতক। যারা অতীত ভুলে যায়, যারা সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকুও দেখায়না, তাদের জন্য চোখের জল ফেলার অর্থ নিজের কাছে নিজে হেরে যাওয়া।

রনিওতো ভাল ছেলে।

নারে। ওকে তুই চিনিস্না। এখনই দুজনকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। এবার আমি ওকে ঘোল খাওয়াব।

না না। ওসব করিস্না। বেচারা তোর জন্য............।

দিব্যেন্দুও তো আমার জন্য...............। অবশ্য আবুও তোর জন্য অনেক নাটক করেছে।

ছাড়তো ওসব।

একা একা বাড়ী ফিরেছে ঋষা। রণজিৎকে বলে গেছল—বাপী আজ আমার এক বান্ধবী আসবে। একা ফিরে আসতে রণজিৎ জিজ্ঞাসা করে— কিরে তোর বান্ধবী আসবে বললি। তুই একা যে?

না বাপী, সে আজ আসতে পারল না।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

রণজিৎকে বলছে বুঝবে না। হাসে রণজিৎ। মেয়ে বলছে বুঝবে না।

বলে—বুঝে কাজ নেই।

জান বাপী। আজ আমাদের কলেজে সায়নের সাথে পরিচয় হল। সায়ন ঘোষ। ভীষন ভাল ছেলে। কি বলছিল জান— সে একদিন আমাদের বাড়ী আসবে।

রণজিৎ লক্ষ করে ঋষাকে। আশ্বস্ত হয় রণজিৎ। সে তো জানত ঋষা আবুকে ভালবাসে। জানত ঋষার মনে ভীষন কষ্ট। কারণ আবু আসে না। আবু এড়িয়ে চলে ঋষাকে। সে দেখেছে, ফতিমাও এখন আসেনা বললেই হয়। এমনকি তার বাড়ী গেলে সে চেষ্টা করে এড়িয়ে যাওয়ার। তাছাড়া সলেমান এখন বাড়ীতেই থাকে। কাজের সাইডে যায় না।

ফুরিয়ে যায় ভালবাসা, যখন স্বার্থসিদ্ধি হয়। ফুরিয়ে যায় হৃদয়ের টান, যখন অবৈধ প্রনয়ী বুঝতে পারে সে যে অভাবে অন্য কাউকে না হলে চলত না, সে অভাব মিটে গেছে। সে তো আর স্ত্রী নয়, যে একে অপরের চির পরিপূরক হয়ে জীবন কাটাবে সুখে, দুঃখে। আনন্দে বিষাদে। অভাবে-স্বচ্ছলতায়।

রণজিৎ-এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই ফতিমা আসেনা। আবু বড় হয়েছে। দুদিন পরে চাকরী পাবে। স্বচ্ছলতা আসবে। সুতরাং রণজিৎ তুমি ফিরে যাও নিজ নিকেতনে।

খুব বেশী মনে পড়ছে রূপালীকে। মনে পড়ছে পারুকেও। যে কখনও কোন বিশেষ নির্ভরতার জন্য সবকিছু দেয়নি রণজিৎকে। কেবল ভালবেসেছিল। যার জন্য অপেক্ষা করত পৌষ সংক্রান্তি থেকে পৌষসংক্রান্তি পর্যন্ত। ফতিমা ডাকত প্রায় দু-তিনদিন অন্তর। বিনিময়ে পারু চাইতনা কোনকিছু। ফতিমা চাইত সলেমান যেন অঢেল কাজ পায়। চেয়েছিল এক টুকরো জায়গা। যেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে। সবাই জানে সলেমান মূল্য দিয়ে জায়গা কিনেছে। কিন্তু সলেমান, ফতিমা, রণজিৎ জানে ফতিমাকে জায়গা দান করেছে রণজিৎ এবং করেছে ফতিমার আব্দার রাখতে।

কোন এক বিশেষ মূহুর্তে ফতিমা বলেছিল— তোমার মেয়ে, আমার আবু ভীষন ভাল জুটি হবে। কিন্তু সমাজ কি মেনে নেবে?

রণজিৎ বলেছিল—মানিনা সমাজ। ভালবাসার জাত নেই। ধর্ম নেই। আর্থিক বৈষম্য নেই। ভালবাসা অন্ধ।

সেই থেকে মনে মনে পোষন করেছিল রণজিৎ, আবু, ঋষা যেন সুখী হয়। আবু ঋষা যেন একে অপরের জীবনসঙ্গী হয়।

রূপালী বাধা দিয়েছিল। রণজিৎ-এর যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছিল সবকিছু।

সবকিছু চলছিল ঠিকভাবেই। রূপালী মারা যাওয়ার পর থেকেই প্রদীপ যেমন তীব্রতা নিয়ে জ্বলে নিভিয়ে যায়, তেমনই বোধহয় নিভিয়ে গেল ওদের দুজনের ভালবাসার প্রদীপটা।

সায়নের কথা শুনে রণজিৎ খুশি, হয়তো এই সায়ন ভুলিয়ে দেবে আবুর অস্তিত্ব। কিন্তু ঋষা কি ভুলতে পারবে?

বিন্দু চা দিয়ে গেছে। সাথে তার হাতের বিখ্যাত মশলা মুড়ি।

ঋষা বলে বিন্দুকাকী তোমার আছেতো?

হাসে বিন্দু। আছেতো বটেই। একটু বেশীই রেখেছি।

কেন?

দাদা যদি চায়।

রণজিৎ বলে—নারে বাবা, না।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে ঋষা, রণজিৎ। সকাল হয়েছে তার নিয়ম মেনে।

ঋষা আজ কলেজ যাবেনা। শরীরটাও ভাল নেই বলে ভোরে বিছানা ছাড়তে পারেনি। বিন্দু এসে চা করেছে। চা দিয়ে গেছে দুজনকেই।

সকালেই এসেছে লখাই, সুখচাঁদ। গতকালই তারা বলে গেছল আজ আসবে বলে।

কেন কে জানে আজ সুখচাঁদ্র হেঁড়ে খায়নি। খায়নি লখাইও। ধোপদুস্তর জামা কাপড় পরে এসেছে তারা।

তখন ঋষা, রণজিৎ টিফিন করছে।

এসেই সুখচাঁদ বলে—এ্য বেটিয়া, সকালরেই চলে এলম। তুয়াদের খাবার সময়।

ঋষা বুঝতে পারে সুখচাঁদ কি বলছে। জিজ্ঞাসা করে— তোমাদের নিশ্চয় খাওয়া হয়নি।

হবেক কি করে। সাঁওতালদের তো ভোরের বেলা খাওয়া। তুবে আজ রাঁধে লাই। কাজে যাবেকলাই বলে।

তাহলে এখানেই খেয়ে নাও।

বুলছ।

তুবে খাইয়ে লিলেই হয়। কিরে লখা, তুই কিছু বলছ লাইযে।

সায় দেয় লখাই—হ্য, খাইয়ে লিতে দোষ কি। ভুখও লাগছে বুটে।

ডাক দেয় ঋষা—ও বিন্দু কাকি, জ্যেঠু আর লখাকাকুকে খেতে দাও।

বিন্দু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বলে—সেটাও খাওনি।

সুবদিনই কি উটা হয়।

ওটা না খেলে যে মানায় না।

হ্য। তুয়ার খ্যাসা কুরে কুথা বলা।

ঋষার দিকে তাকিয়ে বলে—দেখছু বেটিয়া, মাইয়াটার কুথাগুলান।

না না, এমনি মজা করছিল আরকি।

সে ত বুঝলম।

খাবার এনেছে বিন্দু। খাবারগুলো ডাইনিং টেবিলে রাখতেই সুখচাঁদ বলে—ইটা কিমন হল বটে। আমরা শলা মাঠে, ঘাটে, মাটিতে বুসে খাইয়ে খাইয়ে বুড়হা হইঙ্‌গ গিলম। উখানে খেতি পারবক।

রণজিৎ বলে— বেশ তো। মেঝেতে বসেই খাও।

হ্য, ইটাই হক কথা।

খেতে খেতে রণজিৎ জিজ্ঞাসা করে—এবার বল, তোমরা কি বলবে বলছিলে।

রণজিৎ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মন বোঝার চেষ্টা করে সুখচাঁদ। তারপর বলে—রণদাদা, ই বছর খুব জুম করে তুষু মেলা হবেক।

হঠাৎ, এমন ভাবনা?

বেটিয়াকেও বুলেছি। বাবুয়ার সাথে আমার রাইমণির বিহা দিবক। উয়ার লগে বাবুয়াকে ইখানে আসতে বুলেছি। রাইমণি সেরেঙ্গ লিখবেক। সুর দিবেক। বাবুয়া, লখাই উয়ারা গাইবেক। সেই যে পারু মরাইঙ্গ গিল, সে বছর থিকে কিমন যেন ঝিম্ মেরে ছিল আমদের দলের তুষু সেরেঙ্গ। ইবার আখড়া চলছে। উয়াদের হারাতে হবেক।

ঋষা বলে—রাইমণি গান লেখে। সুর দেয়।

হ্যাঁগো বেটিয়া, সেই লগেই তো বুলছি।

কবে হবে?

কিনে পৌষসংক্রান্তির দিনে। আর একটা কুথা, এ বেটিয়া, তুই ত জানু, আমাদের উখানে সবাই গরীব লোক বটে। তুয়াকে তাসাপাটীর খরচা দিতে হবেক। না বললে চলবেকলাই।

হ্যাঁ, বলে দেয় ঋষা।

তাহলে উ কথাই রইল। থেমে যায় সুখচাঁদ। ঠেলা মারে লখাইকে। লখাই কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলে। সুখচাঁদ ধমক দেয় লখাইকে। তুই যে কিম্মন? শুধুই ফাঁকে বলে ফড়র ফড়র।

কেন আর কিছু বলবে? জিজ্ঞাসা করে ঋষা।

বলছিলম কি, যদি কিছু মনে না করুত রাইমণি তুকে আনতে আসবেক, তুই যাবিত?

যাব জ্যেঠু, অবশ্যই যাব।

আর একটা কুথা।

আবার কি কথা?

আবুকেউ সঙ্গে লিয়ে যাতি হবেক।

হঠাৎ যেন লয়কারী ঘটে যায় সুখচাঁদের সকালের সেরেঙ্গে। মাথা নিচু করে নেয় ঋষা। রণজিৎ তাকায় সুখচাঁদের দিকে।

নিরবতায় শব্দ ভাঙ্গে সুখচাঁদ—এ্য বেটিয়া, ইমন চুপ হইঙ্গ গেল যে?

কোন উত্তর নেই ঋষার কাছ থেকে।

নিজের চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে সুখচাঁদ বলে—ভুল হইঙ্গ গিছে রে।

লখাই বলে—তুমাকে বললুম, উসব বুলতে হবেক লাই। নিশা না করেই তুমার মাথাটা হড়কাইঙ্গ গিছে।

উঠতে যায় সুখচাঁদ। রণজিৎ বলে—সুখচাঁদ, চাঁ খাবে?

মাথা নাড়তে নাড়তে সুখচাঁদ বলে—না আর খাবক লাই।

কেন?

বেটিয়া কিমন হইঙ্গ গিল। আমর মনটাও খারাপ হইঙ্গ গিল।

এলাকায় সবাই জেনে গেছে আবুর সাথে ঋষার সম্পর্ক। এমনকি দুটো গ্রাম পেরিয়ে সাঁওতাল পল্লীতেও। হয়তো রণজিৎ এর মেয়ে বলেই। কিংবা দুটো সম্প্রদায় আলাদা বলে।

ঋষার মনে শুরু হয়েছে ঝড়। সে ঝড়ের নাম আবু। মনে পড়ে যাচ্ছে অনুষার কথা। সায়ন যেন বিদ্যুৎ হয়ে মাঝে মাঝে চলে আসছে প্রবল ঝড়ের সাথে।

ঋষা অস্থিরতার সীমা অতিক্রম করে এখন স্থির। মনে মনে স্থির করে নেয় এসব ভেবে কি লাভ।

সুখচাঁদ এবার চলে যাবে। চলে যাবে লখাই। তার আগে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

তাহলে রণদাদা, আমাদের কুথাটা যেন মনে থাকে।

হাসে রণজিৎ, সে হাসিতে প্রশ্রয়। সুখচাঁদ, লখাইও হাসে। সে হাসিতে নিশ্চিন্ততা।

আমাদের গাঁয়ের নাম ঝালুর। আমাদের গাঁয়ের আদিবাসী পাড়া, দুলে পাড়াতে মহড়া চলছে তুষু গানের, সন্ধ্যে থেকেই। মাতন লেগেছে মনে। খেয়াল নেই রাত্রি বাড়ছে। মাঝে মাঝে মাদলের বোল তুলছে আদিবাসীদের র‍্যাণা, হপন, ধিতা, ধিতা, তাং তাং তাং। কখন ধামসা-গিদা; গিদা, গিদ্যা, গা, গিদাং গিদাং গিদাং; চলছে চিৎকার। সে চিৎকারে হেঁড়ের সম্মোহন।

চেম্বার বন্ধ করে বারান্দায় বসে শুনছি, দুলেদের লখাই গাইছে—

আমাদের তুষু লাইতে যাবে
শীলাবতীর জলেলো,
সোনার হার রাখবে খুলে
শীলাবতীর চরে লো।
(যদি) চুরি করে সেহার ওরা
ওদের ঐ ঘাটের মড়া
রয়ে যাবে ঘাটে লোত
বলবে হেসে তুষ মোদের
কেমন ফল পেলি লো।

সঙ্গের জুড়িদাররা বলে চলেছে—চরে লো, চরে লো।

রাজনীতির জটিলতা ওদেরকে ছুঁতে পারেনি। তুষু গানের অঢেল আনন্দ যেন দারিদ্র নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হারিয়ে যায়নি লোক সংস্কৃতি।

এত কষ্ট, এত দৈনতা তবু মনে হয় ওরা কত সুখী, আর আমরা দিনকে দিন হারিয়ে ফেলছি আমাদের বুনিয়াদি সংস্কৃতি। পরিবর্তে যা আমদানি করছি তা কেবল সস্তা চটকদারি। অকাল যৌনতা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আর অনাস্থা।

ঠিকই বলেছিল রণজিৎ, সে দিন বিজয়া দশমী, সদ্য যৌবন যৌবনাদের অন্য উন্মাদনা দেখে। জানিনা অনিন্দ, এখন প্রেম বলে কিছু নেই, শুধুই যৌনতা। ভুলে যাওয়া কেন যে বলেছিল সেই জানে।

সেই বিজয়া দশমীর দিনেই রণজিৎ বলে অনিন্দ! চলনা স্মরাণঘাটে যাই।

কেন রে?

এসব ভাল লাগছেনা। সব যেন কেমন নকল নকল।

নকল নকল? নাকি—রূপালীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বলে ওখানে যাবি বলছিস্।

হয়তো তাই। তার সাথে আরও একজনের।

পারু?

হ্যাঁরে।

চল তাহলে।

একটু অপেক্ষা কর। এই মিনিট দশ, আমি যাব আর আসব। রণজিৎ কোথা গেল, আমি জানি। ফিরে এল মিনিট পনের পরে।

আমার বাড়ীতেও কেউ নেই। চলে গেছে বাপের বাড়ী। একা একা ভালও লাগছিল না। তাছাড়া পূজোর আনন্দ বলে যা সব চলছে, মনের মধ্যে টানটা আলগা হয়ে গেছে, দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চললাম, শীলাবতীর সেই চরে, শ্মশানঘাটে। যেখানে দাহ করা হয়েছিল পারুকে, রূপালীকে।

যেতে যেতে জিজ্ঞাসার করলাম—খৃষা কি করছে?

সে বাড়ীতে নেই।

কোথা গেছে।

আর বলিস না, ওর এক বান্ধবী অনুষা ওকে পূজোতে নিয়ে গেছে মেদিনীপুর।

কবে?

গত পরশু।

তাহলে তুইও এখন একা। ভালই হল, আজ আমাদের বাড়ীতেই থেকে যাবি।

নারে, তা হবে না। বিন্দু রান্না করে রাখবে। আমি না গেলে বেচারা খেতে পারবে না।

ভীষণ ভালরে, তোর ঐ বিন্দু। এমন মেয়ে আজকাল মেলে না।

ও সবই রূপালীর সংগ্রহ।

তাই!

হ্যাঁরে। নিজের হাতে ওকে তৈরী করেছে। কে জানে রূপালী হয়তো জানতো, সে চলে গেলে দেখার কেউ থাকবে না। তাই নিজের মত করে ওকে ....

চোখ দুটো ছলছল করছিল রণজিৎ এর।

ইদানিং রণজিৎ ভীষণ আবেগ প্রবন হয়ে যায়। হয়তো ফেলে আসা দিনগুলোর দাম্ভীকতা হারিয়ে গেছে বলে। কিংবা বিগত সময়ে ওকে ঠিক সময় দিতে না পারা যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে বলে।

এমনই হয়। কথায় বলে, "দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম" আমরা বুঝি না। চলে গেলে বুঝতি পারি। রণজিৎ হয়তো মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে রূপালী থাক। আর না থাকার পূর্ণতা, শূণ্যতার পার্থক্যটা।

বললাম—রণজিৎ।

যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটা হালকা অথচ প্রাণছুঁয়ে যাওয়া শব্দের মত শোনাল রণজিৎ এর কথাটা—বল।

সবকিছু মনে পড়ে যাচ্ছে তাই নারে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাসই আমার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল।

রণজিৎ তাকিয়ে আছে জামবনের দিকে। যে বনের বুক চিরে চলে গেছে একটা রাস্তা। আগে বেশ চওড়া ছিল। নাম ছিল অহল্যবাই রোড। সেটা ক্রমশ সরু হতে হতে বড়জোর একটা গরুর গাড়ী যাওয়ার রাস্তায় পরিণত হয়েছে। ঐ রাস্তাটা শীলাবতীকে দুপাশে রেখে উঠেছে নদীর উত্তর পারে। নদীটার ঐ উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে বালি জমতে জমতে হয়েছে সেই চর। যেখানে পারু চির নিদ্রায় রয়েছে। আর কোনদিন জাগানো যাবে না। আছে রূপালী, পৃথিবীর সৌন্দর্য আর তার মেয়েকে ভুলে শেষ সয়ানে। নদীর জল বয়ে চলেছে কুল কুল, কুল কুল, কুল্ কুল্।

ওরা রণজিৎ-এর প্রিয়তমা দুই পৃথিবী। আর একজন ফতিমা, সে এখন আর আগের মত নেই।

ডাক দিই—রণজিৎ।

যেন চমকে ওঠে রণজিৎ। তারপর একটু হেসে বলে—বল!

তুই কি এখন এখানে ছিলি না?

কি যে বলিস্।

এখানটা ভীষণ বেদনাদায়ক, তাই না?

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রণজিৎ এর বুক ঠেলে।

একটা পেঁচা ডেকে উঠলো জামবন থেকে, ক্যারর, ক্যারর, ক্যারর ক্যারর।

বললাম রণজিৎ, এই নিরবতার মাঝে পেঁচার ডাকটা কত সুন্দর লাগছে, তাই নারে?

হুঁ।

কিরে কি এত ভাবছিস্?

ভাবছিনা, শুনছি।

কি?

তুষু গানের মহড়া চলছে।

এবার তো চলবেই। আর তো সবে মাস খানেক বাকী।

জানিস্ অনিন্দ! সুখচাঁদ, লখাই গেছ্‌ল আমাদের বাড়ী। এ বৎসর ওরা ভীষণ জমাটি করে তুষুর আসর বসাবে।

তাই!

সুখচাঁদ বলছিল রাইমণি মেদিনীপুরে তুষুগানের ক্যাসেট করেছে।

বুঝলাম না।

ও তোকে তো বোধহয় বলিনি, নাকি বলেছিলাম মনে নেই।

কি?

বাবুয়ার সাথে রাইমণির ব্যাপারে সুখচাঁদ রাজী হয়ে গেছে। ওরা দুজনেই আসবে তুষুর আসরে।

খুব ভাল খবর।

জানিস্ অনিন্দ, সুখচাঁদ ঋষার কাছে আব্দার রেখেছে এবারের খরচ দেওয়ার জন্য।

ঋষা, নাকি তোর কাছে?

ঐ হল আরকি।

দেব। তাছাড়া ওরা এবার এক অভিনব অনুষ্ঠান করবে।

কি রকম?

শীলাবতীর দক্ষিণ দিকে থাকবে এদিকের লোকেরা। তারা তাদের মত করে গান করবে। ওপারে অর্থাৎ উত্তরে থাকবে রাইমণি, বাবুয়া, সুখচাঁদ, লখাইরা। একটা প্রতিযোগীতাও হবে।

তাই কি আমাদের ওখানে সমস্ত রাত্রি ধরে মহড়া চলছে?

হয়তো হবে। জানিস্ অনিন্দ! আমরা হলাম সুখচাঁদের প্রধান অতিথি।

খুব ভাল খবর। কিন্তু রণজিৎ, সে দিন কি আর ফিরে আসবে? যেখানে পারু নেই ....

হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে রণজিৎ এর মন। উদাস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সেই হিজল গাছটা যেখানে ছিল, এখন মরে গেছে। সেই জায়গাটার দিকে।

বললাম—রণজিৎ!

কোন উত্তর দেয়নি রণজিৎ। আমি স্কচের বোতল খুলে ব্যাগে রাখা দুটো গ্লাসে ঢেলে রণজিৎকে বললাম—রণজিৎ শুরু কর।

হাত বাড়াল রণজিৎ, গ্লাসটা নিয়ে শেষ করল সবটা। আবার নিল, আবার নিল।

এইভাবে কখন যে রাত্রি বেড়েছে বুঝতে পারিনি। একটা টর্চের আলো এবং তার জিজ্ঞাসু ডাক আমাদের একাগ্রতা ভেঙে দিল—কে ওখানে?

ভীষণ লজ্জা লাগছিল আমাকে, ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা। তাড়াতাড়ি স্কচের বোতলটা ছুঁড়ে দিলাম নদীর বুকে। গ্লাস দুটো ব্যাগে ভরে নিলাম দ্রুততায়। লোকটি খুব

কাছে। একবারে হ্যান্ডসেকিং দূরত্বে। টর্চের আলো রণজিৎ এর মুখে ফেলে বলল—কি রণদা, এখনও এখানে? এদিকে তোমাদের গাঁয়ে একটা আস্ত লড়াই হয়ে গেল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেল রণজিৎ এর। লড়াই মানে?

সলেমানকে গাঁয়ের শিবু, বুটনরা ভীষণ মারধর করল যে।

কি বলছিস্ রতন। ওকে মারল কেন?

ওখানে গেলেই বুঝতে পারবে।

যেন একটা ভয় গ্রাস করল রণজিৎ-এর মনে। সাথে অন্য একটা আশঙ্কা। সে আশঙ্কা আবু আর খৃষাকে নিয়ে। কিন্তু এখন তো ওদের মধ্যে তেমন সম্পর্ক নেই। তাহলে কি ওদের ভয়েই যোগাযোগ রাখেনি আবু! স্পষ্ট হতে লাগল সবকিছু। শিবু, বুটনদের রাগ ছিল অনেক আগে থেকেই। কারণ ফতিমা ওদের আমল দিত না, ওরাই বিভিন্ন প্রচার চালাচ্ছিল গোটা গাঁয়ে। সে প্রচার নোংরামিতে ভরা।

বললাম—রণজিৎ। তুই তাড়াতাড়ি যা।

যাব। কিন্তু ....।

এখানে কিন্তুর কোন স্থান নেই। সলেমানরা একা, হয়তো আরও অনেককিছু ঘটতে পারে।

ওখান থেকে সোজা চলে এলাম সলেমানের বাড়ী। এসে দেখি বিধ্বস্ত ফতিমা। সলেমানের সমস্ত শরীরে কালশিটে। বাড়ীর আশেপাশে কেউ নেই। কিছু গ্রামবাসী, তারা চলে যাচ্ছে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে।

রণজিৎ কাছে গিয়ে সলেমানকে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার?

কথা বলার মত অবস্থায় ছিল না সলেমান। তার কান বেয়ে রক্ত ঝরছে তখনও।

ফতিমা বলে ওঠে—আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। সেই বিশ্বাসের দাম দিয়ে গেল সবাই। এবার আপনাদের পালা।

ফতিমা, রণজিৎ-কেউ আপনি বলছে। তার চোখে মুখে স্পষ্ট ঘৃণার ছাপ।

কি অপরাধ আমরা করেছি? কার বাড়া ভাতে আমরা ছাই দিয়েছি আপনারা বলতে পারেন? নাকি মুসলিম বলেই আজ সবাই মিলে আমাদের একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করি—কি এমন ঘটে গেল, যার জন্য ওরা এভাবে ....

আমরা নাকি সমাজটাকে কলঙ্কিত করছি। আমরা নাকি বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়িয়েছি? আমি নাকি চরিত্রহীনা, গাঁয়ের ছেলে ছোকরাদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছি! খৃষার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছি আবুকে।

বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, আমরা চাইনি খৃষা আবুর মধ্যে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠুক। খৃষার মায়ের ইন্তেকাল হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে শিবু, বুটনরা শাসিয়ে গেছল।

এমনকি বলেছিল কোনদিন যদি আবুকে ঋষার সাথে দেখি খুন করে দেব। তখন থেকে আবু ঋষার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেনি। তাহলে আজ কেন এই বুড়ো মানুষটার এই দশা করল বলতে পারেন।

রণজিৎ যেন স্থবির হয়ে গেছে। রণজিৎ-এর দুটো চোখে জ্বলছে আগুন।

আমি রণজিৎকে বলি—কিরে, তুই চুপ করে থাকবি?

কোন উত্তর দেয় নি রণজিৎ, কোন সান্ত্বনাও দেয়নি ফতিমাকে, এমনকি আহত, যন্ত্রনাকাতর সলেমানকেও।

আমি রাজনৈতিক নেতা নয়, এমন কি গাঁয়ের হর্ত্তাকর্তাও নয়। তবু বললাম—সলেমান ভাইকে হাসপাতাল নিয়ে যান। পরে সবকিছু ভাবা যাবে।

মুখিয়া সুখচাঁদ তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছে। শুনেছে আদিবাসী সম্প্রদায়। ভীষণ খুশি লখাই, খুশি সুরতি। কিন্তু পিছিয়ে থাকা সমাজ। যারা কিছুদিন আগেও সুখচাঁদকে তার জেদের জন্য পছন্দ করত। যারা বিশ্বাস করত আদিবাসী মানে পরের বাড়ীতে জনমজুরি খাটা। কাজ থেকে ফিরে হেঁড়ে খাওয়া, তারা কি করে মেনে নেবে রাইমণি শিক্ষিতা হোক, বা কোন শিক্ষিত কারও সাথে বিয়ে হোক। মেনে নিতে পারেনি বলেই সুখচাঁদের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে ভিতরে সুখচাঁদের বিরুদ্ধে তাদের সম্প্রদায়কে উস্কিয়ে দিচ্ছিল বিভিন্ন সময়। জানতে পেরেছিল সুখচাঁদ। বলেছিল রণজিৎকে।

রণজিৎ বলেছিল—বুঝলে সুখচাঁদ। সমাজ বদলাচ্ছে। তার সাথে পা ফেলে চলতে না পারলে চিরকাল অন্ধকারের জীব হয়েই থাকতে হবে। এই যে তুমি। রাইমণিকে শিক্ষার আলোতে নিয়ে চলেছে, এতে গর্ব হওয়া উচিৎ।

কিন্তু রূপচাঁদ, সেটা কিনে অন্য কুথা বুলছে।

ওদের কথায় কান দিও না।

সুখচাঁদ ওদের কথায় কান দেয় নি। তাই তুষে আগুন জ্বালাচ্ছিল ওরা। মুখিয়া, দোর্দন্ডপ্রতাপ সুখচাঁদ কেমন যেন ঝিমিয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

ঋষা জোগান দিচ্ছিল, রণজিৎ জোগাচ্ছিল উৎসাহ, তাই হয়তো ঋষা, রণজিৎ এর প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ছিল সুখচাঁদের। আপনজন হয়ে যাচ্ছিল ভীষণভাবে।

পূর্ণ উদ্যমে চলছে তুষু গানের মহড়া, পূর্ণ উদ্যমে লক্ষীন্দররা নেমেছে। সুখচাঁদ বিরোধিতায় রূপচাঁদ নেমেছে। দল ভারী হচ্ছে রূপচাঁদদের। পরোয়া নেই সুখচাঁদের।

লখাই যেন ফিরে পেয়েছে তার হারানো যৌবনকে। পারু বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেছে তার উৎসাহের জোয়ারে। সুরতি প্রস্তুতি নিচ্ছে মনে মনে। অনেক হেঁড়ে তৈরী করতে হবে। অনেকে আসবে, তাদের আপ্যায়ন করতে হবে। একদিনও কাজে যাওয়া বন্ধ করেনি লখাই, সুরতি। অনেক টাকার দরকার। চাল কিনতে হবে, কিনতে হবে হেঁড়ে ভেজানোর জন্য বাখড়।

আমার গ্রামেও চলছে সাজো সাজো রব, চলছে মহড়া।

সীতারামের সাথে দেখা হল আমার ডাক্তারখানায় ওষুধ আনতে এসেছিল। কথায় কথায় তুষু ভাষানের কথা তুললাম—কি সীতারাম, এবৎসর তো শুনছি খুব জমাটি আসর হবে?

হ্যাঁ সে তো বটেই।

তা তোমরা যা আরম্ভ করেছ। রাত্রের ঘুম চলে যাওয়ার জোগাড়।

কিনে গো ডাক্তরবাবু। আমাদের সেরেঙ্গ ভাল লাগছে লাই,

তা বলছিনা, বলছি এত জোরে মাইক বাজালে ....

কিনে বাজাচ্ছি বল্‌দিখিনি। হুই সুখচাঁদ খুড়ারা শুনতে পাবেক। উয়াদের ঘাবড়াইঙ্গ দিতে হবেক লাই।

কিন্তু এরও তো একটা খারাপ দিক আছে।

কিনে?

তোমাদের জারিজুরি ওরা ধরে ফেলবে, তোমাদের হারানোর জন্য নতুন গান বাঁধবে, অথচ ওরা কি করছে তোমরা বুঝতেই পারবে না।

একটুক্ষণ চিন্তা করল সীতারাম, তারপর কয়েকবার ঘাড় নাড়ল বিজ্ঞের মত।

হুঁ বটে। সিটাতো ভাবি লাই, সুখচাঁদ খুড়ার বেটিয়া তো আবার লিখাপড়া জানে। উত জবাবটা আগের থিক্কে লিখাই লিয়ে আমাদেরকে হারাইঙ্গ দিবেক।

এবার বুঝতে পারছ তাহলে। সুতরাং সীতারাম; তোমরা মাইক বন্ধ করে মহড়া দাও।

হ্য, হ্য, আজলেই বন্ধ করাইঙ্গ দিবক।

তাড়াতাড়ি ফিরে গেল সীতারাম। সেইদিন আর মাইকের শব্দ শোনা যাইনি।

পরের দিন আবার এসেছিল সীতারাম। এসেই বলে—এ্যা ডাক্তারবাবু।

তুয়ার কুথা সবলোককে বললাম। সবাই বলল—উটা ঠিক কুথাই বটে।

তাহলে।

হ্যগো ডাক্তারবাবু, তুমাকে একটা কুথা বুলব, সুখচাঁদ খুড়ারা যেন কখনও জানতে না পারে।

কি এমন কথা?

শালবনী থিকে সুকুমণি এসেছে। উও কলেজে পড়ে।

সেও কি তোমাদের সাথে ভাসানে যাবে?

না সিটা লয়। তুবে উ আমাদেরকে কটা গান লিখে সুর করাইঙ্গ দিবেক বুলেছে।

বাঃ, তাহলে তো আসর ভীষণ জমে উঠবে।

সে আর বুলতে। ইবার দিখে লিব কুন দল্ল হারে, কুন দল্ল জিতে।

তাই!

হ্যাঁগো ডাক্তারবাবু, সুখচাঁদ খুড়োর হুই যে চামচাটা, উলখাই, উ বলে কিনা ইবার সীতারামকে ঘোল খাওয়াইঙ্গে ছাড়বক। বল দিখিনি আঁতে লাগবেক লাই।

সে তো বটেই।

হ্যাঁগো ডাক্তারবাবু। একদিন চলনা কিনে আমাদের পাড়ারলে, আমাদের সুকুমণির গলায় সেরেঙ্গ শুনতে। একবারে আসলি সেরেঙ্গ। আহা সুরত লয়, যেমন আকাশটা ভাঙ্গাই পড়ছে মাটিরলে। চাঁদটা আলো ফিলছে সুরে সুরে।

বেশ, যাব একদিন।

কিন্তুক, একটা কুথা, উয়াদেরকে বলা চলবেক নাই।

কেন বলব?

কিনে আর, তুয়ারত উয়াদের উখানে যাওয়া আসা আছে, তাই বললম আরকি।

আনন্দের শেষ নেই ওদের পাড়ায়। সুকুমনি গান লিখে সুর করেছে। সেই গান গাইতে গাইতে চলে গেল সীতারাম।

আমাদের তুষুর মনটা ভাল
কারও ক্ষতি করে না,
তোদের তুষু বিষের থলি
কামড়ালে আর বাঁচে না।

কি অপূর্ব মাদকতা ওদের মনে। মালিকের জমিতে ওরা ফসল ফলায়। ওরা ধান কাটে, তুলে দেয় মালিকের খামারে। সে ধান ঝেড়ে হামার ভর্ত্তি করে। বিনিময়ে পায় মজুরী। সামান্য মজুরী।

চাষীর বাড়ীতে নতুন ধানে নবান্ন হয়। পৌষসংক্রান্তিতে মকর হয়। অথচ যাদের ঘামে, রক্তে ওদের প্রাচুর্য, ওদের আনন্দ, ওদের অনুষ্ঠান করা, তারা নবান্নে নিমন্ত্রণ পায় না, প্রচুর থাকলেও—ওদের যখন অভাব আসে হাতপাতালে একমুঠো চাল পায় না। ওরা মেতেছে আপন খেয়ালে, রক্ত জল করা রোজগারের ভাগ দিয়ে। মালিকরা মুখ তুলেও তাকায় না ওদের দিকে।

অথচ সমাজবিদরা অনেক বড় বড় কথা বলেন। অনেক হাততালি কুড়ান। অনেক আন্দোলনে ওরা থাকে সামনের সারিতে, কাজ হাসিল হলে ওরা আগে যেমন ছিল—সেই পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়, তাই রয়ে যায়। অপুষ্টি, অনাহার, ওদেরকে কষ্ট দেয়, হয়তো অপুষ্টিতে সৃষ্ট মৃত্যুর মিছিল দেখে কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়। ব্যাস এই পর্যন্তই।

সাহিত্যিকরা ওদের নিয়ে লিখে পুরস্কার পায়। কবিরা কথার মালা বোনে ওদের মেয়েদের শরীর নিয়ে, ওদের ডাগর ডাগর চোখে পৃথিবীকে বসায় আপন খেয়ালে। ওদের ঘামের গন্ধকে মিশিয়ে দেয় বর্ষার মাঠের সোঁদা গন্ধের সাথে। হেমন্তের ফসলের উন্মাদনাকে বসায় ওদের যৌবনে। ভ্রোমর আনে, প্রজাপতি আনে। মাদল ধামসার বোলে বোলে ওদের কামনার আগুনের উত্তাপ নেয়, তারপর বীজ আনে। মাতৃত্বের অপার আনন্দে অবগাহন করায়।

আসলে এবং আদতে ওরা চিরবিশ্বাসী, একগুঁয়ে আদিবাসীই রয়ে যায়। ছিল, এবং থাকবে আগামী দিনেও।

সুখচাঁদরা সংখ্যায় ভীষণ রকমের কম। রাইমণি, বাবুয়াদের জন্য সরকারী নিয়মের ফাঁসে আটকে অপেক্ষা করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আসন শূণ্য রয়ে যায়। দায় স্বীকার করে সরকার—"আমরা পিছিয়ে পড়া মানুষকে আজও আনতে পারিনি, এটা আমাদের ব্যর্থতার লজ্জা। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি। আমরা ওদেরকে নিয়ে আলোচনা করছি। ওদের জন্য মিডডে মিল চালু করেছি।"

হায় ওদের সমাজ। ওরা তো মানুষ। তাহলে এত সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করে না কেন? কেন রূপচাঁদরা বলে—কি হবেক লিখাপড়া শিখে, উসব করলে মাঠের জমিন গুলান কাঁদবেকলাই? চাষাদের ঘরগুলান ভরবেকলাই। উসব লয়, আমরা সাঁওতাল বটে, আমাদের যিমন লিয়ম, উ লিয়মেই চলতে হবেক। সুখচাঁদ মুখিয়ার দেমাক হইঙ্গছে, উ লিখাপড়া শিখাচ্ছে উয়ার বেটিয়াকে। সেই ত উয়াকে মাঠের কোলে মাথা খুঁড়তে হবেক। মাঠের আলে বরষার সময় শীত লাগলে পেখ্যা মাথায় দিয়ে মাঠের জলে মুড়ি ভিজাই খেতি হবেক। লিখাপড়া শিখাই উসব পারবেক?

সত্যিই রাইমণি পারবে না। পারবে না উদম হেঁড়ে খেয়ে উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকতে। অথবা নেশার ঘোরে কে কার না জেনে কামনার আগুন নেভাতে।

সুখচাঁদ আগে দেখতনা, রূপালীর কাছে শুনে স্বপ্ন দেখে রাইমণি চাকরি করবে। বাবুয়া চাকরী করবে। রূপচাঁদরা এসব শুনবে কেন? তা মেনে নেবেই বা কিভাবে?

সুখচাঁদকে সরিয়ে তাই মুখিয়া হতে চায় রূপচাঁদ। ভিতরে ভিতরে তার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুখচাঁদের ভরা গাঙ্গে ভাটার টান এসেছে। কিন্তু সে সুখচাঁদ, তার জবান একটা। তার উদ্দেশ্য একমুখী।

এখানেই ভয় রূপচাঁদের মত মানুষদের। সুখচাঁদ অনেক বিচার করেছে। সে বিচারের রায় বিভৎস। রূপচাঁদ জানে। এখনও আশেপাশের আদিবাসীরা মানে সুখচাঁদকে। সবারই মনে ফাটল ধরাতে পারেনি রূপচাঁদ, পারবেই বা কি করে। ব্যাক্তিগতভাবে রূপচাঁদ তো ভাল নয়, তার ভাবমূর্তী তেমন উজ্জ্বলও তো নয়। তাই সবার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাও নেই। তবু তার আপ্রাণ চেষ্টা। যদি; কিন্তু সমন্বয়ে। তায় আবার গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত পাশে আছে রণজিৎ।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে রূপচাঁদ যাতায়াত বাড়িয়েছে রণজিৎ-এর বাড়ী। রণজিৎ তেমন পাত্তা দেয়নি রূপচাঁদকে। যেভাবে খাতির করে সুখচাঁদকে, সেভাবে না পাওয়ার দুঃখ তার মনে দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়েছে। আড়ালে আবডালে সেও সমালোচনা করে রণজিৎ-এর সংসারকে নিয়ে, খৃষাকে নিয়ে, আবুকে নিয়ে।

রণজিৎ-এর কানে গেছে সবকিছু। মনের মধ্যে জমছে ক্ষোভ।

বাইরে অসম্ভব রকমের শীতলতা রেখে চলেছে প্রতি মুহূর্ত। কারণ সে এলাকার নেতৃত্বে আছে। কারণ সে খৃষার বাবা। কেউ চায়না কেঁচো খুঁড়ে সাপ বেরিয়ে আসুক। রণজিৎও চায়না পারু মৃতা হয়েও জীবন্ত হোক সমাজের প্রত্যন্ত প্রান্তে। ফতিমা জীবিতা থেকে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হোক। এমনিতেই ওরা নির্যাতিত হয়েছে।

আবু বাড়ী ফিরেছে। এসে দেখেছে তার আব্বা সলেমানের শরীর খারাপ। দেখেছে আম্মা কেমন যেন মনমরা। চোখেমুখে আতঙ্কের স্পষ্ট চিহ্ন।

জিজ্ঞাসা করে—আম্মা, কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

না কিছু হয়নিতো।

আব্বুর কি হয়েছে?

ঐ শরীর খারাপ আর কি!

আম্মা তুমি আমাকে মিথ্যা বললে?

কেন রে?

আমি যে শুনলাম, তোমাদেরকে নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে!

থাকতে পারেনি ফতিমা, সমস্ত ঘটনা বলেছে আবুকে,—

কাকু কোন কিছু করেনি?

নারে। সেও যে নিরূপায়।

তাবলে ....

জানিস্ আবু, আমাদেরকে বোধহয় মুর্শিদাবাদেই ফিরে যেতে হবে।

একথা বলছ কেন?

জানি না, আমার মনে হয়েছে তাই বললাম।

আচ্ছা আম্মা, তুমি থানায় গিয়েছিলে?

না।

কেন?

রণজিৎ যেতে নিষেধ করেছে।

কেন?

তা জানিনা।

আমি কি কাকুর কাছে যাব?

না বাবা, ওমুখো তোর না হওয়াই ভাল।

কেন?

শিবু, বুটনরা বলেছে, ওখানে গেলে কেটে দুটুকরো করে দেবে।

আর কি কেউ নেই, যে ওরা আমাদেরকে ....

না বাবা, তুই ওখানে যাবি না।

তা হয় না আম্মা। কেউ অন্যায় করে যাবে এবং চিরকাল। আমরা মুখ বন্ধ করে সবকিছু মেনে নেব, এত উদারতা দেখানো কি কোন প্রয়োজন আছে?

কিন্তু ....

জানি আম্মা। আমরা তো এড়িয়েই চলছিলাম। ওরা তো বলেছিল ঋষাদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখলে কিছু বলবে না, অথচ ওরা ওদের কথা রাখল না। রণজিৎ কাকু কোন প্রতিবাদ না করে সমস্ত ব্যাপারটা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করল। আর তোমার। তার কথা শুনে থানা পুলিশ না করে বলছ ফিরে চলে যাবে মুর্শিদাবাদে।

তাছাড়া উপায় কি?

তাহলে ধরে নিতে হবে আমরা এলাকায় সংখ্যালঘু বলে সবাই যা ইচ্ছে যাবে তাই করবে।

আমাদের এখানে কে আছে বল?

দেখ আম্মা, কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যদি সংখ্যাগুরুর সম্প্রদায় অন্যায়ভাবে অত্যাচার করে। প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে সেটা দেখে।

ওসব তো রাজনীতির কথা। বাস্তবে কি তা হয়! তার থেকে রণজিৎ যখন বলেছে তখন তার হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়া ভাল। তুই মাথা গরম করিস্ না।

হতাশ হয়ে যায় আবু। কাদের জন্য কার কাছে সে দরবার করবে। কেনই বা আম্মা বাধা দিচ্ছে। কেনই বা আব্বু নিরবতার নির্মোকে লুকিয়ে আছে, বুঝতে পারে না আবু।

এক একটি রাত্রি কাটছে নিদ্রাহীনতায়। বাড়ীতে যেন আতঙ্ক নামক একটা জিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখের জল শেষ হচ্ছে না ফতিমার, তুষের আগুন যেন গুমরাচ্ছে আবুর মনে। সলেমান যেন বরফ জমে থাকা একটা পাহাড়। কোথাও যেন কোন সবুজের আস্তরণ নেই।

শান্তিতে নেই রণজিৎও। সেই তো আশ্রয় দিয়েছিল মুর্শিদাবাদ থেকে আশা সলেমান তাহের সিদ্দিকিকে। সেই তো ঘর বাঁধতে সাহায্য করেছিল, উৎসাহ দিয়েছিল সলেমানকে, ফতিমাকে। আজ কেন এমন হল। কোন্ অপরাধে অপরাধী ওরা।

ঘুম নেই ঋৃষার, চাপা ঝড় তার মনের মধ্যে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। সে বুঝতে পারছে না কেন আবুদা তাকে এড়িয়ে চলছে। কেন ফতিমা কাকীমা আর আসে না।

সায়ন এসেছিল অথবা আসতে শুরু করেছিল বসন্তের শীলাবতীর স্রোত হয়ে। বরষা আসলে হয়তো প্লাবন হতে পারত। কিন্তু সে স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হতে শুরু করল আবু নামক বাঁধের জন্য।

ঋৃষার ভাবনায় আবু, কেন সে সাহসিক হতে পারছে না। বাবা গল্প করত সলেমান আর ফতিমা সিরাজের মুর্শিদাবাদের মানুষ। আবুদা তাদের সন্তান। তাহলে সে কেন হেরে যাবে, কেন পালাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। তার থেকে কাঁটার আসনে থেকে মৃত্যু অনেক সুখের।

ঋৃষা ভাবে—সে কি বাপীকে ঘুম থেকে তুলে তার মনের কথা গুলো বলবে।

ডাক দেয় ঋৃষা—বাপী! তুমি কি ঘুমোচ্ছো?

ঘুমায়নি রণজিৎ, তারও ঘুম আসেনি সলেমান, ফতিমার কথা ভেবে। কিছুটা অবাক রণজিৎ, ঋৃষার চোখেও ঘুম নেই দেখে।

আবার ডাক দেয় ঋৃষা—বাপী, ও বাপী, তুমি ঘুমাচ্ছো?

নারে ঘুম আসছে না।

কেন? শরীর খারাপ করছে?

নারে,

তাহলে?

সে তুই বুঝবি না।

না বাপী আমি সব বুঝি।

কি বুঝিস্?

তুমি সলেমান কাকুদের কথা ভাবছ।

একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বুকের পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে যায় রণজিৎ-এর, রণজিৎ বুঝতে পারে, সে ধরা পড়ে গেছে তার একমাত্র মেয়ের কাছে।

বলে—আর ভাবতে পারছিনা রে?

তাহলে কি ধরে নিতে হবে তুমি হেরে যাচ্ছ?

নারে তা নয়, কিন্তু কি ভাবে এর উপযুক্ত জবাব দেব বুঝতে পারছি না।

ওদেরকে তো থানা পুলিশ করতে বললে পারতে!

পারতাম, কিন্তু ফল অন্যরকম হয়ে যেত, আমাদের কন্ট্রোলে কোন কিছুই থাকত না, ন্যায় বিচারও ওরা পেত না।

তাহলে তুমি কি ভাবছ?

ভাবছি অনেক কিছুই। কিন্তু সমস্য একটা জায়গাতে রয়ে যাচ্ছে।

কোথায়?

উত্তর দেয়নি রণজিৎ। কি উত্তর দেবে। সমস্যা তো তার একমাত্র মেয়ে ঋষা এবং এই গন্ডগোলের কারণও তো ঋষা। প্রসঙ্গ থেকে দূরে যাবার জন্য রণজিৎ বলে—ভীষণ ঘুম পাচ্ছেরে। এবার ঘুমিয়ে পড়।

তুমি তো বললে না। সমস্যাটা কোথায়?

সে পরে বলব, অনেক রাত্রি হয়েছে, এবার ঘুমো।

ঋষা বুঝতে পারে, বাপীর কাছ থেকে আর কোন কিছু জানা যাবে না। অগত্যা চেষ্টা করে ঘুমাতে।

চেষ্টা করলেই যে ফল মিলবে এমন নিশ্চিন্ততা তো কোথাও নেই। ঘুম আসেনি ঋষার। সে যেন দেখতে পায় আবু অপরাধীর মত গাঁয়ের প্রান্ত বরাবর হেঁটে চলেছে একরাশ উদাসীনতায়।

উদ্‌ভ্রান্ত আবু। ঘুম আসছেনা চোখে, বার বার বাইরে যাচ্ছ। যেমন হয় প্রতিটি মানুষের। দুশ্চিন্তা যখন তাকে গ্রাস করে। অথবা ভীষণ মানসিক চাপ যখন চেপে বসে মনে ভিতরে।

মাঝে মাঝে হাতে, পায়ে, মুখে জল নেয় আবার ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে চেষ্টা করে ঘুমোতে। কিন্তু কোথায় ঘুম! ঘুম কেড়ে নিয়েছে গাঁয়ের মানুষগুলো।

হঠাৎ শুনতে পায় আব্বু, আম্মার কথপোকথন।

আব্বু আম্মাকে বলছে—ফতিমা, তুমি একবার রণভাইয়ার কাছে যাও।

কি লাভ?

ও হয়তো কিছু ভাবছে। হয়তো সেই জন্যই থানাপুলিশ করতে দিল না। তাছাড়া তুমি একবার ঋষার সাথে কথা বল ওর মতামতটাও জানা দরকার।

ওরা যদি এড়িয়ে যায় এবং সমাজের ভয়ে।

না ফতিমা, আমার তেমন মনে হয় নি।

আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। রণজিৎ ঋষার কথা ভেবে ব্যাপারটাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আচ্ছা ফতিমা!

বলো?

আবু কি সত্যিই ঋষাকে ভালবাসে?

গাঁয়ের সবাইতো তাই বলছে, এবং সেইখানেই তো ওদের যত রাগ।

তবু তুমিতো মা, একবার আবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

আবু তো কখনও কোনকিছু বলে না।

তুমি তো জানার চেষ্টাও করনি।

না, তা হয়তো করিনি। কারণও দেখিনি বলে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো। আবু ঋষা পরস্পরকে ভালবাসে।

যদি তাই হয়, তাহলে ওদের মধ্যে ....

কেউ মেনে নেবে না।

দরকার হলে এখান থেকে চলে যাব।

কোথায়?

মুর্শিদাবাদে।

তা হয় না। তার থেকে আবুকে বোঝাতে হবে, বাস্তবে এসব সম্ভব নয়।

দেখো।

সবকিছু শুনছে আবু। গ্রামীণ হিন্দু সমাজ মেনে নিতে পারেনি বলে একদিন শাসিয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল সে ঋষার সাথে কোনরকম যোগাযোগ না রাখতে। তবুও ওরা আম্মা, আব্বুকে ছাড়েনি, এবার চায় এই গ্রাম থেকে আমাদেরকে উৎখাৎ করতে।

মনে মনে রাগ এসে যায় রণজিৎ কাকুর প্রতি। কেন যে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করতে দিল না; কেনই বা এই অন্যায়-এর বিরুদ্ধে সরব হল না? তাহলে কি কাকুও চাইছে আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কিন্তু কি কারণে? আমি তো ঋষাকে কোনদিন এমন কিছু বলিনি যার উপর ভরসা করে সে আমাকে তার গভীরতায় স্থান দিয়েছে। প্রেমতো সবসময় পরিণতি আনেনা।

আর ভাবতে পারছে না। শিথিল হয়ে যাচ্ছে মন, অথচ ঘুম আসছে না। এইভাবেই কেটে গেল রাত্রিটা। কোকিল ডাকল। কয়েকটা কাক বেরালো তাদের পথে, যদিও ইদানিং কাক প্রায় বিরল প্রজাতি হয়ে যাচ্ছে গাঁয়ে গঞ্জেও।

আবু দেখছে কাক দুটোকে। তারা বাড়ীর সামনের গাছের ডালে বসে কতকি কথা বলছে। তারপর উড়ে গেল দুজনেই।

পূব আকাশ লাল হয়েছিল বেশ আগেই। এবার একটা সোনালী থালার মত সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে লাল চাদর ফুঁড়ে।

যেহেতু আবুদের বাড়ী গাঁয়ের একপ্রান্তে। তাই গাঁয়ের সবাই কি করছে সে জানে না। অন্তত আজকে তার জানার মানসিকতাও নেই।

একটা মোটর বাইক শব্দ ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল বাড়ীর পাশ দিয়ে। আরোহী গাঁয়ের দেবু জ্যেঠু, তার পিছনে জ্যেঠিমা। ওরা মাঝে মাঝেই এই সময় যায়। ওরা কালিকাপুরে মোটরবাইক রেখে বাস ধরবে বাঁকুড়াগামী। ওখানে জ্যেঠিমার চিকিৎসা চলছে।

দরজার বাইরে আবু দাঁত ব্রাস করতে করতে লক্ষ করে সুখচাঁদ জ্যেঠু আসছে হন্তদন্ত হয়ে। কিন্তু যাবে কোথায়?

কাছাকাছি আসতে জিজ্ঞাসা করে—কি গো সুখচাঁদ জ্যেঠু এত সকালে কোথায় যাবে?

উত্তর দেয় সুখচাঁদ হই রণদার ঘরলে।

কেন?

দরকারলে।

কি এমন দরকার পড়ল যে ভোরেই ছুটতে হচ্ছে?

সে আসে বলবক্ষণ, ইখন না গিলে রণদার সাথে দেখা হবেক লাই।

পিছন ঘুরে চলে যেতে যেতে ফিরে এল সুখচাঁদ। তুই কবে এলি বটে?

কাল।

গলাটা নামিয়ে সুখচাঁদ বলে—কি বলতে কি হইঙ্গগিল তুই বলদিখিনি আবু, ই লিখাপড়া শিখেই কি লাভ, না শিখেই কি ক্ষেতি!

কেন জ্যেঠু!

মন গুলান তো সেই পিছনলে বুইঙ্গ গিছে। তবু বলবেক কিনা আমরা আধুনিক হইচ্ছি; সমাজটা বদলাইঙ্গ গিছে। সব আমার হঁপার কুথা। উসব বুলতে হয় বুলছে।

কোন উত্তরের আশা না করে আবার পিছন ফিরল সুখচাঁদ। দ্রুত চলে গেল চোখের আড়ালে।

আবু তার চলে যাওয়া দেখছে। ভাবছে এরা কত সরল মানসিকতার। সমাজ এত জটিল আবর্ত্তে চলছে তবুও এদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। এরা এদের নিয়মের গন্ডির মধ্যে থেকে কাটিয়ে চলে এক একটি দিন, রাত্রি, মাস, বৎসর। এরা একগুঁয়ে, কিন্তু অসৎ নয়।

দাঁত ব্রাস করতে করতে শুনতে পায় ফতিমার গলার শব্দ—কিরে আবু, তোর চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল? এখনও দাঁত মাজা হল না?

যাই আম্মা—বলে মুখ ধুয়ে নেয় তাড়াতাড়ি।

চা খেতে খেতে ফতিমাকে বলে—জান আম্মা, সুখচাঁদ বাবুয়ার সাথে রাইমণির বিয়ে পাকা করেছ।

উত্তর দেয় ফতিমা—জানি।

অথচ দেখ কি ভীষণ একগুয়ে মানসিকতা নিয়ে তার সিদ্ধান্তে স্থির ছিল সুখচাঁদ। ঋষার মায়ের পরামর্শে বদলে ফেলল তার সিদ্ধান্ত। এখন আবার তার প্রতিবেশীরা বেঁকে বসেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে সে অটল। রূপালী কাকীমা তাকে বোঝাতে পেরেছে সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, সম্প্রদায় গত অবস্থান কোন কথা নয়। আসল কথা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস সেখান থেকে ভালবাসাই শেষ কথা।

তাকিয়ে আছে ফতিমা তার একমাত্র পুত্রের দিকে। মন দিয়ে শুনছে আবুর যুক্তি বিন্যাস। তার মনে তবুও একটা ঝড় চলছে। সে ঝড় ঋষা আর আবুকে নিয়ে। যে ঝড় রূপালী মারা যাওয়ার পর, রণজিৎ পার্টিতে সময় কম দেওয়া থেকে শুরু হয়েছে। সে ঝড় ভীতা করেছে ফতিমাকে, নিরুৎসাহ করেছে সলেমানকে। আবুকে করেছে দিশাহীন।

হঠাৎ ফতিমা বলে ওঠে—আচ্ছা আবু। আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে তো আর এভাবে সবারই অন্যায়, অত্যাচারের শিকার হতে হবে না।

শিউরে ওঠে আবু। তাকায় আম্মার দিকে—একি সেই আম্মা, যে বার বার বলত— রক্তটা লাল, ধর্ম, জাত আলাদা এবং সবই মানুষের তৈরী, আমি ওসব মানিনা।

মনে পড়ে যায় রণজিৎ কাকুর একটা বক্তব্য। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন—ওরা হিন্দুত্বের তাস খেলছে। এরা করছে সংখ্যালঘু তোষণ, কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনি মুসলিম ভাই রক্ত দিচ্ছে দুর্ঘটনায় আহত হিন্দু ভাইকে। তখন কোথায় থাকে ধর্ম, তখন কে শত্রু। তারপর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলেছিলেন আমরা ভারতবাসী সবার উপরে আমরা মানুষ। এই হোক আমাদের পরিচয়।

সেই রণজিৎ কাকুও যেন ঢুকে পড়েছেন নির্মোকে! কিন্তু কেন?

কে তার উত্তর দেবে!

চা খেয়ে আবু, আম্মাকে বলে, আম্মা আমি একটু বেরুবো, ফিরতে দেরী হবে।

কোথায়?

চন্দ্রোকোণা।

কেন?

আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে।

আগে তো শুনিনি, তোর ওখানে কোন বন্ধু আছে!

ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে। জানো মা ওরা বেশ গরীব। কিন্তু আমাদের মত ভীতু নয়।

ছেলের কথা শুনে কেমন যেন হীনমণ্যতায় পেয়ে বসে ফতিমাকে। সে বলছে আমরা ভীতু। কিন্তু কি করে বোঝানো যাবে এখানে প্রতিবাদ মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও তার প্রতিকার নেই। কি করে বলা যাবে ওরা যে সমস্ত অশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়েছে এবং যেভাবে আমাদের সামাজিক সীমা বেঁধে দিয়েছে তারপর এখানে থাকতে হলে কোনরকম বেচাল হওয়া চলবে না।

বেরিয়ে পড়েছে আবু। ফতিমার বাধা উপেক্ষা করে। আবু জানে এখানে থাকলে প্রতি পদক্ষেপে অসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া এখানে সবসময় বসে থাকলে মনের অবস্থা ভাল থাকবে না। কিন্তু ওখানে গেলে গল্পগুজবে কেটে যাবে অনেকটা সময়। বর্তমানে যা ভীষণ রকমের মূল্যবান।

চন্দ্রোকোণা যাওয়ার পথে আমার সাথে দেখা হল আবুর। আদাব জানাল আবু রাস্তার মাঝেই।

জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছ?

ভাল নেই কাকু।

কেন?

সমস্ত ঘটনা বলল আবু। যদিও আমি সবকিছুই জানতাম। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কি ভাবছ?

বুঝতে পারছিনা, কি করা উচিৎ।

রণজিৎ এর সাথে দেখা হয়েছে?

না।

তুমি ওর সাথে কথা বললেই সব বুঝতে পারবে, কি করা উচিৎ।

কিন্তু, গ্রামের সবাই যে বলেছে, ওদের সাথে কোনরকম যোগাযোগ রাখলে অনেক কিছু ঘটতে পারে। এমন কি ....

সব জানি, তবু বলব, তুমি ওর সাথে আলোচনা কর। ও তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে।

চন্দ্রোকোণা যাওয়া হল না আবুর। আমার কথা শুনে ফিরে গেল বাড়ীতে। রণজিৎ এর বাড়ী গিয়ে দেখা না পেয়ে চলে গেল ক্ষীরপাই। ওখানে আজ মিটিং আছে।

রণজিৎ আবুকে দেখতে পেয়ে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলে—তুমি একটু অপেক্ষা কর। তোমার সাথে অনেক জরুরী কথা আছে।

বসে আছে আবু, অফিস থেকে কয়েক গজ দূরে রাস্তার ধারে। বাসগুলো যেখানে স্টপেজ ছেড়ে তার গতি বাড়াতে বাড়াতে চলে যাচ্ছে পেটের মধ্যে যাত্রীদেরকে নিয়ে। বাসের মধ্যে কলা বিক্রি করছে কয়েকটা ছেলে—"দশ টাকায় আঠেরটা। দশ টাকায় একথলি, দশ টাকায় বারটা। টাকায় একটি, আসলি মর্ত্তমান কলা।"

কোন কোন যাত্রী কলা খেয়ে ছোপড়াটা ফেলে দিচ্ছে রাস্তার বুকে। তাদের সাধারণ বোধ নেই; পথ চলতি মানুষ ঐ ছোপড়ায় পা দিলেই দুর্ঘটনায় কবলে পড়তে পারে।

সামনেই পড়ে থাকা কয়েকটা কলা ছোপড়া আবু ফেলে দিল রাস্তার ধারে। কয়েকটা উঠতি মেয়ে দেখে হাসছে। আর কি যেন বলছে এক অদ্ভুত সব অঙ্গভঙ্গী করে।

রাগ হয়নি আবুর। সে জানে শৃঙ্খলা এখানে আঁধার গর্তের ভিতরে। ওরা আলোকে ভয় পাচ্ছে। শান্তি এখানে দিশেহারা। কার উপর ভর করবে। অপরাধীর, নাকি যার প্রতি অপরাধ সংঘটিত হল তার উপর!

হাসে আবু, তার হাসিতে একটা ঘৃণা, একটা উদাসীনতা। কি মনে হল কে জানে, সামনেই একটা পানের গুমটিতে গিয়ে একটা পান খায় আবু। অবশ্য মাঝে মধ্যেই খায়। বসে পড়ে গুমটির পাশে রাখা বেঞ্চের উপরে।

এইভাবে এলোমেলো কিছুক্ষণ কাটার পরে আবু দেখতে পায় রণজিৎ কাকু আসছে। উঠে দাঁড়ায় আবু। কাছে আসে রণজিৎ।

কোন ভনিতা না করেই আবু বলে, অনিন্দ কাকু আপনার সাথে দেখা করতে বলেছেন।

অনিন্দ বলেছে বলে এসেছ? আমি তো বাঘ অথবা ভালুকও নই। বাড়ীতে গেলে কি খেয়ে নিতাম!

গেছলাম, আসলে, সবাই ....

জানি আবু। তুমি ভয় পেয়েছ। আমার বাড়ীতে চলো।

না কাকু, ওখানে যাবনা।

বেশ যেতে হবেনা। তুমি এগিয়ে যাও, শ্মরাণঘাটে দাঁড়াবে। আমি একটু কাজ সেরেই যাচ্ছি।

আবু মনে মনে ভাবে, ওখানেই ভাল। গ্রাম থেকে দূরে। কেউ দেখলেও সহসা কিছু বলতে পারবে না। কেননা ঋষাদের বাড়ী তো আর যাচ্ছি না।

স্মরণঘাটে শীলাবতীর উত্তর চর। যেখানে তুষু মেলা বসে প্রতি বৎসর। যেখানে এবৎসরও বসবে এবং স্মরণীয় হবে বাবুয়া, রাইমণির বিবাহ ঘোষণায়, গানে, প্রতিযোগীতায়। সেখানেই বসে পড়ে রণজিৎ। আবু বসেই ছিল। কেউ কোন কথা বলছে না। অথবা দুজনেই ভাবছে কিভাবে শুরু করা যায়।

তখন নদীর মাঝ বরাবর বয়ে চলেছে শীলাবতীর ছোট্ট জলের স্রোত। সে যেন গান গাইছে মৃদু স্বরে। যেখানে বসে আছে রণজিৎ, তার ওপারে চির নিদ্রায় হারিয়ে গেছে পারু। হারিয়ে গেছে রূপালীর সব কিছু। অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে রণজিৎ। হয়তো স্মৃতিরোমন্থনে উদাস।

নিরবতা ভাঙে আবু—কাকু! অনিন্দ কাকু আপনার সাথে দেখা করতে বলেছিলেন।

হঠাৎ যেন স্মৃতিগুলো হারিয়ে গেল রণজিৎ এর মন থেকে। মেঘের কয়েকটা গর্জনে। আবু যেন সেই মেঘ। তার কথাগুলো এক একটি গর্জন।

রণজিৎ তাকায় আবুর দিকে। আবুর চোখের তলায় কালি পড়ে গেছে। দাঁড়িটা কয়েকদিন কাটেনি, চুল উস্‌কোখুস্‌কো।

রণজিৎ-এর ছোট্ট সিরাজ যেন যুদ্ধ শেষে অথবা যুদ্ধমধ্য পর্যায়ে ক্লান্ত। অনেক আগেই হারিয়ে গেছে সিরাজ। লুৎফা বার্দ্ধক্যের ভারে। সামাজিক চাপে।

কথা বলে রণজিৎ—জানো আবু। আমরা মানুষ, তবুও সব যুদ্ধে জিততে পারি না। হেরে যেতে হয় মানুষেরই কাছে। সে হার লজ্জার। সে হার সঙ্ঘবদ্ধ বিকৃত চেতনার কাছে সুস্থ একক চেতনার। তখন মনে হয় মৃত্যু অনেক ভাল। অথবা অন্তর্লীন হয়ে যেতে হয় নিভৃতে। কিংবা অপেক্ষা করতে হয় সমষ্টির মাঝে থেকে বিকৃত চেতনাগুলোকে সুস্থ চেতনার আলোতে আনার জন্য।

আসলে ধৈর্য্য ধরতে হয়, হতে হয় সহনশীল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে আবু। তার রণজিৎ কাকুর দিকে। সে যেন মঞ্চে, একা বক্তা। শ্রোতা নদী, নদীর পারে জাম, হিজল, গামার, বাঁশ, শিরীষ। হয়তো কবে ধুয়ে মুছে যাওয়া পারু, রূপালীর দাহস্থান। একটুক্ষণ থেমে যায় রণজিৎ, তাকায় আবুর দিকে। বোঝার চেষ্টা করে আবুর তোলপাড় হওয়া মনটাকে। আবার শুরু করে—আমি জানি আবু। তুমি কি বলতে চাইছো। আমি ইচ্ছে করলে তাই করতে পারতাম। গ্রামের ঐ সব মানুষগুলোকে কয়েকদিন জেলের ঘানিও টানাতে পারতাম। কিন্তু করিনি। কেন জানো? মানুষের ঐ চেতনাকে বদলানো যাবে না। তারা আরও ক্ষিপ্ত হবে। তোমাদের বিপদ বাড়বে, তোমরা যে বড় একা।

তার মানে আপনি বলছেন—সহ্য করে যেতে হবে সবকিছু এবং নিরবে।

না আবু। তা বলছিনা। তোমার কাজ তোমাকে করে যেতে হবে সাহসিকতার সাথে। বাধা আসবে। হয়তো আবার অত্যাচার নেমে আসবে। একটা সময় সবাই থেমে যাবে। তখন দেখবে তোমার পাশে অনেক। ওদের পাশ থেকে চলে গেছে সবাই। হ্যাঁ আর একটা কথা। তুমি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী যেও। ঋষা বড় একা। ভীষণ কষ্টে আছে।

আবু কি ভুল দেখছে! নিজের চোখ দুটো একবার রগড়ে নেয় আবু। না ভুল দেখেনি। শেষের দুটো বাক্য বলার সময় রণজিৎ কাকুর চোখ দুটো ভিজেছিল। এখনও ভিজে আছে এবং সে ভেজা চোখ দুটো যেন আবুর কাছে আকুতি জানাচ্ছে। তার মেয়ের জন্য।

হালকা লাগছে অনেক। আবু যেন আবার খুঁজে পেয়েছে তার পায়ের তলা থেকে হারিয়ে যাওয়া মাটি। রণজিৎ কাকুর প্রতি অবিশ্বাসের প্রাচীরটা টুকরো টুকরো হয়ে মিশে যাচ্ছে মাটির সাথে। ইচ্ছে করছে অনেক কিছু বলার, একটা আদাব জানানোর। ইচ্ছের রশিতে ইচ্ছে করেই টান দিয়ে রেখেছে আবু। কেননা তারপরেও যদি কিছু থাকে।

রুমাল বের করে চোখের কোণ মুছেছে রণজিৎ। একটা সিগারেট ধরিয়েছে। এবার উঠে পড়বে দুজনেই। আকাশেও একটা হালকা কালো মেঘ জমছে।

রণজিৎ জিজ্ঞাসা করে—আর কোথাও যাবে, নাকি বাড়ী ফিরবে?

না কোথাও যাব না। বাড়ী ফিরব। উত্তর দিয়েছে আবু।

ফিরে এসেছে আবু তার বাড়ীতে। তখন দুপুর ঢলে পড়বে পড়বে করছে বিকেলের দিকে।

ফতিমা ভীষণ চিন্তায়, কেননা আবু সেই সকালে বেরিয়েছে অথচ এখনও এল না। বার বার বাইরে বেরিয়ে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে শুনছে, কোথাও কোন গন্ডগোল হচ্ছে কিনা। মায়ের মনতো। সব সময় কু গায়। বিশেষ করে যখন আবুকে নিয়েই যত সমস্যা।

আবু ডাক দেয়—আম্মা!

ফতিমার মনের উৎকণ্ঠা শেষ হয়ে ফিরে এসেছে অনাবিল তৃপ্তি। কারণ আবুর গলার স্বরে হতাশা নেই, ভয় নেই, ঔদ্ধত্ব নেই। যেন কিছু হয়নি, সব সমস্যার সমাধান সেরে ফিরে এসেছে।

রণজিৎ কাকুর সাথে আলোচনা হওয়া সমস্ত কথা বলার পর ফতিমার বুক থেকে বেরিয়ে এল একটা ভাঙা দীর্ঘশ্বাস। সলেমান শুয়েছিল ঘরের মধ্যে। সেও শুনেছে সবকিছু।

ডাক দেয়—ফতিমা।

আসছি বলে ঘরে ঢুকেছে সলেমানের। জিজ্ঞাসা করে সলেমান—রণজিৎ ভাই এই জন্যই কি কোন কিছু করতে না বলেছিল?

তাই তো মনে হচ্ছে।

তাহলে আর কি, এবার আবুকে বর্ধমানে চলে যেতে বল। এখানে থাকলে পড়াশুনা হবে কি করে?

ও চলে যাবে বলছে।

আর কি বলছে?

ঋষার সাথে আজ সন্ধ্যায় দেখা করতে যাবে।

সলেমানের চোখে মুখে আবার একটা ভয় আশ্রয় নিচ্ছে। কারণ শিবু, বুটনরা। ওরা বলেছিল ঋষার সাথে একসাথে আবুকে দেখলে গ্রামছাড়া করে দেবে। দুটুকরো করে দেবে। একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নময় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সলেমানের বুক ঠেলে।

বুঝতে পারে ফতিমা। এই দীর্ঘশ্বাস কিসের। ভরসা জোগায় সলেমানকে—ভয় নেই, রণজিৎ বাড়ীতে থাকবে।

নিশ্চিন্ত হয়েছে সলেমান। তার অঢেল আস্থা রণজিৎ-এর প্রতি। সে বিশ্বাস করে রণজিৎকে। কিন্তু সত্যিই কি নিশ্চিন্ত হয়েছে।

সন্ধ্যে নেমেছে তার নিজস্ব ঢঙে। পাখীরা ফিরে চলেছে তাদের নীড়ে। গ্রাম শ্রীরামপুর। ধানের ক্ষেতের দেশ। সন্ধ্যে নামার সাথে সাথে মাঠগুলো যেন তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের তলায়। তৎকালীন জমিদার—জানাবাবুদের পুরানো চাঁপা গাছের ফুলের গন্ধে মম করছে পাড়া। বাঁধে দাসপাড়ায় চলছে ফুলোট বাঁশি আর ব্যান্ডের মহড়া। কি অপূর্ব হেমন্তের সন্ধ্যা। কত প্রাসঙ্গীক এখানকার ভিন্ন বাসাবাসি মানুষের বিভিন্নতার মধ্যে অদ্ভুত যুগলবন্দি। অথচ আবুরা যেন আলাদা। দাস, জানা, ঘোষ সবারই চোখে। সে কেবল মুসলিম বলে। তার থেকেও বড় কথা ঋষার সাথে সম্পর্কের দুঃসাহসিকতার জন্য।

একা একমাত্র রণজিৎ ছাড়া সবারই এক সুর। আর ঋষা।

তখন রাত্রি আটটা। গাঁয়ের বাতাস ভিজছে হালকা হিমেল হাওয়ায়—মানুষগুলো। যাদের এত প্রতাপ, তারাও সহ্য করতে পারছে না এই বাতাসের আঘাত। ঘরে ঢুকে উত্তাপের খোঁজে কেউ কেউ চাদরের তলায়। অথবা বন্ধ দরজা ঘরের ভিতরে। কিন্তু আবু! সে চলেছে লোকচক্ষু এড়িয়ে ঋষাদের বাড়ী।

দরজার কড়া ধরে নাড়া দিয়েছে আবু। ভিতর থেকে রণজিৎ জিজ্ঞাসা করে—কে?

আমি।

গলার স্বর চিনতে ভুল করেনি রণজিৎ। শুধু আবু কেন এলাকার সমস্ত পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুনে রণজিৎ বলতে পারে কে সেই মানুষ। যদিও সব মেয়েদের ব্যাপারে সে জানে না, জীবিতদের মধ্যে ফতিমা ছাড়া।

দরজা খুলে দিয়েছে রণজিৎ। আবু ভিতরে যেতেই আবার দরজা বন্ধ করে ডাক দিয়েছে বিন্দুকে—বিন্দু!

যাই দাদা।

একটু মুড়ি দেতো।

তোমার আর ঋষার?

না না। চার জনের।

চার জন কোথায়?

তোকে যা বলছি করনা।

বিন্দু তার বিখ্যাত মশলা মুড়ি তৈরী করতে ঢুকে পড়েছে নির্দ্ধারিত জায়গায়।

রণজিৎ ডাক দেয়—ঋষা! দেখে যা কে এসেছে!

কে বাপী?

তুই তো আয়। তারপর দেখবি।

ঋষা মগ্ন ছিল পড়াশুনায়। বই বন্ধ করে বাপীর ঘরে এসে দ্যাখে আবু।

কিরে মা, দেখে মনে হচ্ছে তুই ভীষণ অবাক হয়েছিস্!

কি উত্তর দেবে ঋষা, সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

হাসে আবু।—কাকুর ডাকে চলে এলাম।

ঋষা এক রাশ বিস্ময় নিয়ে বলে—কিন্তু ....

রণজিৎ বুঝতে পারে ঋষা কি বলতে চাইছে। কিন্তু ..... পরবর্তী অংশটুকু জুড়ে দেয়— লোকে জানতে পারলে বিপদ হবে। তাইতো?

বাপী ....

আমি এখনও মরে যাইনি ঋষা। আর ঐ দিনের ঘটনা ঘটেছিল আমার অনুপস্থিতি এবং অজান্তে। একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

এখনও তো ওরা বলছে।

বলছে। কিন্তু কিছু করতে পারবে না।

বিন্দু ঢুকেছে তার বিখ্যাত মশলা মুড়ি নিয়ে। তার চোখেও বিস্ময়। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সে ঋষার খুব কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করে—কেউ দেখে নেয়নি তো? তাহলে ভীষণ বিপদ হবে!

রণজিৎ বোধহয় বুঝতে পেরেছে বিন্দুর জিজ্ঞাস্য বিষয়। অথবা শুনতে পেয়েছে বিন্দুর কথা। তাকায় বিন্দুর দিকে। তারপর হো হো করে হেসে ওঠে।

চমকে গেছে বিন্দু। অবাক হয়ে গেছে রণজিৎ-এর এই হাসি শুনে। রূপালী বৌদি মারা যাওয়ার পর থেকে সে এই হাসি শুনেনি।

বাড়ীতে আসলেই রণজিৎ-এর মুখ দেখে ভয়ে সিটিয়ে থাকত বিন্দু। কেমন যেন আনমনা, আর ভীষণ গম্ভীর।

হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে রণজিৎ—আবুকে দেখে খুব অবাক হয়েছিস্ তাইনা? অবাক হওয়ার কিছু নেই। আবু এ বাড়ীতে যখন মন যাবে তখনই আসবে।

একটু পরেই চা দিয়ে যায় বিন্দু। চা খাওয়া শেষ করে রণজিৎ বলে—তোরা গল্প কর, আমার একটু কাজ আছে, সেরে নিই। তারপর আবুকে ওর বাড়ীতে দিয়ে আসব।

আবু, ঋষা বুঝতে পারে রণজিৎ-এর চলে যাওয়ার কারণ। কিন্তু কি কথা বলবে ওরা। বহুদিনের অদেখায়তো সব হারিয়ে গেছে অথবা জমে আছে অনেক কথা। যার শুরুটা জানা নেই কারও।

কথা বলে আবু—ঋষা! আমার উপর ভীষণ রেগে আছ, তাই না?

জানি না।

তাহলে কিছু বলছ না যে?

কিছু বলার নেই বলে।

তুমি ভাল আছ তো?

দেখে কি অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে?

না তা বলছিনা। আসলে ....

তুমি কেন এলে! বেশ তো ছিলাম।

সেটাই তো তুমি জানতে চাইছ না।

জানার ইচ্ছে নেই বলে।

আমি তো কোন অপরাধ করিনি।

আমি জিজ্ঞাসাও করিনি।

Please ঋষা, ওভাবে কথা বলো না।

আর কিছু বলবে?

অনেক কিছুই বলার ছিল। হয়তো সব গুছিয়ে বলতে পারব না, বলতে পার সেটা আমার সাহসিকতার অভাব।

সাহসিকতা নাকি সততা, স্বচ্ছতার অভাব?

যা খুশি ভাবতে পার।

কোনকিছুই ভাবছিনা।

বেশ ভাবতে হবে না। যদি মনে করো অথবা সময় করতে পার এই চিঠিটা তোমাকে দিলাম, তুমি পড়ে নিও। সম্ভব হলে চিঠি পড়ে তোমার মন্তব্যটা জানিও।

কি লাভ, এই চিঠি পড়ে!

জানি না, তোমার লাভ লোকসানের হিসেব। চিঠিটা রইল।

উঠে আসে আবু, এক আকাশ হতাশা নিয়ে। সে ভেবেছিল এবং আশা করেছিল একটা উষ্ণ অভ্যর্থনা পাবে ঋষার কাছ থেকে, পেল কেবল ঠান্ডা বঞ্চনা।

বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করে রণজিৎকে। কাকু, খুব ব্যস্ত নাকি?

না না, তেমন কিছু নয়। উত্তর দেয় রণজিৎ।

আমি আসছি।

সে কি, একা যাবে কেন?

কিছু হবে না।

না না। তা হয়না, চলো আমি দিয়ে আসি।

এখন রাত্রি দশটা। আপনি শুধু শুধু কষ্ট করে যাবেন?

কোন কষ্ট হবে না। তাছাড়া সমস্যা হলে আমাকে তোমার বাবা, মার কাছে অপরাধী হয়ে যেতে হবে।

না কাকু। কাউইকে অপরাধী হতে হবে না। আমি আসছি।

কোন বাধা না মেনে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে আবু। কোথাও কোন মানুষ নেই। গোটা গ্রাম হিমের চাদরে ঢাকা। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার সুর ছাড়া কোন শব্দ নেই।

আবু চলেছে নদীর বাঁধ ধরে। যদিও ঘুরপথ। তবুও এই পথেই নিশ্চিন্ততা। নিজের চলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে আবু, বার বার তাকাচ্ছে পিছনের দিকে কারও হেঁটে আসার আশঙ্কায়। বাঁশগাছের পাতা পড়ার শব্দে চমকে উঠছে আবু। চমকে উঠছে কয়েকটা শৃগালের জ্বলন্ত চোখ দেখে।

একটা অজানা ভয় যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে নিশি ডাকের মত। অথচ আবু ভীতু ছিল না। এখন আবুর ভয় সেই সব মানুষকে, যারা এই কিছুদিন আগে অন্যায়ভাবে অত্যাচার করেছিল সলেমানকে।

এইভাবেই বাড়ীতে এসেছে আবু। দূর হয়েছে ফতিমার দুশ্চিন্তা। খেতে বসে ফতিমা জিজ্ঞাসা করে—ঋষাদের বাড়ী যাওয়ার কারণ এবং সেখানের ঘটনাবলি। যতদূর

সম্ভব সংক্ষিপ্ত মিথ্যা বলে খাওয়া শেষ করে আবু তার ঘরে ঢুকে নিভিয়ে দিয়েছে আলো।

এখন অন্ধকার। আবুর মনেও আঁধার, বুকে শীত। আর এক রাশ প্রশ্ন। কেন? কেন? কেন?

ঘুম নেই ঋষার চোখেও। চিঠিটা খুলে টেবিলল্যাম্পের তলায় মেলে ধরেছে। আবু লিখেছে—

ঋষা

যদি পারো ভালোবাসা নিও। জানি তুমি অনেক প্রশ্ন করবে। যার সব উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে এইটুকু জেনেছি তুমি হয়তো আমাকে এবং আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু সমাজ এসবের কোন মূল্য বা স্বীকৃতি দেবে না। দেবেনা বলেই আমার আব্বা আম্মার শরীরে মনে এঁকে দিয়েছে অত্যাচারের অসংখ্য স্মারক। যা আমাকে অবাক করেছে। জানতে ইচ্ছে যায়, কোন্ সমাজ যেখানে মেলামেশা, ভালবাসা নির্ধারিত হয় সম্প্রদায়, জাত, অর্থনৈতিক সহাবস্থানের মাপকাঠি দিয়ে। আমি মুসলিম। কিন্তু মানুষ নয়। হৃদয় নেই, অধিকার নেই, এই কি হিন্দুবাদ! তা যদি হয় তাহলে সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিলে তো ভাল হত। তাহলে কেন কুম্ভীরাশ্রু ঝরে অমুসলিমদের দ্বারা সংঘটিত মুসলিমদের উপর অত্যাচার হলে। অথবা অমুসলিমরা মুসলিম দ্বারা আক্রান্ত হলে কেন রে রে করে ওঠে সমগ্র বিশ্ব। উত্তরটা জানা ছিল না কিংবা যা জানা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলিমরা বিশ্বাসঘাতক। বাস্তবে দেখলাম ওদেরকে বিশ্বাসঘাতক হতে হয়তো বাধ্য করেছে চরম অসম্মান। অথচ আমরা শিক্ষার বড়াই করি। চিৎকার করে গান গাই 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান।'

তোমাকে প্রথমে খেলার সাথী। তারপর বান্ধবী, পরে কেন জানি না আমার মনের দুর্বলতায় অন্যভাবে দেখেছিলাম, সে হয়তো তুমিও। সেখান থেকে পরিণত হচ্ছিল ভালবাসা। যা আজও অমলিন। আমি তোমাদেরই সব জনেদের বাধায় কাছাকাছি আসতে পারি নি। সে হয়তো আমার ভীরুতা। কাকু মনে এনে দিল অফুরন্ত সাহস। ভুলে গেলাম অত্যাচারের স্মৃতিগুলো। বিশ্বাস জন্মালো—সবাই একরকম নয়।

এবার তোমার ভাবনা। আমি সব বলতে পারব না বলে লিখলাম। আশাকরি ভুল বোঝাবুঝির অবসানে আমরা নতুন জীবন সঙ্গীতের সুরসঞ্চার করতে পারব।

আশায় রইলাম,

ইতি তোমার

আবু

চিঠিটা শেষ করে টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ঋষা। তার মনের পাশে শুয়ে পড়ল সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তহীনতার ভাবনা। তখন স্বপ্নগুলো ভাসছে হিমেল বাতাসে ভর করে উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায়, স্থান পাবে কি পাবে না।

ভাবনার সাথে দীর্ঘ সহবাস সেরে ঋষা যখন সিদ্ধান্তে এল। তখন ভোরের আকাশ। স্বপ্নগুলো রাত্রির অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিল, এবার পথ খুঁজে পেল, একে একে ঢুকে গেল ঋষার মনে। সেই স্বপ্নে ভর করে এল আবু।

সে নবাবের সাজে সজ্জিত। কোমরে বাঁধা ধারালো, ভারি তলোয়ার। মাথায় উষ্ণীষ, তার ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া শত্রুকুল এখানে ওখানে গোপন আস্তানার খোঁজে উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রাম্যমান। এগিয়ে চলেছে নবাব, তার গন্তব্যস্থলে ....

হাসল ঋষা। সে হাসি দেখল ভোরের লাল সূর্য। আর ঋষা দেখল তার জীবনের এক নতুন অন্য ভোর। উঠতে ইচ্ছে করছিল না বিছানা ছেড়ে। মনে হচ্ছিল আবু যেন বলছে—ঋষা আরও কিছুক্ষণ। তাপর যেও।

রণজিৎ-এর ডাকে স্বপ্নটা ভেঙে গেল—ঋষা! মা, ওঠ। আজ কলেজ আছে। বেলা হয়ে যাচ্ছে যে।

আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঋষা। বুঝতে পারে নি সকাল হয়ে গেছে। জানালাগুলো বন্ধ থাকার জন্য আলো আসেনি ঘরের মধ্যে।

বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখে, সুখচাঁদ বসে আছে মেঝেতে। ঋষাকে দেখেই বলে—এ্য বেটিয়া, কখন থিক্কে আসাইঙ্গছি, তুয়ার দিখা নাই।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঋষা বলে—দেরী হয়ে গেল, একটু বোস, আমি আসছি।

বাথরুমে গিয়ে দাঁত ব্রাস করে ঋষা মুখোমুখি বসে সুখচাঁদের। জিজ্ঞাসা করে—বল জ্যেঠু। কি খরব?

হ্য, ঐ আসলেই জেঠুর খবর। তারপর সব গায়েব।

না জ্যেঠু। তোমাকে ভোলা যায় না।

কিনে রে। আমি কি এমন বটে!

সুখচাঁদের কাছে রাখা ব্যাগটা লক্ষ পড়ে ঋষার। জিজ্ঞাসা করে—জ্যেঠু ব্যাগে কি?

কালো কালো দাঁতগুলো মেলে ধরে সুখচাঁদ। ব্যাগটা যত্ন করে ধরে সামনে রাখে—আরে ইটার জন্যই তো এই সাতসকালরে ইখানে এলম।

তার মানে?

আমার বেটিয়া সেরেঙ্গ বাঁধিছে। ক্যাসেট করছে বটে। উত গতকালরে ইটা লিয়ে এল।

রাইমণি এসেছিল?

হ্য রে বেটিয়া, আসি কি চলেইঙ্গ গিল, বলল, ইটা বাজাইয়েঁ গানটা তুলে লিতে। ইবার তুষুমেলায় ইটাইত হবেক।

ওমা তাই নাকি? দেখি দেখি।

হ্য হ্য লে দিখিনি, একবার বাজইয়েঁ দেখত বেটিয়া, কিমন সেরেঙ্গ। শুনতে মন টানছে।

ঋষা ফিলিপ্স টেপের ভিতর থেকে ক্যাসেটটা বের করে দেখে একটা খালি ক্যাসেট। তারপর সেটা আবার ভরে দিয়ে সুইজটা দিতেই বেজে ওঠে রাইমণির গান। তার সাথে বাঁশির মন কেমন করা সুর।

মুগ্ধ সুখচাঁদ। আনন্দে তার চোখে জল। অবাক হয়ে শুনছে বিন্দু। রণজিৎ সিগারেট ধরিয়েছিল। গান শুনে আর পান করেনি। দু-আঙ্গুলের ফাঁকে ধরে থাকা সিগারেটের জ্বলন্ত দিক চলে এসেছে আঙ্গুলের কাছাকাছি। লক্ষ করে ঋষা, চিৎকার করে—ও বাপী। তোমার সিগারেটের আগুন যে আঙ্গুল পুড়িয়ে দেবে।

সম্বিৎ ফিরে রণজিৎ-এর। তখনও গান শেষ হয়নি।

সুখচাঁদ যেন অন্য উন্মাদনায় ফুটছে টগবগ করে। তার শরীর দুলছে মাথার সাথে সাথে। গানের দোলায়। চোখে মুখে অদ্ভুত তৃপ্তি।

রাইমণির গান শেষ হয় একটা সময়। সুখচাঁদ তাকায় রণজিৎ, ঋষার দিকে। যেন জানতে চায় তাদের মতামত।

ঋষাই কথা বলে—অপূর্ব।

হাসে সুখচাঁদ।

রণজিৎ বলে—বা বেশ সুন্দর, গানের প্রত্যেকটি কথা।

হাসে সুখচাঁদ।

রণজিৎ বলে, খুবই ভাল হয়েছে, কিন্তু গানের শেষটা খুব বেশী বেদনার শুধু নয় বিয়োগান্তকও! তাই না ঋষা?

গম্ভীর হয় সুখচাঁদ। জিজ্ঞাসা করে—কি যেন বলছু রণদাদা?

উত্তর দেয় ঋষা—বুঝলে জ্যেঠু। গানের শেষ দিকটা খুব করুণ।

উটা তো হবেকই, তুযু চলেই যাবেক লদীর জলে জলে। সবারলে ছেড়ে। উত কাঁদতে কাঁদতে যাবেক। তুখন কি সব্বাই হাসবেক। বুলদিখিনি রণদাদা, মাইয়াটা যখন বিহার পর চলেইঙ্গ যাবেক পরের ঘরে। সবাই কাঁদবে না হাসবেক?

রণজিৎ বলে—সে তো বটেই।

তুবে! জানু বেটিয়া, রাইমণি বলছিল কি, ই সেরেঙ্গটার সুর দিয়েছে বাবুয়া, বাঁশিটাও বাজাইঙ্গছে বাবুয়া।

তাই! বাবুয়া খুব সুন্দর বাঁশি বাজায়তে! হ্য হ্য, সুন্দর বলে সুন্দর।

বিন্দু শুনছিল ওদের কথপোকথোন। হঠাৎ বলে বসে, তা হ্যাঁগে সুখচাঁদ খুড়ো। সকালে কিছু পেটে পড়েছে নাকি খালি। গন্ধ পাচ্ছি না যে।

কটমট করে বিন্দুর দিকে তাকায় সুখচাঁদ। বলে—উঃ, তুয়ার জ্বালায় পালাইঙ্গ যেতি হবেক।

কেন গো? আমি কি দোষ করলাম। রোজতো গিলে এস।

আজ গিলি নাই। হল।

তা নাহয় হল। কিছু কি খাবে? নাকি না খেয়েই চলে যাবে?

উ কুত দরদ, ত দিচ্ছে কে?

কে আবার দিবে, আমিই দেব।

ঋষা সায় দেয়। বিন্দু কাকী। দাও দাও তোমার স্টকে কি আছে।

রান্না ঘরে চলে যায় বিন্দু। তার চলে যাওয়া দেখে সুখচাঁদ বলে মাইয়াটার কুনু বদল হল নাই।

সকালে খাওয়ার পাঠ চুকিয়ে চলে যায় সুখচাঁদ। আবার নিমন্ত্রণ করে যায় রণজিৎ, ঋষাকে। এটা এখন তার প্রাত্যহিকী। কথা দেয় ঋষা, রণজিৎ।

কলেজ যেতে ইচ্ছে করছে না ঋষার। অথচ না গেলেই নয়। আজ টিউশনও আছে।

বুঝতে পারে রণজিৎ, ঋষার অলসতা দেখে। বলে—কিরে আজ বোধহয় ভাল লাগছে না। তা নাই বা গেলি।

যাবনা বলছ?

দেখ, ভাল না লাগলে না যাওয়াই ভাল।

সত্যিই ভাল লাগছেনা সায়নের মুখোমুখি হতে। কি বলবে সায়নকে। সে যে ভালবাসতে শুরু করেছে ঋষাকে।

আর ঋষা। কিন্তু কতদিন এভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখবে। তাছাড়া আবু যে ফিরে আসবে, ঋষার মনে সে ধারণাই তো তৈরী হয়নি।

ঋষা শেষ পর্যন্ত সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে। সিদ্ধান্ত নেয় কলেজে গিয়ে সায়নের মুখোমুখি হয়ে সবকিছু বলবে। সায়ন ভীষণ রকমের বুঝদার ছেলে। সে বুঝতে পারবে এই অবস্থান্তর রহস্য। সরে যাবে স্বাভাবিক নিয়মেই।

কলেজ বেরিয়ে পড়ে ঋষা। তার মনের ক্যানভাসে জেরক্স হয়ে গেছে আবুর লেখা চিঠি। আজ তাকে জানাতে হবে সে থাকবে কি থাকবে না।

সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঋষা। আবুই তার জীবনসঙ্গী হবে। হয়তো ঝড় উঠবে গোঁড়া

সমাজের প্রান্তরে প্রান্তরে। হয়তো অপমানের তীর বেঁধা হয়ে যাবে রণজিৎ-এর সমস্ত শরীর ময়। তা হোক।

আবু আর তার সংসার! তারা তো ঝড়ের মুখেই পড়ে আছে। পারবে কি ঐ ঝড়ের গতিপথ বদলে দিতে। অজস্র খারাপ চিন্তা ভর করে ঋষার মনে।

যদি এমন হয়। অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ওরা ফিরে চলে যায় মুর্শিদাবাদ। তাহলে?

না আর ভাবতে পারছেনা ঋষা। তার ভাবনায় আসছে স্থবিরতা। কিন্তু বাস ছুটে চলেছে তার গতি নিয়ে মেদিনীপুরের লক্ষে। অবশেষে পৌছে গেল মেদিনীপুরে।

বাস থেকে নেমে ঋষা দেখতে পায় সায়ন দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়।

কাছে আসে সায়ন—লক্ষ্য করে ঋষাকে। তার চোখের তলায় নিদ্রাহীনতার স্পষ্ট চিহ্ন। ঠোঁট দুটো শুকনো। জিজ্ঞাসা করে সায়ন—ঋষা! তোমার কি শরীর ভাল নেই?

না তো, আমি তো ভালই আছি।

ঋষার কণ্ঠস্বরে কাঁপন। বুঝতে পারে সায়ন, ঋষা সত্যি বলেনি।

Please ঋষা বলো না, তোমার কি হয়েছে?

কঠিন হয়ে যায় ঋষা।

কলেজ আসার পথে সিদ্ধান্তটা, আজই, এক্ষুণি জানিয়ে দেবে। তাছাড়া সমস্ত ঘটনা প্রবাহ তো সায়নকে আগেই বলা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা যে কোন জন করতেই পারে।

সায়নের চোখে চোখ রাখে ঋষা। এ ঋষাকে সায়ন চেনে না।

ভীষণ রূঢ়, ভীষণ আবেগহীন।

সায়ন! তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।

থাকনা, আজই কেন? তোমার মনের অবস্থা বোধহয় ভাল নেই। পরে বললেও চলবে।

না সায়ন ....

Please ঋষা। তুমি কি বলবে জানি। নতুন করে বলার দরকার নেই।

তোমার সবকিছু জানার দরকার আছে।

দরকার অনেক কিছু, যদি মনে করা হয়। মনে না করলে কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।

তুমি বুঝতে পারছ না ....

থাকনা ঋষা, যেটুকু বুঝেছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

Please সায়ন। আমার কথা তো শোন!

তুমি তো সবকিছু বলেছ। আমার মনে দ্বিধা নেই।

আমি আবুকে ....

মানুষ ভুল করে। আহত হয় মনে মনে। সহজ স্বীকারোক্তি মানে তো অনুতাপ। সে অনুতাপের দহনে তুমি তো নতুন হয়ে গেছ ঋষা।

ভুল নয় সায়ন!

অনেক বড় হৃদয়ের মানুষ যারা, তারা ভুল ঠিক নিয়ে ভাবে না। তারা স্বচ্ছতা নিয়ে এগিয়ে চলতে চায় আজীবন, সেটা নতুন করে বলার দরকার হয় না।

আবু আমাকে ....

জানি ঋষা। এও জানি সবাই আবু নয়। সবাই আবুর মত ভালবাসার খেলা করে না, অথবা খেলা শেষে সমর্পিত হৃদয়টাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় না। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার।

তাইতো তোমাকে সব বলতে চাই। কেননা তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।

সে বিশ্বাসে ....

ফাটল যাতে না ধরে তাই আরও নিশ্চিন্ত হতে চাও, তাইতো? বেশ তুমিই বলো, কি করলে তুমি নিশ্চিন্ত হবে।

না সায়ন, আমি ওসব কিছু ....

জানি, তুমি আমাকে আঘাত দিতে চাও না। আমিও চাই না। আমি চাই তোমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে। তোমাকে উপযুক্ত সম্মান দিতে।

আজ আমি চলি সায়ন। পরের দিন সবকিছু বলব। যা তুমি বুঝতে চাইছ না।

বেশ তুমি ভাল করে প্রস্তুতি নিয়ে এস। কথার মাধ্যমে না হলে লিখে নিয়ে এস।

সায়ন বুঝতে চায় নি। সায়ন সত্যিই ভাল বেসেছে ঋষাকে। সায়নকে কিভাবে বলবে। ঠিক করে উঠতে পারছে না ঋষা। তবে কি অনুষাকে সবকিছু বলবে। যদি সে অন্যরকম ভাবে। অন্যরকম—প্রণতি যেমন, প্রিয়াংকা যেমন, ওরা প্রেম নয় শরীর নিয়ে মেতে আছে। মেতে আছে নিত্যনতুন নিয়ে। না, না ওকেও বলা যাবে না। বলার দরকার নেই। দেড় বৎসর পরে তো সব দূরে হয়ে যাবে। যেমন দূরে ছিল। অচেনা ছিল। কিন্তু সায়ন!

বাড়ী ফিরে এসে আবুর চিঠিটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ঋষা, কি অপূর্ব ভাষা, কিন্তু এত হীনমণ্যতা কেন? কেন এত ভীরুতা? পরনির্ভরশীলতা? ভালবাসে, কিন্তু কেন সরাসরি বলতে পারে না!

এইসব ভাবনাগুলো যখন ঋষার মনে দানা বাঁধছে, কে বা কারা যেন দরজায় এসে ধাক্কা দেয়—রণদা আছো, দরজা খোল।

রণজিৎ বাড়ীতে তখনও ফেরেনি, কি করবে ঋষা! দরজা খুলে দেবে নাকি বলে দেবে বাপী বাড়ীতে নেই, পরে আসুন।

দোটানায় থেকেও দরজা খুলে দেয় ঋষা—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নদীর বাঁধে রুইদাস পাড়ার চারপাঁচ জন লোক। তাদের মধ্যে চেনাজানা বলতে রতনা।

জিজ্ঞাসা করে ঋষা—কি ব্যাপার?

উত্তর দেয় রতনা—রণদা কোথায়? তাকে এক্ষুণি আমাদের পাড়ায় যেতে হবে?

কেন? কি হয়েছে?

হরিরা দলবল বেঁধে এসে খোকনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

কি করেছিল খোকন?

ওদের নাকি একটা বাঁশি চুরি করে এনেছে খোকনের ছেলে। খোকনকে জিজ্ঞাসা করায়—খোকন বলে—না তার ছেলে বাঁশি চুরি করেনি।

তারপর?

ওরা সবাই মিলে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, খোকন বাধা দেওয়ায় ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গেছে।

সে কি!

হ্যাঁগো। তুমি জানো রণদা কোথায় আছে। সে না গেলে ছেলেটাকে ওরা মেরেই ফেলবে। ওরা সবাই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে।

ভয় পায় ঋষা। সত্যি যদি তেমন ঘটে। সে তো সমূহ বিপদ।

রতনাকে বলে—তোমরা একবার বাগপোতা যাও। ওখানে থাকতে পারে।

চলে যায় রতনরা। ঋষা দরজা বন্ধ করে প্রমাদ গুণে। কি হবে বাচ্চাটার। বাপী যে কোথায় যায়!

হঠাৎ শুনতে পায় চিরপরিচিত রণজিৎ এর মোটর বাইকের শব্দ, তাড়াতাড়ি দরজা খুলেই ঋষা বলে—বাপী তুমি একবার রুইদাস পাড়ায় যাও। ওখানে ভীষণ গন্ডগোল হয়েছে। তোমাকে ডাকতে এসেছিল। আমি ওদেরকে বাগপোতা যেতে বলেছি।

ঋষা নিশ্চিন্ত হয়।

মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে রণজিৎ চলে গেছে রুইদাস পাড়া। গিয়ে দেখে খোকন পড়ে আছে মাটিতে, তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। খোকনের বৌ চিৎকার করে বলছে—দাদাগো হরিরা আমার ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে। ওকে মেরে দেবে বলে গেছে গো।

রণজিৎ জিজ্ঞাসা করে কেন?

সমস্ত ঘটনা বলে খোকনের বৌ।

রণজিৎ খোকনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে চলে যায় হরিদের পাড়া। গিয়ে দেখে, এটুকু ছেলেটাকে একটা খুঁটিতে বেঁধে সবাই চড়চাপড় দিয়ে চলেছে। ছেলেটার শরীর ঝুলে পড়েছে বাঁধনের উপর থেকে।

চিৎকার করে ওঠে রণজিৎ,—এক মুহূর্ত দেরী না করে ওকে খুলে দে, নইলে তোদের বিপদ হবে।

মদের নেশায় পাল্টা জবাব দেয় ওরা—কি করবে?

মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি রণজিৎ, সামনে পড়ে থাকা একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে যায় ওদের দিবে। দুচার ঘা দেয় হরিকে।

যে যেখানে ছিল, রণজিৎ এর মারমুখি মেজাজ দেখে ঢুকে যাচ্ছে যে যার ঘরে। হরির দল দৌড়াচ্ছে রণজিৎ এর তাড়া খেয়ে।

ফিরে আসে রণজিৎ। বাঁধন খুলে দেয় বাচ্চাটার। নিয়ে চলে যায় খোকনের বাড়ী।

ঘন্টা কয়েক পরে বাড়ী ফিরে এসেছে রণজিৎ, তখন রাত্রি প্রায় দশটা।

ঋষা জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে বাপী?

সমস্ত ঘটনা বলে রণজিৎ।

বিন্দু দাঁড়িয়েছিল কাছেই, বলে কি সবই না চলছে। ঐ হরিটাকে মেরে ফেলতে পারলে না?

ঋষার মুখে কোন কথা নেই।

নিদ্রাহীনতার রসদ ছিল আবু, যুক্ত হল রুইদাস পাড়ার ঘটনা, এইসব ঘটনাই জীবনবোধ বদলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সমাজ বিশেষ করে উচ্চবিত্ত, ধর্মীয়ভাবে অন্য মেরু, শক্তি সামর্থ হিসেবে প্রতাপশালীরা অথবা যারা 'এলিট' বলে নিজেদেরকে মনে করে তার। শাসন ক্ষমতাকে রাখতে চায় নিজের হাতে। তারা সহ্য করতে পারে না বিপরীত মেরুর উত্থান। হরিরা জনে এবং ধনে বর্ধিষ্ণু হয়েছে। আবু শিক্ষিত হয়েছে, তায় আবার মুসলিম। সুতরাং, ওদেরকে নিকেষ করে দাও। এই হল সমাজ। এরা নাকি বড়াই করে উন্নত চেতনার।

এইসব ভাবনাগুলো ভর করে ঋষার মনে। রণজিৎ ঘুমিয়ে গেছে। বয়সের ভার তাকে টান মেরেছে ক্লান্তির ঘরে। ঋষা একটা গল্প বই নিয়ে বসে পড়ে টেবিল ল্যাম্পের সামনে। কিন্তু মন বসছে না। বন্ধ করে দেয় বইটা। নিভিয়ে দেয় আলো। জল খায় পেট পুরে। শুয়ে পড়ে বিছানায়।

এপাশ ওপাশ করতে থাকে সমস্ত রাত্রি। বাড়ীর পাশের পুকুরে বাসনের টুং টাং, হাসির শব্দ শুনে বুঝতে পারে ভোর হয়েছে। অথচ জানালা খুলতে পারে না, হিমেল হাওয়া ঢুকবে বলে। বারান্দায় বেরোয় হালকা চাদর গায়ে জড়িয়ে। রাস্তাটা এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কথপোকথন শোনা যাচ্ছে পথচলতি মানুষদের।

ফিরে আসে ঘরের মধ্যে। জানালাটার একটা পাল্লা খুলে দেয় ঋষা। জানালা থেকে দেখা যায় পুকুরঘাট। ওখানে রাত্রের এ্যাঁটো বাসন ধুচ্ছে পাশের বাড়ীর বৌদিরা।

ওদের খেয়াল নেই বাড়ীর দোতালার দিকে। ঋষা শুনতে পায়—একজন বলছে ছেলেটা শুনলাম চলে গেছে?

আরেক জন বলছে—চলে গেছে বলে কি আর আসবে না। তোমার দাদা তো বলছিল—ওদেরকে গাঁছাড়া না করলে তার শান্তি নেই।

তা কি আর সম্ভব না কি করা উচিৎ। যাই বলো দিদি। যুগ বদলাচ্ছে। মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে। আজকাল আর সেকেলে গোঁড়ামী নিয়ে থাকলে চলে না।

ও! দুপাতা লেখাপড়া শিখে খুব যে কথা বলতে শিখেছিস্, বলি, তোর ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যদি মুছুরের সাথে ভাব করে, বিয়ে করব বলে, তুই মেনে নিবি?

প্রথমে বোঝাবো, না বুঝলে আর কি করা যাবে। তাছাড়া আজকাল তো এসব হচ্ছেই। সিনেমাতে দেখনি! শর্মিলা ঠাকুর বিয়ে করল মুসলমানকে। তার ছেলে মেয়েরা তো দিব্যি সিনেমা করছে। আমরা, তোমরা সবাই গোগ্রাসে গিলছি। এমন আরও কত আছে।

এই সিনেমাই কাল হয়েছে। জানিস্, আমার ছেলে এখন থেকে বলে কিনা ওসব জাতটাত মানি না। ভাগ্যিস্ তোর দাদা শোনেনি। দিত ভিটেছাড়া করে।

আর পারবেনা দিদি।

তুই কি বলতে চাইছিস্ বলতো, ঐ ধিড়িঙ্গী মেয়েটা যা করছে, ঠিক করছে?

আমি কেন বলব।

শব্দ করে জানলাটা বন্ধ করে দেয় ঋষা। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করে।

একজন বলে—কিরে, কেউ শুনল নাকি?

অপর জন বলে—শুনতেই পারে।

চলে গেছে পাড়ার বৌদিরা। ততক্ষণে পরিস্কার হয়ে গেছে ভোরের আকাশ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঋষা দেখছে, কয়েকটা শালিক এত সকালেই পাশের বাড়ীর টিনের চালে বসে গল্পে মশগুল, কয়েকটা পায়রা সঙ্গ দিয়েছে ওদের সাথে। ডাকছে বক্ বকুম, বক বকুম্।

ওরা শম্ভু জ্যেঠুদের বাড়ীর, জ্যেঠু কিছু ভাঙা চাল ছড়িয়েদিল উঠোনে। পায়রাগুলো দলবদ্ধভাবে নেমে এল উঠোনে। খেতে শুরু করে দিল জ্যেঠুর দেওয়া খাবার। শালিক দুটোর বোধহয় মন কষাকষি হয়েছে। ঝগড়া করতে করতে উড়ে গেল টিনের চাল থেকে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সীমানা থেকে।

রণজিৎ উঠেছে বেশ দেরী করেই। বোধহয় কোন তাড়া নেই। কিংবা বয়স হয়তো তাকে উঠতে দেয়নি। বিন্দু চা দিয়ে গেল এইমাত্র। চা খেয়ে বাথরুম গেল রণজিৎ।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল। নড়ল শিকলটাও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলে। তাতেও বোধহয় শান্তি পেল না আগুন্তুক। ডাক দিল—এ্যা রণদাদা, কুখন থিকে ডাকছি, দরজাটা খুলনা কিনে। এ্যা ঋষা বেটিয়া।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঋষা—কি ব্যাপার সুখচাঁদ জ্যেঠু এত সকলেই যে!

তুয়ার বাপটা আসতি বুলেছিল যে!

তাই! তা কি ব্যাপার?

জানু সে না, আজকে তুয়ার বাপ টাকা দিবেক বলিছে।

তাই বলো, নাহলে এত তাড়া কিসের।

কিনে? আমি কি নাহলে ইখানলে আসি নাই।

সুখচাঁদ রাইমণির তুষুগানের ক্যাসেটটা সঙ্গে এনেছে। সেটা বের করে বলে—ই বেটিয়া, তুকে এই ক্যাসেটটা দিবক, তুই সেরেঙ্গটা ভাল করে তুলে শিখাইঙ্গ দিবিক?

কে শিখবে?

কিনে সুরতি শিখবেক, লখাই শিখবেক, উয়ার বেটিয়া পানমণি শিখবেক।

কোথায়?

তুয়ার ঘরে আসবেক।

কিন্তু আমার সময় কোথায়।

গুরু বারলে।

কিন্তু ....

কোন কিন্তুক লয়, উয়ারা তুলতে পারছেক লাই।

বেশ পাঠাবে। তবে সকালের দিকে পাঠাবে।

তাই হবেক।

রণজিৎ পাঁচটা একশ টাকার নোট নিয়ে সুখচাঁদের হাতে দিল।

সুখচাঁদ বলে—টাকাতো দিলি, এ্য রণদাদা, থাকবিক তো উদিনে।

দেখি।

উসব দেখি থেকি লয়, তুকে থাকতেই হবেক, ডাক্তর দাদাকেউ বলেছি। উও থাকবেক বলছে।

বেশ।

তুয়ার বেটিয়াও থাকবেক, আর থাকবেক আবু।

কিন্তু ....

কোন কথা শোনেনি সুখচাঁদ। নিমন্ত্রণ সেরে, টাকা নিয়ে চলে গেল—রাইমণির তুষুগানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে।

ঋষা ক্যাসেটটা আবার বাজাল। অদ্ভুত মাদকতা সুরে। নিজে গলা মেলাল রাইমণির গানের সাথে, কেন না রবিবার লখা, সুরতি, পানমণিরা আসবে, তাদেরকে শিখিয়ে দিতে হবে।

সুখচাঁদ জেদ ধরেছে এবার বেশ জমিয়ে আসর জমাবে। হারিয়ে দেবে শীলাবতীর দক্ষিণ চরের দলকে।

শনিবারে আবু এসেছে বাড়ীতে। সন্ধ্যায় এসেছে ঋষার বাড়ী। বেশ কিছু সময় কাটিয়েছে ঋষার বাড়ীতে অবশ্যই ঋষার প্রশ্রয়ে। কিন্তু এ পর্যন্তই। বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় কেন কে জানে একটু যেন আবেগ প্রবন হয়ে গেছে আবু, ঋষার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলে—ঋষা একটা অনুরোধ রাখবে?

বল না!

কাছে এস।

এই তো এসেছি।

চোখ বন্ধ কর।

কেন?

বন্ধ করনা।

বেশ করলাম।

ঋষার চুমু খেল আবু। আর ঋষা! সে যেন চোখ খুলতে ভুলে গেছে।

এই ঋষা, কি হল, এবার চোখ খোল?

না, আবুদা ইচ্ছে করছে না।

কেন?

এমনি।

তবে থাক, আমি চললাম।

চোখ খোলে ঋষা। যদিও এখন রাত্রি প্রায় নটা। ঋষা যেন সকালের সূর্যের আলো মেখেছে সমস্ত শরীরময়। সে কেবল দেখছে আবুকে। দোহাতি চেহারা, মুখে সাজানো চাপদাড়ী, টানা চোখ। মুখে তার অমায়িক হাসি।

আবু চলে যাওয়ার পর বিন্দু ঋষাকে বলে, ঋষা!

কিছু বলবে?

তোমাদের মানাবে বেশ ভাল।

এক চিলতে হেসে বিন্দুর কাছ থেকে চলে গেছে ঋষা। হয়তো লজ্জায়।

শীত পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। উত্তরের বাতাস যেন একরোখা হয়ে বয়ে চলেছে সমস্ত দিন রাত্রি।

মাঠে মাঠে সোনার ধানের শিহরণ। এবৎসর ভীষণ ভাল ধান ফলেছে। আনন্দের শেষ নেই কারও।

বিভিন্ন জায়গা যেমন—শালবনী, লালগড়, সারেঙ্গা থেকে এসেছে আদিবাসী কামিন, মরদ, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। তার সাথে রয়েছে স্থানীয়রাও।

এখানে ওখানে কুঁড়ে করে রয়েছে সবাই। সন্ধ্যে হলে গানে মেতে উঠছে কুঁড়েগুলো। আদিবাসী ভাষায় গান। নিস্তব্ধতা ভাঙে শীতের রাতের। কেউ কেউ সাথে নিয়ে এসেছে মাদল। মাদলের বোলে যেন রাত্রি মেতেছে উৎসবে। মাদলের শব্দে গাছে গাছে ডাকছে পেঁচারা।

শৃগাল হুক্কাহুয়ায় সুর তুলেছে নদীর কোলে। গাঁয়ের কুকুরগুলো শৃগালের খোঁজে ছুটছে এদিক ওদিক।

রাত্রি গভীর হয়েছে, থেমে গেছে মাদলের বোল, কামিন মরদের গান, থেমে গেছে পেঁচার রাত্রিকালিন আজান, শৃগালের সুর। কুকুরগুলো ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে এখানে ওখানে।

থামেনি ঝালুরের তুষাগানের মহড়া।

রবিবারে ঋষা তুষুগান শিখাচ্ছে লখা, সুরতি, পানমণিদের। খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নিয়েছে ওরা। ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেটে ওদের গান তুলে রেখেছে ঋষা, সেই গান ওদেরকে শুনিয়ে শুধরে দিচ্ছে ওদের ভুলগুলো। এইভাবেই ওরা তৈরী হয়েছে আসন্ন লড়াইয়ের জন্য। তাছাড়া আসবে রাইমণি, আসবে বাবুয়া, লখাইয়ের দেশ সারেঙ্গা থেকে যারা ধান কাটতে এসেছে, তারাও থাকবে।

সুখচাঁদ, লখাইরা প্রস্তুতি নিচ্ছে, সমস্ত আয়োজন প্রায় সারা, মাইক ভাড়া হয়েছে।

রণজিৎদের ধান কাটতে আসে সুখচাঁদরা। তাই ঋষার সাথে প্রতিদিন যোগাযোগ রাখার কাজটাও সারা হয়ে যাচ্ছে সুখচাঁদদের।

আর মাত্র সাত দিন। চাষীদের ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ। ঠাকুর থানে নতুন ধার

থেকে তৈরী চালের মকর নিয়ে পূজো দেবে চাষীদের বাড়ীর বধূরা। পিঠেপুলির প্রস্তুতি চলছে পাড়ায় পাড়ায়, সন্ধ্যায় ঢেঁকীর গড়ে শব্দ ভাঙছে ঢেকি।

শীলাবতীর উত্তর দক্ষিণের চর খালি করে দিয়েছে খাদানওয়ালারা। প্রতি বৎসর তাই করে। এপাশের, ওপাশের ছোট ছোট গাছের ঝোপ কেটে পরিস্কার করার কাজে হাত দিয়েছে এলাকার আদিবাসীরা। বিভিন্ন গ্রামের লোক জমবে মেলার দিন।

লখাইরা হেঁড়ের ভাত শুকনো করছে খেজুর পাতা'র চাটাইয়ে মিলে। এরপর ঐ শুকনো ভাত ভরবে মাটির কলসিতে, তার সাথে দেবে বাখড (ইষ্ট)। ভাতগুলো সন্ধান ক্রিয়ায় পরিণত হবে হেঁড়েতে।

ঐ দিন হয়তো তেমন রোজগার হবে না সুরতীর। সবাইকে খাওয়াবে বিনে পয়সায়। এমনই রীতি।

সুখচাঁদ প্রায় সবদিন যোগাযোগ রেখে চলেছে ঋষার সাথে। খোঁজ নিচ্ছে—লখাই, সুরতিরা রাইমণির ক্যাসেট করা গান ঠিক মত তুলতে পারছে কিনা। সব ঠিক আছে শুনে ভীষণ খুশি সুখচাঁদ।

ঋষাও শিখে নিয়েছে গানটা। যখন তখন গুন গুন করে সুর ভাঁজে। বিন্দু হাসে ঋষার গলায় তুষু গান শুনে। বিন্দুর হাসিখুশির আরও একটা কারণ—ঋষার মন খারাপের দিনগুলো কেটে গিয়ে সমস্ত শরীরে মনে খুশির ছোঁয়া। কারণটা অবশ্যই আবু। আবু আগের মত বর্ধমান থেকে বাড়ী আসলেই দেখা করতে আসে। বেশ কিছুটা সময় কাটায়, গল্পে হাসিতে ভরে ওঠে পরিবেশ। বিন্দু খুশি, কারণ যেদিনই আবু আসে, তার মাখানো মশলা মুড়ির প্রশংসায় ভরিয়ে দেয় আবু।

বিন্দু হয়তো মা হতে পারেনি গর্ভধারণ করে। কিন্তু মায়ের যা কিছু চাওয়া, যা কিছু করণীয় সবকিছুই পূর্ণতা পেয়েছে ঋষাদের বাড়ীতে।

বিন্দু খুশি কারণ রণজিৎ নিজের বোনের মতই ভালবাসে বিন্দুকে। বিন্দুও বোনের অধিকার নিয়ে শাসন করে, আব্দার করে, যত্ন করে অসহায় রণজিৎকে।

আজ শনিবার। প্রতি শনিবার বাড়ী আসে আবু। এসেই চলে আসে ঋষার কাছে। কিন্তু আজ আসেনি। মন খারাপ ঋষার। রবিবার চলে গেল—আবুর দেখা নেই। কথায় কথায় বিন্দু কথা তোলে রণজিৎ-এর কাছে, হ্যাঁগো, দাদা আবু কি এ সপ্তাহে বাড়ী আসেনি?

এসেছে তো!

কই এখানে আসেনিতো?

তাই কি? আমি তো এসব খোঁজই রাখিনা।

না গো দাদা, একবার খোঁজ নাও, ঋৃষা কেমন যেন মনমরা হয়ে রয়েছে।

সে কি! তাহলে কি, আবার কোন ঝামেলা হল?

জানিনা বাবু। আচ্ছা একখানা গ্রাম হয়েছে। বলি তোদের কি? ওরাও তো মানুষ। তোরা যে এত কেলেঙ্কারী করেছিস্, তখন তো কেউ কিছু বলে না।

হাসে রণজিৎ, বিন্দুর চেতনান্তর দেখে। তারপর বলে আচ্ছা আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

কথাটা কানে গেছে ঋৃষার। রণজিৎ চলে যেতে বিন্দুকে বলে—আচ্ছা কাকী, তোমার বাপীকে বলার কি কোন প্রয়োজন ছিল? কারও যদি মন না চায়, তাহলে কি তাকে জোর করে বশে আনা যায়?

বুঝতে পারে বিন্দু, ঋৃষার অভিমান হয়েছে। সে তো ঋৃষাকে সেই ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছে। আগে তো ক্ষণে ক্ষণে রেগে লাল হয়ে যেত ঋৃষা। সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিত বাইরে। এখন অবশ্য তেমন করে না। কিন্তু মনে মনে ভীষণ কষ্ট পায়।

বিন্দুর হয়েছে যত জ্বালা। অভিমান ভাঙাতে যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয় তার ইয়ত্তা নেই।

বিন্দু বলে—বলেছিতো কি হয়েছে। এমনও তো হতে পারে, ছেলেটার হয়তো শরীর খারাপ। তাই আসতে পারেনি, আমাদের তো খোঁজ নেওয়ারও প্রয়োজন।

উত্তর দেয়নি ঋৃষা। বিন্দুর কথাটা হয়তো মনে ধরেছে। শান্ত হয়ে গেছে ঋৃষা।

আধঘন্টা পরে ফিরে এসেছে রণজিৎ। তার মনে যেন একরাশ দুশ্চিন্তা। তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে ঋৃষা, বিন্দু। তাদের মনে সেই পুরানো জিজ্ঞাসা। তাহলে কি গাঁয়ের লোক, বিশেষ করে শিবু, বুটনরা ....

আর ভাবতে পারছেনা ঋৃষা, বাপীও কোন কথা বলছে না। সে মাথায় হাত দিয়ে সেই যে বসেছে।

সাহসে ভর করে কাছে গিয়ে বিন্দু জিজ্ঞাসা করে দাদা, ওদের কি হয়েছে নাকি?

তাকায় রণজিৎ বিন্দুর দিকে, তার চোখের কোনে চিক্ চিক্ করছে বিন্দু বিন্দু জল। সংবরন করে নিজেকে। তারপর বলে জানিস্ বিন্দু, ফতিমা বোধহয় বাঁচবেনা। সেকি! কি হয়েছে?

কেন যে আবু আমাকে বলল না বুঝলাম না, হয়তো ও যা করেছে ওর বেশী কিছু করতে পারতাম না। তাছাড়া আমারও উচিত ছিল খোঁজ নেওয়া। তুই বলতো বিন্দু, আমি জানবই বা কি করে।

কাছে আসে ঋৃষা—বাপী। কি হয়েছে আবুর মায়ের?

তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে। বোধহয় বাঁচবে না।

তুমি যাবে না?

এক্ষুণি যাব।

কিন্তু এখন তো রাত্রি হয়ে গেছে।

জগাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। ও আসলে দুজনেই যাব।

বলতে বলতে জগা এসে গেছে। তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রণজিৎ। হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

সব হারানোর দিন চলেছে রণজিৎ-এর; যাদেরকে হারিয়েছে, তারা তার মনের মণিকোঠায় থাকা এক একজন। যাকে হয়তো হারাতে হবে, আজ অথবা কাল সে তার চোখে দেখা লুৎফা, সেও তার হবে হৃদয়ে বিরাজ করা প্রিয়তমা।

কোন কোন সময় মানুষের জীবনে এমনই হয়। সব হারিয়ে যায় তার অজান্তে অথবা জ্ঞাতসারে। সে অর্থ হোক, সম্পত্তি হোক। তার দোর্দন্ডপ্রতাপ হোক অথবা তার প্রিয়তম যে বা যারা।

রণজিৎ হারিয়েছে পারুকে, হারিয়েছে রূপালীকে। হারাতে চলেছে ফতিমাকে।

এক একটা ঝড় আছড়ে পড়ছে তার সমতল মনের উপরে সাজানো কুটীরটা ভেঙে দিতে। এবার সে নিঃস্ব হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে তার কুটীরে থাকা শেষ প্রিয়জন।

ঋষা হয়তো জানে না পারুর সাথে তার প্রিয় বাপীর সম্পর্কের খবর। অথবা জানে না ফতিমার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু গাঁয়ের অনেকে জানে বিশেষ করে জানে শিবু, বুটনরা। কেননা তাদের লোভনীয়াকে তারা পায়নি রণজিৎ-এর কাছে হেরে গিয়ে।

তারা হয়তো আনন্দে বিভোর। আনন্দে বিভোর গাঁয়ের আরও অনেকে যারা সহ্য করতে পারে না রণজিৎকে।

বারান্দায় বসে আছে ঋষা, বিন্দু। তারা দেখছে আজকের শীতে মজে থাকা রাত্রিটা অন্যরকম। অন্যান্য দিনের মত নির্জনতা নেই। যাতায়াত করছে অনেকে। শিবু, বুটনরাও। কেন কে জানে বার বার যাচ্ছে আসছে রাস্তা দাপিয়ে। তাদের কথাবার্তাগুলো কানে আসছে ঋষার।

বুঝলি বুটন—এতদিনে মক্ষিরাণী বোধহয় বিদায় নিবে।

শিবু বলছে—তাহলে কি হবে রে। সব কুল যে চলে গেল।

জুটে যাবে আবার কেউ!

এই বয়সে?

বয়স আবার কি, বেশতো চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে আছে।

থাকবে না। আমাদের মত কি মাঠেঘাটে মাথা খুঁড়তে হয়। কথাগুলো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে না।

ঋষা বিন্দুকে বলে—মানুষ কতরকমের হয় দেখছো?

বিন্দু যেন জ্বলছিল। তার উপর বোধহয় কয়েক চামচ ঘী পড়ল।

দেখিস্ ঋষা, মানুষের বিপদে তাকে এইভাবে বলা নয়। ওদের যখন হবে তখন কুকুরও ওদের মুখে পেচ্ছাব করবে ন।

ওসব কেন বলছ?

বলব না! ওরা দাদার নামে যা সব বলে। তুই তো শুনিস্‌নি। শুনলে তোরও গা জ্বলে যেত।

কথা বাড়ায়নি ঋষা। সে তো জানে, উস্‌কিয়ে দিলে বিন্দু বদলে যায়। তখন সে আসল রূপ ধরে। অথচ বিন্দু বলেই চলেছে। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার বলতো, এখনও তো বাপী এল না।

হঠাৎ যেন একটা দুশ্চিন্তা গ্রাস করে বিন্দুকে। তাহলে কি ....

ঋষা তাকায় বিন্দুর দিকে .... কি বলছ?

রাস্তা দিকে আর কেউ যাচ্ছে না।

ঋষা, বিন্দু ঢুকে গেছে ঘরে।

রাত্রি বারটা বাজল, একটা বাজল, দুটো বাজল রণজিৎ-এর ফেরার নাম নেই।

বিন্দু, ঋষার চোখেও ঘুম নেই। তখন ভোর পাঁচটা। শীতের ভোর মানে তখনও অন্ধকার। ঋষার কানে আসে তার অতি পরিচিত মোটর বাইকের শব্দ। থেমে গেছে দরজার কাছে এসে। তাড়াতাড়ি দোতলা থেকে নেমে এসেছে বিন্দু, ঋষা। দরজা খুলেই দেখে রণজিৎ-এর চোখে মুখে ভীষণ হতাশার চিহ্ন। প্রায় টলতে টলতে ঘর ঢুকে রণজিৎ, তারপর বসে পড়ে চেয়ারটার উপরে। সাথে জগা নেই।

ঋষা জিজ্ঞাসা করে—বাপী?

ফতিমা চলে গেছেরে মা! আবু অসহায় হয়ে গেল।

ঋষার চোখ থেকে নামছে সহস্রধারা। বিন্দুর চোখে জল। উদাস রণজিৎ, তার কান্না হারিয়ে গেছে নাকি রেখে এসেছে ফতিমার কাছে।

সকাল হয়েছে আর পাঁচটা শীতের সকালের মতই। রাস্তায় বেরিয়েছে মানুষ। তাদের মুখে মুখে ফতিমার মৃত্যুর কথা। সবাই জেনে গেছে জগার কাছ থেকে।

সকাল দশটায় এসেছে মরদেহ। আবু, লখাই নিয়ে এসেছে। রাখা হয়েছে শীলাবতীর দক্ষিণ চরে।

কেন কে জানে গতকালও শীলাবতীর যে সামান্যতম স্রোত, সেটা ছিল। আজ নেই, সেও যেন গভীর বেদনায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে কেউ খালের বুকে।

রণজিৎ ফেরার পথেই খবর পাঠিয়েছিল ক্ষীরপাই এর কাছাকাছি মুসলিম মহল্লায়। সবাই জুটেছে শীলাবতীর চরে। আবু হতাশ, উদাস, বসে আছে তার আম্মার পাশে।

রণজিৎ এসেছে। এসেছে ঋষা, বিন্দুও বাড়ীতে থাকতে পারে নি।

সুখচাঁদ, রূপচাঁদ, সুরতি, লখাই, ওরা আগেই এসেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কবরস্থ হবে ফতিমার শরীর। তার প্রস্তুতি চলছে।

জানায়ার নমাজ শুরু করেছে পির থানের সেম্ জলিল সাহেব।

না ওয়ায়তো আস্ উয়াদ্দিয়া, আরবায়া ও তাক্‌বীরাতে, মালাত্তিন জানাজাতে ফারজিল কেফায়াতে আস্‌মানও হিল্লাহে আয়ালা ওয়াস্ সালাতো আলান্—নাবীয়ে ওয়াদ্‌দোয়াও লেহাজীল মাইয়্যেতে মোতাওয়াজ্জেহান, ইলাজেহাতিল কা-বাতিশ শারীফাতে আল্লাহ আক্‌বার।

সোবাইনোকা আল্লাহোম্মা ওয়া বেহামদেকওয়া তাবায়াকাস্‌মোকা ওয়া তায়ালা জাদ্দেকা ওয়া জাল্লা সানায়ূকাওয়া লা-ইলাহা গায়রুকা।

আল্লা হোম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদেঁও ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আবারকেতা অ-তারহায়তা আলা ইব্রাহীমা অ-আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাদো হামীদূম্ মাজীদ।

আল্লাহোম্মাগ্‌ফের লেহাই য়্যেতেনা ওয়া মাইয়েতেনা ওয়া শাহেদেনা ওয়া গায়েবেনাঁ ওয়া সাগীরেনা ওয়া, কাবীরেনা ওয়া জাকারেনা ওয়া উণ্‌সানা আল্লাহোম্মা মান আহইয়ায় তাহুমিন্না ফা আহয়েহী আলাল এসলামে ওয়া মান তাওয়াফ ফায় তাহু মিন্না ফাতাও য়াফফাহু আলাল্ ইমানে বেরা হামাতেকা ইয়া অরহামার রাহেমীনা।

অনেক মানুষের সমাগম শীলাবতীর চরটাকে যেন অন্য মাত্রা দিয়েছে। তারা সবাই নির্বাক। নির্বাক রণজিৎ, তার চোখ যেন শুকিয়ে গেছে। ঋষার চোখ ভেজা ভেজা, বিন্দুর দুচোখ বেয়ে জল নামছে। আবুর চোখে জল নেই। সুখচাঁদ চোখের জল সংবরণ করতে পারেনি। লখাই তাকিয়ে আছে আবুর দিকে। সুরতি কাঁদছে সুর করে।

রণজিৎ দেখছে, যেন শুনছে এই শীলাবতীর চরে শীলাবতী যেন মৃত্যুর গান গাইছে তার মত করে। যে গানের ভাষা বাংলা, নাকি সাঁওতালী নাকি আরবি তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তার সুর ভীষণ বেদনাময়।

থম্‌থমে আকাশ, একটা একটা হালকা মেঘ মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে আলোকে, তখন ছায়া পড়ছে নদীর চরে। সবাই যাকে বলে শীতের মেঘ।

সলেমান এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে শূণ্যে তার বেগম চলে যাচ্ছে কোথায় সে জানে না। সে যেটুকু জানে তা হল ফতিমা নেই। আবুর আম্মা হারিয়ে গেছে চির মৃত্যুর ভীড়ে। সে আর ফিরে আসবেনা কোন দিন, সে জানবেওনা সলেমান কেমন আছে। আবু কি করছে।

সলেমান তাহের সিদ্দিকি শেষবারের মতো জানাজার নমাজ পড়ছে সেখ জলিলের সাথে গলা মিলিয়ে। গলা মিলিয়েছে আবু তাহের সিদ্দিকি—

আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর। আশ্হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহা, আসহাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লহা, আসহাদের আল্লা মোহাম্মাদার রাসুলোল্লাহ্, আশ্হাদো আল্লা মোহাম্মাদার রসুল আল্লাহো, হাইয়া আলাশ্ সালাহ, হাইয়া আলাশসালাহ, হাইয়া আলাল্ ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আল্লাহো আক্বর, আল্লাহো আক্বর, লা এলাহা ইল্লাহ।

সমবেত মানুষ যেন মন্ত্রমুগ্ধ, শোকাহত, সমবেদনাময়, কোন্ জাত, কোন্ ধর্ম, কোন সম্প্রদায়! একটি মৃত্যু সব ব্যবধান মুছে দিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। কেননা সবাই মানুষ, কেননা মৃতদেহ একটি মানুষের, যে মানুষ ভগবান. আল্লা, গড যেই হোক না কেন তারই শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীবন।

জীবন আসে, বিমুগ্ধ হয় আগমনে। জীবন নিভে যায় অনন্ত দুঃখে সবাইকে ভাসিয়ে।

ফতিমা মানুষ। মানুষ হিসেবে সব মানুষ এসেছে শেষ কাজ সম্পন্নের সময়। যা হওয়া উচিত, যা হলে বিভেদের প্রাচীর থাকে না। থাকে না এখানে ওখানে রক্তের অযৌক্তিক দাগ।

সুখচাঁদ বিমূঢ় হয়ে গেছে, সে তো আদিবাসী। ফতিমা মুসলিম।

ঋষা যেন বধির সে তো হিন্দু, ফতিমা মুসলিম।

রণজিৎ একরাশ শূণ্যতায় অবগাহনে। হয়তো ফতিমার প্রতি তার ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়। যে ফতিমা মুসলিম।

আমি দেখেছি সমবেত মানুষগুলোকে, যাদের চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু জল। হয়তো শিবু, বুটনরা আসেনি। কিন্তু তারাতো সংখ্যালঘু। সমাজে ওরা অপ্রয়োজনীয়। বিন্দু তো আভুক্ত কাজের মেয়ে। তাহলে তার চোখে কেন সহস্রধারা? কারণ সে যে মানুষ, মানুষের প্রতি তার অশিক্ষিত মনেও সহমর্মিতার আবেশ।

কবরস্থ শেষ। সবাই চলে যাচ্ছে চোখের জল মুছতে মুছতে। আবুকে নিয়ে গেল ঋষা, সলেমান আমার বাহুবন্ধনে বাড়ীর পথে।

কিন্তু রণজিৎ!

সে বসে আছে শীলাবতীর দক্ষিণ পারে, যেখানে হিজল গাছটা ছিল, এখন নেই। রয়েছে একটা চারা জামগাছ। সে যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে শীলাবতীর চরের বিদায়ী সঙ্গীতের মনভাঙা সুর। সে যেন অবশ হয়ে গেছে, আর তার মন।

সলেমানকে বাড়ীতে রেখে ফিরে আসব বাড়ীতে। এমনই ভাবনা ছিল, পারিনি। মন বলছিল রণজিৎ এখনও বসে আছে চারা জামের তলায়। গিয়ে দেখলাম আমার মনের কথাই ঠিক।

আমার উপস্থিতিও বুঝতে পারেনি রণজিৎ। তার চোখ ফতিমার কবরের দিকে। যে তার শেষ ভালবাসা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছি। দেখেছি, রণজিৎ এর দুটো ঠোঁট নড়ে চলেছে অবিরাম। তার চোখ দুটো থেকে জল নেমে আসছে দু গাল বেয়ে।

ডাকলাম—রণজিৎ? সাড়া দিল না। আবার ডাকলাম—রণজিৎ? ওঠ, বাড়ী যেতে হবে।

তাকাল রণজিৎ, আমার দিকে, তারপর কোন কথা না বলেই উঠে পড়ল।

বললাম—জানি রণজিৎ, তোর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যা বাস্তব সে তো বাস্তবই।

আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরল রণজিৎ, বলল—সব হারালাম অনিন্দ!

রণজিৎ বাড়ীর পথে যেতে যেতে আর কোন কথা বলেনি, কেবল বার বার পিছন ফিরে দেখেছে। যেখানে পারু আছে, রূপালী আছে, তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ফতিমা, যাকে সে লুৎফার আসনে বসিয়েছিল।

ঝিমিয়ে পড়েছে সুখচাঁদ, ভাঁটা পড়েছে তুষু সেরেঙ্গের মহড়ায়। কারণ একটি মৃত্যু। আর মাত্র সাতদিন বাকী। তবু সে দুদিন পরেই চলে এসেছে রণজিৎ-এর বাড়ী। দরজায় কড়া নেড়েছে আগের মতই। আগের মতই ঋষা দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করে—কি জ্যেঠু, কি খবর। সুখচাঁদ বলে—বেটিয়া, কুত ভেবেছিলাম, ইবার বেশ জুম করে সেরেঙ্গ চলাবক শীলাবতীর চরলে। সুব্বাই যাবেক উখানরে। কিন্তুক কুথা থেকে যে কি হইঙ্গ গিল!

ঋষা দেখছে সুখচাঁদকে, কি উত্তর সে দেবে। তার সমস্ত মন জুড়ে যে এক অসহায় আবু। তিনদিন কেটে যাওয়ার পরেও যেন প্রকৃতিস্থ হতে পারেনি আবু। সে যেন পৃথিবীতে একা। সেইভাবেই এক একটি দিন কাটিয়ে চলেছে নিদ্রাহীনতা নিয়ে। ঋষা আবুর বাড়ী গিয়ে আবুকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে এমন কি সে তার পাশে আছে এমন আশ্বাস দিয়েও মন থেকে তার আম্মার পড়ে থাকা ছায়াকে সরাতে পারছে না।

সুখচাঁদ ঋষাকে দেখে বুঝতে পারে, ঋষাও যেন মরমে মরে আছে।

সস্নেহে ডাকে—এ্যা বেটিয়া, তুয়ার মনটাও যদি ইমন হইয়ে যায়, তাহলে আবুর কি হবেক বটে।

সত্যিই তো কি হবে আবুর। ঋষা ভাবে, কেন এমন হয়, কেন কাঁদে মন!

রণজিৎ নেমে আসে দোতলা থেকে। সেও যেন বিভ্রান্ত, যা তার মত ডাকসাইটে মানুষের ক্ষেত্রে বেমানান।

রণজিৎকে দেখে সুখচাঁদ বলে—এ্যা রণদাদা, তুয়াদের কি হইঙ্গছে বুলদিখিনি। মনটা ইমন দুব্বল হলে চলবেক কিমন করে।

রণজিৎ দেখছে সুখচাঁদকে—সে যেন বাড়ীর বৃদ্ধ অভিভাবক। শত দুঃখেও সে সবার দুঃখকে দূরে সরিয়ে প্রাত্যহিকতায় ফিরে আসার জন্য সাহস সরবরাহ করছে।

বেশ কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর সুখচাঁদ কথা বলে—তুবে আজ থাক্। পরে কুথা হবেক। উঠে পড়ে সুখচাঁদ।

রণজিৎ বাধা দেয়। না না সুখচাঁদ চলে যেওনা। বল, কি বলবে বলে এসেছিলে।

সুখচাঁদ আবার মেঝেতে বসে পড়ে বলে—রণদাদা, কুত দুঃখ ই জীবনে আসে। উয়ারা চলেইঙ্গ যায় যিমনভাবে আসেছিল। তুকেও একদিন যেতি হবেক। আমকেও চলবেক কিনে! চলাইঙ্গ যেতি হবেক। সুবার চোখের জল লিয়ে। ইটাত ঠিকই বটে। তুবে ইত ভেঙে পড়লে চলবেন।

ততক্ষণে বিন্দুর চা হয়ে গেছে। চায়ের গ্লাসগুলো ধরিয়ে দেয় ঋষা, রণজিৎ, সুখচাঁদকে।

চা খেতে খেতে সুখচাঁদ বলে—জানু রণদাদা, কুতরকম মানুষ ভাবে, কুতরকম প্যল্যন হয়। ইটা হবেক, উটা হবেক। কিন্তুক মারাংবুরু ভাবেক অন্যরকম। উয়ার বিধানই শেষ বিধান।

এই যে দিখনা কিনে, কুত দিনলে ভাবছি ইবার কুতদিন আর বাঁচবক। ইবার জুম করে মেলা বসাবক শীলাবতীর চরলে। মাদল বাজবেক, ধামসা বাজবেক, সুব্বাইকে জুটাইঙ্গ সেরেঙ্গে সেরেঙ্গে মাতাই দিবক।

তুয়ারা যাবি, আবু যাবেক, উয়ার মাকে, বাবাকেও বলাইঙ্গছিলম, আশেপাশের গাঁ গুলানে বলাইঙ্গছিলম।

ভাল মানুষটা মরাইঙ্গ গিল। তাল কাটাইঙ্গ গিল। ই পচা শরীলের দাম কানাকড়ি! কি জানি, মেলার দিন হয়ত আমিও চলেইঙ্গ যাব উপারলে।

বিন্দু সায় দিল—তা ঠিক। তা নাহলে যার যাওয়ার কথা সে না গিয়ে ফতিমা চলে যায়। নাকি আমাদের রূপালী বৌদিদি সবাইকে অকূলে ভাসিয়ে চলে যায়!

ইটার জন্যই তো বলছি। যা হবার হইঙ্গ গিছে। ই বছরই মেলা হবেক জুম কিরে। তুয়াদেরকে যেতি হবেক। না বললে হবেক লাই।

বিন্দু আবার সায় দিল—সে তো বটেই।

চা খাওয়া শেষ হল। শেষ হল আলোচনা। উঠে যাওয়ার আগে সুখচাঁদ বলে—

এ্য বেটিয়া তুকে তো যেতি হবেকই, তুকে লিয়ে যেতে হবেক আবুকে। জানি উয়ার মনটা ভাঙ্গাই গিছে। না গিলে চলবেক লাই।

হাসে ঋষা। সে হাসিতে অনেক কষ্টের ছবি। তবুও বলে—চেষ্টা করব জ্যেঠু।

চলে গেছে সুখচাঁদ। যাওয়ার পথে তার পরিচিত, অপরিচিত সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছে পৌষসংক্রান্তিতে শীলাবতীর চরে তুষুগানের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। এমনকি বলতে ভুলে যায়নি তার মেয়ে রাইমণি গান গাইবে ঐ মেলায়।

বাড়ী ফিরে গিয়ে হেঁড়ের বাটী নিয়ে বসেছে সুখচাঁদ, সাথে আছে লখাই, রূপচাঁদ।

আজ সুখচাঁদের মুখে সহস্র আনন্দের ভাষা। সেই প্রধান বক্তা; সবাই তার শ্রোতা।

কথায় কথায় কথা বাড়ছে হেঁড়ের আসরে। সুখচাঁদ-লখা, রূপচাঁদকে বলে—ইবার তো আমার সময় হইঙ্গগিল। ভাবছি মুখিয়াগিরি ইবার থেকে ছাড়াইঙ্গদিবক। তুয়াদের একজনকে লিতে হবেক। তা করতি হলে ডাকতে হবেক সব লোককে। ই মেলাটা ভালয় ভালয় হইঙ্গ গিলে—এ্য রূপচাঁদ তুয়ার উপরে দায়ীত্ব, তুই ডাকাইঙ্গ দে সাতটা গাঁকে। উখানেই ঠিক হবেক তুয়ার নাম, লখাই পারবেক লাই, তুবে তুকে সাহায্য করবেক।

রূপচাঁদ বলে—কিনে গো দাদা, তুমিত ঠিকই ছিলে।

নারে রূপচাঁদ, বয়স হইঙ্গ গিল, গতর ইবার আলগা হইঙ্গ গিছে। মনের জোর কমেইঙ্গ গিছে। তাছাড়া ইখনকার ছিলাছকরারা সব অন্যরকম। বুড়হাকে পছন্দ হবেক কিনে!

সে হবেক খন, উটা ইখন ভাবতে হবেক লাই, ইখন যিটা ভাবার উটা লিয়েই ভাবা ভাল, কি বল্ লখাই?

লখাই বলে—সে তো ঠিকই।

রূপচাঁদতো তাই চেয়েছিল। তার মনের কথাটাই বলেছে সুখচাঁদ। সুতরাং; সাতখুন মাপ। একসময় হেঁড়ের আসর ভাঙ্গল। চলে গেল রূপচাঁদ তার ঘরে। সুখচাঁদ রয়ে গেল লখাই এর ঘরে। আজ এখানই থাকবে। খাওয়াদাওয়া করবে। লখাই, সুরতির গলায় রাইমণির লেখা সেরেঙ্গ শুনবে।

কিন্তু গাইবে কে? লখাই যে পরিমাণ খেয়েছে, তাতে তার চোখে সমস্ত পৃথিবীর ঘুম জড়িয়ে আসে। সুরতির কথা বলার ক্ষমতাই নেই। অগত্যা যা হয় নেশার ঝোঁকে, সুখচাঁদ নিজেই ধরেছে সেরেঙ্গ। এককলি গাওয়ার পর নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছে সুখচাঁদ। খাবার রয়ে গেছে হাঁড়িতে। সে রাত্রিতে আর কেউ খায়নি।

সকালে ঘুম ভেঙেছে রূপচাঁদের ডাকে। তখন সকাল দশটা। রাইমণি চিঠি পাঠিয়েছে ঘাটাল মেদিনীপুর বাসে। চিঠিতো পাঠিয়েছে। পড়বে কে? কেউতো লেখাপড়া জানে না।

এই এক সমস্যা, পিছড়ে বর্গ মানুষদের। দু একটা ছেলেমেয়ে ছাড়া ধারপাশ মাড়ায়না স্কুলের। নিদেন পক্ষে পাঠশালার। অথচ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হয়েছে। শিশু শিক্ষাকেন্দ্র হয়েছে। সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পাওয়া গেছে শ্লেট পেন্সিল। রাত্রির জন্য হ্যারিকেন। যেখানে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে; সেখানে বিদ্যুতের আলো। হলে কি হবে, ঐসব পিছিয়ে পড়া মানুষরা কেবল বোঝে কাজ, কাজ আর কাজ। তাছাড়া অল্প বয়সে ধরেছে নেশা, আছে রাত্রিকালিন ভিডিও, আছে যৌনতা।

সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। সমাজবিদদের উপদেশের অন্ত নেই। কিভাবে ওদেরকে স্বাক্ষর করা যাবে তার পরিকল্পনার শেষ নেই।

এই এক ব্যার্থতা। এর গ্লানি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে অজস্র আলোর মধ্যেও এক টুকরো অন্ধকারের মত। একটুকরো অন্ধকারই বা বলা যাবে কি করে। শিক্ষাই তো আনে চেতনা।

রূপচাঁদের ছেলে, নাম তার রাইচাঁদ, ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে আর স্কুলমুখো হয়নি। সেই বিদ্যা নিয়ে পাড়ার গন্যমান্য সে। তারও দেখা নেই। সকাল হতেই সাইকেল নিয়ে চলে গেছে আড্ডা মারতে। ফিরবে দুপুরে, অবশ্য নাও ফিরতে পারে।

সুখচাঁদ ছট্‌ফট্ করছে। তার মেয়ে রাইমণি কি লিখেছে জানার জন্য। রাগ হচ্ছে নিজের উপর। আজ সে চোখ থাকতে অন্ধ।

আবার ভালও লাগছে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাইমণি শিক্ষিতা হয়েছে।

রূপচাঁদকে সুখচাঁদ বলে—কিমনটা হল জানু, আমদের হাতের কাছে খাবারটা পড়াইঙ্গ রইয়েছে। আমাদের জিভটা লক্‌লক্ কুরছে। তুলি যে খাবক, সে উপায় লাই। কিনে বলদিখিনি?

জিজ্ঞাসা করে রূপচাঁদ কিনে?

হাতদুটা লুলা হইঙ্গ গিছে। ঠুটা হইঙ্গ গিছে, ইবার মরনা, ভুখা পিটে থাকতি হবেক গটা জীবন।

হ্য, ইটা বা ঠিক কইয়েছ। তুখনকি জানতম, লিখাপড়া না শিখলে কুনু দাম লাই।

ইখনত বুঝলি তবে তুয়ার ব্যাটাটাকে শিখালিনাই কিনে?

ইটাই ত যত সমস্যা। উকে পাঠালম, উয়ার আয়ু (মা) বুলল, কি হবেক লিখাপড়া শিখে, মাস্টরি করবেক? তাহলে জমিনগুলার হবেক কি? চাষীদের কে বাঁচাবেক।

তা বটে, কিন্তুক, সংসারটা তো ভাগ হতিহতি জমিনগুলান ছোট হইঙ্গ যাচ্ছে। চাষীরা জমিন ছাড়াইঙ্গ দিচ্ছে খরচের ডরে। কি করবেক উয়ারা।

উটাইত ভাবি ভাবি মনটা বিগড়াইঙ্গ যাচ্ছে গ দাদা।

তুয়ার আর কি। মাইয়াটা শিখছে। তুকে উসব ভাবতি হবেক লাই।

তুখন আমিয় উটাই ভাবতম, কি হবেক লিখাপড়া শিখে।

দিখনা কিনে, বাবুয়ার লগে কুত কি বুলেছি। ইখন মনে হচ্ছে রণদাদার বৌটাই চোখ খুলাইঙ্গ দিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রূপচাঁদের বুক থেকে। আর সুখচাঁদ। সে যেন পিছিয়ে পড়া সমাজের মধ্যে এক গর্বিত পিতা।

কিন্তু চিঠিটা পড়বে কে? সুখচাঁদের মাথায় এল খুৃষার কাছে যাবে।

ভাবার সাথে সাথেই কাজ। হাত মুখ না ধুয়েই পা বাড়াল শ্রীরামপুরের পথে।

গিয়ে দেখা হল খুৃষার সাথে। তাকে চিঠিটা দিয়ে বলল—এ্য বেটিয়া, দিখনা কিনে, কি লিখেইঙ্গছে রাইমণি?

চিঠিটা পড়ে শুনাল খুৃষা। যেখানে লেখা আছে—রাইমণি বাবুয়া আসবে তুষু মেলার দিনে। তবে একটু দেরী হবে। তার আসার আগেই যেন অনুষ্ঠান শুরু করে দেওয়া হয়।

মনটা যেন ভারী হয়ে গেল সুখচাঁদের। বলল—বলদিখিনি বেটিয়া, ই কিমন কুথা। উয়ারা বলল কি, আগের দিন আসবেক। সকালেরে শুরু হবেক সবকিছু, ইখন বলছে পরের দিন আসবেক।

তাতে কি হয়েছে। নিশ্চয় ওদের কোন কাজ আছে। তাছাড়া তোমরা তো আছ, আছে রাইমণির গলায় গাওয়া ক্যাসেট, সেটাই বাজাবে সকাল থেকে।

হ্য, সিটা তো বটেই, তুবে কি জানু, উয়ার মা ত লাই। মনটা কিমন কু গাইছে।

না না, ওসব তোমার মনের ভ্রম।

সিটাই যেন হয়।

চলে গেছে সুখচাঁদ। সে হেসেছিল, কিন্তু হাসির মধ্যে প্রাণ ছিল না, কেমন যেন বিষাদ, বিষাদ।

আবুর মন ভীষণ খারাপ, বাড়ীতেই আছে সে, আর তার আব্বা সলেমান তাহের সিদ্দিকি। সলেমান যে সুস্থ তা নয়, ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের রেসটুকু আর এক নতুন স্বপ্নে সংযোজন করে চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াতে।

উঠে দাঁড়াতে—কেননা আবুকে নিয়ে বা আবুর জন্য যা কিছু সবই এতদিন ফতিমা করে এসেছে। সলেমান কেবল যোগান দিয়ে গেছে। আর ফতিমার চোখ দিয়ে দেখেছে ভবিষ্যৎ আবুকে। আজ ফতিমা নেই। দায়িত্ব যা কিছু সবই সলেমানের। ভাঙা শরীর

নিয়ে কাজের সাইডে যায়। সবার সাথে দেখা হয়, কথা হয়, মনটাও ভাল থাকে। পয়সাও বেশী আসে। তাছাড়া তার শারীরীক উপস্থিতিতে খুশি, তার কাজের লোকেরা।

আবু বার বার অনুরোধ করে—আব্বা। তোমার শরীর খারাপ, কি দরকার এত দূরে দূরে যাওয়ার। তোমার লোকজনতো আছে।

আছে সবাই। কিন্তু সেখানেতো অনেক ভাগ দিতে দিতে চলে যাবে সব।

সেই ভাবেই তো চলছিল। নাকি তুমি সবকিছু ভুলে থাকার জন্য চলে যাচ্ছ!

বুঝতে পারে সলেমান, আবুর কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু কেন কে জানে বাড়ীতে মন বসে না। ভাল লাগে না আবুর শুখিয়ে যাওয়া মুখটা দেখতে।

আব্বা!

কি রে?

একটা কথা বলব?

বলনা।

আমি আর বর্ধমানে যাব না।

কেন রে?

তোমার ব্যবসাটা দেখতে তো হবে।

না আবু। তোর আম্মার স্বপ্ন যে অপূর্ণ রয়ে যাবে। তুই লেখাপড়া শিখে চাকরী করবি। আমাদের বুক গর্বে ভরে যাবে। এই স্বপ্নই দেখত তোর আম্মা।

আর তুমি?

আনি তো লেখাপড়া জানি না, মর্মও বুঝি না। তোর আম্মার কাছে শুনতে শুনতে আমারও তাই মনে হত।

চাকরী যে পাবই, এমন নিশ্চয়তা কোথায়?

জানিস্ আবু, রণভাই, অনিন্দভাই বলত—দেখ সলেমান ভাই, তোমার ছেলে চাকরী পাবেই। তখন আর তোমাদেরকে কষ্ট করতে হবে না।

হাসে আবু। সে হাসিতে অদ্ভুত এক তৃপ্তির সে স্বপ্নের। সে হাসিতে অদ্ভুত বিষাদ-আম্মার অনুপস্থিতিতে।

সলেমান বুঝতে পারে মিশ্র হাসির কারণ। হঠাৎ বলে—আবু! খুব মন খারাপ করছে, নারে?

কোন উত্তর দেয়নি আবু। তার দুটো চোখের কোন্ কেবল চক্ চক্ করছে জমে থাকা জলে সূর্যের আলো পড়ে।

সলেমান চলে গেছে বাইরে। বোধহয় চায়ের দোকানে। ভাল লাগছেনা আবুর। ইদানিং ভীষণ মনখারাপ করে খৃষার জন্য। সে যেন আম্মাকে হারিয়ে বেশী বেশী খৃষা নির্ভর হয়ে উঠছে। হয়তো একটু স্নেহ, একটু ভালবাসার জন্য।

সলেমান ফিরে আসলে বলে আব্বা, আমি একটু রণজিৎ কাকুদের বাড়ী যাচ্ছি।

এখন যাবি। কেউ যদি কিছু বলে!

বলবে না আব্বা।

যা ভাল বুঝিস্ কর।

চলে আসে আবু ঋষার বাড়ী। ঋষা বাড়ীতেই আছে। আছে বিন্দুও। রণজিৎও আজ বাইরে যায়নি।

তিনজনে বসে গল্পের আর কথার জাল বুনছে তাদের অতীতকে নিয়ে, অতীত এবং বর্তমান সমাজকে নিয়ে। মানুষের মিশ্র চেতনাকে নিয়ে।

বিন্দু মাঝে মধ্যে চা যোগান দিচ্ছে। মাঝে মাঝে অতি উৎসাহে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে ত্রয়ীর আলোচনা। মাঝেমাঝে সায় দিচ্ছে ওদের কথার মাঝে।

দুপুর হয়ে গেছে। কারও খেয়াল নেই। বিন্দুই এসে জানান দিল—কি গো তোমরা কি না খেয়ে গল্পই করে যাবে। এদিকে যে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চলল।

ঋষা বলে—তা তুমিতো বলবে!

রণজিৎ আবুকে বলে—আজ এখানেই খেয়ে যাও। দেরী তো বেশ হল।

না কাকু, আব্বা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। অন্য একদিন বরং খেয়ে যাব।

ঋষা বলে—তা খাবে কেন? বাড়ীতে অনেক কিছু তো হয়েছে ....

হাসে আবু, তারপর হঠাৎ যেন বদলে যায়। আমাদের কে আছে বলো, যে অনেক কিছু করবে।

বুঝতে পারে ঋষা। আবু কষ্ট পেয়েছে। বুঝতে পারে—কথাটা বলা উচিৎ হয়নি। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে আবুদা, Please কিছু মনে করো না। আমি এমনি বললাম।

না না মনে করব কেন; তাছাড়া ....

থাক আর কিছু বলতে হবে না। পারতো সন্ধ্যায় আসবে। বাপী বাড়ীতেই থাকবে। অনেক গল্প হবে।

দেখি!

চলে গেছে আবু। খাওয়া দাওয়া সেরেছে ঋষা, রণজিৎ, তারপরে বিন্দু।

এবার দিবা নিদ্রা। কিন্তু ঘুম আসছে না ঋষার। তার মনের মধ্যে আবুকে বলা কথা এবং আবুর বলা কথাগুলো বার বার খোঁচা দিচ্ছে।

মনে হচ্ছে—কেন যে বললাম। বেচারা এই কদিন আগে মাকে হারিয়ে এমনিতে মরমে মরে আছে। ভাবে, সন্ধ্যায় আসলে তার কাছে আর একবার ক্ষমা চেয়ে নেব।

তখন সবে সূর্য পাঠে বসছে। পাখীরা ফিরে যাচ্ছে নীড়ে। পাড়ার রতন ঠাকুমার বোধহয় হাঁস হারিয়ে গেছে—পুকুর পারে এসে ডাকছে আয় আয় চই চই, চই চই, চই চই। কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না তার হারিয়ে যাওয়া হাঁসটা। ওটা নাকি ডিম দেয় প্রতি মাসে

কুড়ি, বাইশটা। এমনই গল্প করেছিল রতন ঠাকুমা। আর ডিম পাওয়া যাবে না নাতী, নাতনীরা খেতে পাবে না। এই শোকে গলা ফুলিয়ে কারও নাম না ধরে গালি দিচ্ছে মুখ পোড়ারা আমার হাঁস না খেয়ে তোর ব্যাটা, বেটির মাথা খা। গরু খা, শুয়ার খা, এ্যাঁ কি দিন এল গো, নাই বললেই নাই। বলি আমার গু না খেলেই নয়। কবে তোদের মাথায় বজ্রাঘাৎ পড়বেরে। কবে সপ্পাঘাৎ হবে রে।

সুর করে গালিগালাজ দিয়ে চলেছে রতন ঠাকুমা। অনেকে জুটে গেছে পুকুর পারে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মজা করে উস্‌কে দিচ্ছে বুড়িকে। —সত্যি ঠাকুমা, এ ভারি অন্যায়, কি দরকার ছিল হাঁসটা খেয়ে নেওয়ার। চাইলেই তো ঠাকুমা ডিম দিত।

কেউ কেউ রেগে যাচ্ছে—ছি ছি, একটা হাঁস বইত কিছু নয়। এভাবে গালিগালাজ, অভিশাপ দেয়।

সবই কানে যাচ্ছে রতন ঠাকুমার। বলি বলব নাত কি।

এমন ললা যে আমার হাঁসটা খেয়ে নিল। রক্ত বমি হয়ে মরবিরে। যে আমার হাঁস খাবি, তার সব্বাঙ্গে পক্ষাঘাৎ হয়ে যাবে রে।

রতন ঠাকুমা যখন থামলো, তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে।

থামল কারণ বাড়ীতে যেতে হবে। যদিও বাড়ী খুব সামনে। হলে কি হবে রাত্রে চোখে ঠাহর হয় না। পাছে যদি যেতে না পারে। এখানে ওখানে, খানাখন্দে পা পড়ে, পড়ে যায়। টন্‌টনে জ্ঞান বুড়ির। খাওয়ার সময় বলে যায়, হাঁস যদি না পাই, কাল বনার কাছে বিচার দেব, দেখি তোরা কি করিস্।

হাসছে ঋষা। ঐ রতন ঠাকুমা যখন তখন বাপীর কাছে এসে নালিশ জানায় বৌদের বিরুদ্ধে। কখনও ছেলেদের বিরুদ্ধে কখনও পাড়াপড়শীর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয় যতক্ষণ না বাপী তাদেরকে ধমকে আসে (অবশ্যই মিছামিছি) ততক্ষণ তার শান্তি আসে না।

রণজিৎ বলে—এবার কি করবরে। কালই তো আসবে। কাকে ধরব।

আচ্ছা বাপী, এক কাজ করলে হয় না?

কি কাজ?

ক্যল তো বুধবার, নবগ্রামের হাট থেকে একটা হাঁস এনে রতন ঠাকুমাকে বললে হয় না, হাঁস তোমার পুকুরেই ছিল। সকালে আমাদের বাড়ীতে বা বলবে বাঁশবাগানে ছিল ধরে এনেছি। এই নাও তোমার হাঁস।

ওরে বাবা, একাজ ভুলেও করা চলবে না, তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে না। শেষ পর্যন্ত আমার নামে বিচার দেবে তোর ক্ষুদিরাম দাদুর কাছে।

তাহলে?

কাল সকালটাই তো আসুক। তারপর দেখা যাবে।

বিন্দুর হাসি আর ধরে না। সেই যখন থেকে রতন ঠাকুমা গালি দিচ্ছিল। আসলে এই হাসি রতন ঠাকুমার ভাষা শৈলি আর সুরের মায়াজাল থেকে সৃষ্ট।

বলি ও বিন্দু কাকী, এবার থামো।

জোরে হেসে ওঠে বিন্দু।

কি হল, তোমার গলায় কে শুড়শুড়ি দিচ্ছে নাকি?

হাসতে হাসতে একটা নিশ্বাস ফেলে বেল—ও, বলে কিনা আমার গু না খেলেই নয়। বাপরে, বাপরে, পেটে খিল পড়ে গেল।

বিন্দুর বলার কায়দা দেখে রণজিৎও হেসে ফেলে।

ঋষা বলে—ঢের হয়েছে, এবার একটু চা করবে নাকি চালিয়ে যাবে,।

দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি। দ্রুত চলে যায় বিন্দু। রান্নাঘরে গিয়েও তার হাসি থামেনি।

সবে চা করে ঋষা আর রণজিৎ এর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে বিন্দু। হঠাৎ সুখচাঁদ এসে হাজির বেশ সময় এসে পড়েছি রণদাদা।

বলেই চিৎকার করে এ্যা বিন্দু, একটু পেসাদ হবেক নাকি?

রান্না ঘর থেকে বিন্দু বলে—না হলে কি তুমি ছাড়বে। বুড়ো ঠিক গন্ধ পেয়েছে।

দেখছু বেটিয়া, বিন্দুর কথার কিমন ছিরি, বলি একটুকু চা বইত কিছু লয়।

ও এমনি বলছে।

হ্যা তা ত বুঝলাম, কিন্তুক, আর দুদিন পরেই তুষুমেলা, সব যাওয়া হবেক ত, নাকি ই সাঁওতাল বুড়াটা ডাকছে বলে যাবক লাই।

সে কি জ্যেঠু, কখন যাব না বললাম।

তাই বল। তুকে একটা কথা বলবক, উধার লে চ।

কেন? এখানে বলা যাবে না।

না রে, ইখানে বলা যাবেক লাই, গোপন কুথা বটে।

বেশ চল। তার আগে চাটা খেয়ে নাও।

চা খেতি খেতি বলা হইঙ্গ যাবেক, চনা উধার লে।

সবার চোখের আড়ালে গেছে ঋষা আর সুখচাঁদ।

বল, কি এমন গোপন কথা বলবে।

বলছিলম কি, উদিন ত রাইমণি, বাবুয়া আসবেক।

সে তো বুঝলাম।

উয়ারা তো আসবেকই।

আসুক না।

না। বলছিলাম কি, উয়ারা তো আসবেক, আর ....

আর?

উদিনই, সবাইকে বলবক ....

কি বলবে?

না আমি লয়, তুই ....

আমি কি?

ঐ যেটা, সুবাই বুলছে ....

সবাই কি বলছে।

ঐ আর কি।

ওঃ তুমি না। আসল কথাটাতো বলবে!

বলবত বটেই।

হ্যাঁ বল।

রাইমণির সাথে বাবুয়া

মানে?

ঐ হল আর কি?

তুমি না ....

হ্য হ্য, আমি ত বলতে পারবকলাই, সুবাই বুলছে মাইকে বলাইঙ্গ দিবিক

কি বলে দেব।

ঐ যে, ঐটা।

কোনটা।

উয়াদের বিহার কুথাটা।

ওঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

আসলে, আমি ত হেঁড়া খাবক, নিশা হইঙ্গ যাবেক লাই?

কম খাবে।

হ্য, তুই বললি বটে, উ দিনটায় কম খাইয়ে থাকা যায়?

বেশ, তুমি ঘোষণা করে খাবে।

অঃ তুই তাহলে আমর কেউ লয়?

সে কথা কখন বললাম।

তাহলে, অমন করে এড়াইঙ্গযাচ্ছু কিনে।

বেশ বল, কি বলতে হবে।

যিমন করি হুই সিনেমারলে বুলে।

সুখচাঁদ জ্যেঠু!

হ্য।

তুমি সিনেমাও দেখ।

লজ্জা পায় সুখচাঁদ। এক চুমুকে চাটা শেষ করে বলে—

না না, আমি উসব দেখি লাই, সুবাই বুলল বলে সেদিন দেখলাম বটে।

কি দেখলে?

বিহা হবেক পরে। আগে সব লোকের সামনে বলাইঙ্গ দিল উয়াদের বিহা হবেক, কুত লাচল, আমরা যিমন হেঁড়া খাই, উয়ারা মদ খিল, মাতাল হইঙ্গ গিল কুতকি হল।

ঋষা দেখছে সুখচাঁদকে। কত পিছিয়ে পড়া মানুষ। অথচ উগ্র আধুনিকতা তাদেরকে টানে। কিন্তু জানে না এর ফল কি!

এসবের আমাদের মত গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতা বা গ্রহণযোগ্যতা কতখানি।

অন্যদিকে সুখচাঁদ তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে যে স্বপ্নকে সযত্নে লালিত করে চলেছে, তার বহিঃপ্রকাশ কি অদ্ভুৎ।

সে জানে না, গ্রামীন চেতনা এখনও এমন পর্যায়ে আসেনি যে স্বতস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে সবকিছু। সে জানে না, আড়ালে প্রকাশ্যে সবাই টিট্‌কিরি দেবে, রসালো শব্দ সমাহারে।

সুখচাঁদ প্রচারের দায়িত্ব দিচ্ছে আমার, আবুর উপর, সেই সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে যারা স্বদর্পে এসে অত্যাচার করে গেছে সলেমান তাহের সিদ্দিকির উপরে। যারা বাপীর সামনে এক রূপে। বাপীর পিছনে অন্যরূপে অভিনয় করে চলেছে কারণে অকারণে।

সেই সব মানুষ রে রে করে উঠবে না! বলবে না সমাজের কলঙ্করা আর এক কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করছে।

বলবে না, আসলে তুষু মেলা নয়, তার আড়ালে চলছে অন্য মেলা।

অথচ ঐ সব পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো আসতে চায় সামনে, সামনের সারির কাছাকাছি। কেবলই চায়, পারে না, পারতে দেওয়া হয় না। কারণ যদিও সহজবোধ্য, তবু মনে হয় বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসব কিছু যেন অবোধ্য। আজও তথাকথিক বর্ধীষ্ণু, শিক্ষিত সমাজ তাদের অবচেতন মনে লালিত করে চলেছে—"হাম হ্যায় শের।"

যদিও সমাজ বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে প্রভুত্বের সেই সব দিনগুলি। যখন সামান্যতম অন্যায় করলে বা সমাজ সেরাদের (?) কথা না শুনলে, কিংবা তাদের বেঁধে দেওয়া সীমা ভুলবশত লঙ্ঘন করলে কঠোরতম শাস্তি পেতে হত। এমনকি ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হত অন্য কোথাও, ওদের চোখের আড়ালে।

যেমন হয়েছিল শম্ভু দোলুইকে। তার ছেলেমেয়েদের মুখে একটু খাবার তুলে দেবে বলে দুটো মাছ চুরি করেছিল, এবং বিক্রি করেছিল তাদের গাঁয়ের এক ব্রাহ্মণকে। বিনিময়ে তার বিরূদ্ধে বিধান দেওয়া হয়েছিল গাঁ ছেড়ে দিতে হবে। দিশেহারা শম্ভু তার সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে চলে এসেছিল ঝালুর গ্রামে।

আজ অবশ্য এসব হয় না। কাউকে শত অপরাধ করেও গাঁছাড়া হতে হয় না। ক্ষমা পরম ধর্ম। কিন্তু সেই ক্ষমাই এখন অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে চলেছে ক্রমাগত। অবশ্যই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বা ছত্রছায়ায় থেকে। যদিও সবক্ষেত্রে এমনটা যে হয় তা নয়, এই স্বাধীনতার একরূপ।

দিন বদলের সাথে সাথে পরিবর্ত্তন হচ্ছে অনেক কিছু। আধুনিকতা, উগ্র আধুনিকা ঢুকে পড়েছে প্রত্যন্ত গ্রামে। দূরদর্শনের অপার মহীমায়। যা সুখচাঁদের মত সেকেলে পিছিয়ে পড়া মানুষকে সামনের দিকে তাকাতে অনুপ্রাণীত করেছে। যেখানে সবকিছু রঙিন, উগ্র ধরণের রঙিন।

আর মাত্র একটা রাত্রি। এই রাত্রিটুকু শেষ হলেই মেতে উঠবে শীলাবতীর চর। রঙিন রঙিন শাড়ী পরে আসবে, যারা তুষু গাইবে সেইসব মেয়েরা, খোঁপায় বাঁধবে বিভিন্ন রঙের ফিতা, ফুল। চোখে সুরমা আঁকবে। পুরুষেরা মাথায় বাঁধবে লাল ফেট্টি। এ বছর তেমনই হওয়ার কথা।

মাদলে বাঁধা হবে লাল কাপড়। ধামাসায় রং করা হবে ছবি সহকারে।

সবই চলছে আজ। যেমন কোন মাটির প্রতিমা তৈরীর শেষ পর্যায়ে, শিল্পী তার তুলির শেষ টান দিয়ে চক্ষুদান করে প্রতীমার। তারপর ঢেকে দেয় কাপড় দিয়ে। তেমনই শেষ বারের জন্য মহড়া সেরে নিচ্ছে ঝালুর, বনডাঙার তুষুগানের দল, সুরে আনছে বৈচিত্র, ভাষার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে।

গুরুত্ব বাড়াচ্ছে গানের। রাত্রি বাড়ছে। তারপর একসময় নিরবতার চাদরে ঢেকে দিল তাদের সরব মহড়া। এখন আর ধামসা বাজছেনা। মাদল বাজছেনা। কেবল নিরবতাকে মন্থন করে চলেছে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার সুর।

সেই সুর শুনতে শুনতে আমার চোখে ঘুম ভর করছে আমার অজান্তে। একটা সিগারেট ধরিয়ে তা শেষ করে ঢুকে পড়েছি লেপের তলায়, রাত্রি তখন একটা।

আমার বাড়ীতেও পিঠেপুলির আয়োজন হয় প্রতি বৎসর। স্বাভাবিক নিয়মেই ঐদিন বন্ধ থাকে আমার ডাক্তারখানা। সাহায্য করতে হয় স্ত্রীকে। সে আজকাল আর সবকিছু পারেনা। শরীর বয়না বাতের তাড়নায়। কিন্তু তার মনটা ভীষন প্রাণবন্ত বলে হাজার অসুবিধা ও ক্লান্ত হাতটা নিয়ে করে চলে সবকিছু। ভাবতে অবাক লাগে। এরা কে? এরা কি জন্মগ্রহণ করে কেবল নিরবিচ্ছিভাবে কর্ত্তব্য করে যাওয়ার জন্যেই!

আমার মেয়ে, স্ত্রী জানে আমি শ্মশানঘাটে যাব, তুষুমেলাতে। কেননা সুখচাঁদ অনেকবার বলে গেছে। বলে গেছে আমার মেয়েকে, স্ত্রীকেও। যদিও ওরা যাবে না। ওরা সাধারণত কোথাও তেমন যায়না। ওরা নিজেদের বৃত্তে আবদ্ধ থাকাতেই ভালবাসে।

আমার বাড়ীর পাশাপাশি বাড়ীতে কয়েকটা মোরগের সমস্বরে চিৎকার জানান দিল রাত্রি শেষ হয়েছে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মকরস্নান করতে যাওয়ার সময় চিৎকার জানান দিল—সংক্রান্তি সুরু হয়েছে। বিছানা ছাড়তে গিয়ে দেখি আমার পাশে শুয়ে থাকা আমার অসুস্থ স্ত্রী বিছানায় নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখি সে তার প্রাত্যহিক কড়চায় মগ্ন। হাত লাগাই তার সাথে। যদিও আমিও কিছুই তেমন জানিনা। ঐটুকু সাহায্যেই ভীষণ খুশি সে। আমার সহযোগীতা তাকে যেন কয়েকগুণ বেশী উৎসাহিত করেছে।

কাজের মাঝেই জিজ্ঞাসা করে—কি গো, তুমি যাবে না?

যাবো।

তাহলে স্নান সেরে, আমার পুজোর যতটা পার জোগাড় সেরে চলে যাও।

মেয়ে উঠেছে ঘুম থেকে। স্নান সেরে সে তার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হাতে সাহায্য করছে তার মাকে।

তখন সকাল সাতটা। রণজিৎ-এর ডাক শোনা গেল, দরজার বাইরে সে—এই আনন্দ, কি করছিস্, কখন যাবি?

এইতো, এবার বেরুবো, আধঘন্টা অপেক্ষা কর।

তাড়াতাড়ি নে। সুখচাঁদকে তো জানিস্? দেরী হলে চলে যাবে আমাদের বাড়ী।

ঋষা, আবু ওখানে চলে গেছে?

ঋষাকে তো দেখে এলাম তৈরী হচ্ছে। আবুও যাবে

রণজিৎ-এর তাড়া খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম শ্মশান ঘাটের উদ্দেশ্যে।

শীতের সকাল। গাছের পাতায় পাতায় সকালের মিষ্টি রোদ্দুরের শিহরণ। পুকুরের ঘাটে গাঁয়ের বধুদের ভিড়। সব মকর স্নান সারছে। আজ যেন সবার অন্য নেশা। সবাই একসাথে, সবাই এলোমেলো। পুকুরঘাটের দিকে তাকাতে লজ্জা লাগে।

কোন কোন বাড়ীর খামারে চলছে লক্ষ্মীপুজোর জোগাড়। সকালেই পূজো হবে। কোন কোন বাড়ী থেকে ভেসে আসছে বাদশাভোগ বা ঐ জাতীয় সুগন্ধি চালের ঘ্রান। বোধহয় মকর হচ্ছে। কোন কোন বাড়ীতে শোনা যাচ্ছে হামাল দিস্তায় চাল গুঁড়ো করার একটানা শব্দ। রাস্তার দুধারের মাঠ মেখেছে হলুদ রং। সব সরিষা ক্ষেত। সকালেই ফুলের উপরে মৌমাছি, প্রজাপতির লীলাখেলায় মেতেছে। তাদের ডানার সৌখিন

হালকা শব্দ আসছে কানে। সরিষা ফুলের ক্ষেতে কয়েকটা ন্যাংটো ছেলে। হাতে তাদের ফুলের সাজি, ফুল তুলছে, তাদের বাড়ীর সংলগ্ন খামারে লক্ষ্মীপূজো হবে।

কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দেখলাম, দ্রুত পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে ভিন গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। আজ ওদের যেন নিশ্বাস নেওয়ার সময় নেই।

শ্মশানঘাটের কাছাকাছি নদীর ধারে আকাশমনী, শিশু, ইউক্যালিপ্টাসের সারি। রাস্তা রোদ ছায়া মাখা। শীত শীত করছে।

কিন্তু ওদের যেন শীত বোধ হারিয়ে গেছে। আসছে বিভিন্ন গাঁ থেকে। সবাই সমবেত হবে শ্মশানঘাটে। শীলাবতীর উত্তর চরে, দক্ষিণ চরে। কেননা এ বৎসর সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এসেছে সুখচাঁদ মুখিয়া। তার কথা অমান্য করে এমন বুকের পাটা কার। এপারে অর্থাৎ দক্ষিণ পারের উদ্দ্যেশে চলেছে সীতারাম সরেনের দল। মাদলে ধিতাং ধিতাং, বোল তুলে। পিছনে বাজছে ধাম্‌সা—গিদ্‌তা, গিদাং, গিদ্‌তা গিদাং, একটা বাচ্চা ছেলের হাতে কাঁসার চক্‌চকে কাঁশি। ছেলেটার হাতে একটা কাঠি। সে জুড়ি দিচ্ছে মাদল ধাম্‌সার তালে তাল মিলিয়ে—ঠাঁই ঠাঁই, ঠাঁই ঠাঁই।

সবার পিছনে আদিবাসী কামিনদের তুষু সেরেঙ্গ চলছে ট্রলিতে সাজানো মাইকে। নদীর দুপারের যতসব গাছের পাতায় পাতায় যেন অন্য আনন্দের শিহরণ। নদীর বাঁধে যেন বীর সৈনিকদের পদক্ষেপে ন্যাহ্য কম্পন। আজ মহারণ।

সীতারামের দলের মেয়েরা সেজেছে লালপাড় হলুদ শাড়ীতে। মাথায় লাল ফুল, লাল ফিতে। চোখে টেনেছে সুরমা। দুহাতে কাঁচের চুঁড়ি, পায়ে মল।

ছেলেরা সেজেছে—মাথায় লাল ফট্টি, তাতে গোঁজা পাখীর পালক। শরীরে উর্দ্ধদেশে কোন আবরণ নেই। হাঁটুসমান ধূতি, সাজিয়ে পরা। মাদলে বেঁধেছে লাল কাপড়। ধামসায় ছবি সহকারে বিভিন্ন রংয়ে কারুকার্য। তাছাড়া বিভিন্ন পাখীর পালকে সাজানো।

ওপারে অর্থাৎ উত্তরের চরে জুটেছে রঙিন সজ্জায় সজ্জিত বিভিন্ন দল। সুরতি বসেছে হেঁড়ে ভর্তি মাটির ডাবা নিয়ে। ভর্তি হেঁড়ে শেষ হচ্ছে মূহুর্তের মধ্যে। আবার ভর্তি করছে।

সুখচাঁদ সেজেছে কনের পিতার সাজে। সেজেছে রূপচাঁদ, লখাই। সুখচাঁদ মাঝে মাঝে মাউথ স্পিকারের কাছে গিয়ে ঘোষণা করছে—সুব্বাই শুননা কিনে। ইবারের তুষু সেরেঙ্গের লড়াই হবেক ই চরের সাথে উচরের। ই লড়াইয়ের যে জিৎবেক উয়ারা পুরস্কার পাবেক। পুরস্কার দিবেক আজকের তুষু মেলার বড় কুটুম্ব—রণজিৎ দাদা, উয়ার বেটিয়া। উয়ার সাথে আবু বেটা, আর ডাক্তারবাবু। কিন্তুক একটা কুথা। সুব্বাই মন দিকি শুনেলে। কুনু দল যেন কুনু খিস্তি খেউর না করে। ইটা আমাদের সম্মান বটে। ইকে আমরা ধূলায় মিশাইঙ্গ দিতে দিবক লাই।

এপার থেকে সীতারাম মাউথ স্পিকারে মুখ রেখে বলে—হ্যা হ্যা, ইটাবা ঠিক কুথা বটে। ইবার দেখে লিব কার কত সেরেঙ্গের জোর, ইবার দিখে লিব।

নদীর দু-চর ভাগ করে রেখেছে শীলাবতীর মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া শুরু স্রোত। যেখানে একদল বাচ্চা ছেলে ন্যাংটো হয়ে স্নান করছে মনের আনন্দে। তাদের মনে লড়াইয়ের আঁচ নেই। নেই কোন উত্তেজনা। কেবল খেলা, খেলা আর খেলা—অখন্ড স্বাধীনতায়।

সুখচাঁদ ঘোষণা করল—সুব দলকে বুলছি। ইবার শুরু হইঙ্গ যাবেক। ইখান উখান যারা দাঁড়াইঙ্গ আছু লড়াই দেখবেক বুলে—তুয়াদেরকে বুলছি। সব বসাইঙ্গ যা।

ঘোষণা করল সুখচাঁদ—ইবার বড় কুটুম্বের অনুমতি লিয়ে আমর বেটিয়া রাইমণির সেরেঙ্গের ক্যাসেট বাজানা হবেক।

ডাক দেয় রূপচাঁদকে। এ্য রূপচাঁদ—রণদাদার বেটিয়ার থিকে টেপটা লিয়ে আননা কিনে। উটা জুড়াইঙ্গ দিতে বল মাইকের সাথে।

রূপচাঁদ ঋষার কাছ থেকে ফিলিপ্স টেপটা এনে দেয় মাইকওয়ালার কাছে। সে সেট করে নেয় মাইকে।

সুখচাঁদ যেন শান্তি পায়। হ্যা। ইবার ঠিক হইঙ্গছে। সবার উদ্দেশ্যে বলে—আর একটা কুথা, ইটাই আসল কুথা।

সব্বাই শুনেছে—আজ ইখানের মেলায় রণদাদা ঘোষনা করবেক—আমার বেটিয়া রাইমণি আর লালগড়ের ছিলা বাবুয়ার বিহার কুথা।

বলেই আদেশ করে—এ মাইকয়ালা, জুড়াইঙ্গ দে ক্যাসেটটা। সমর্থনসূচক চিৎকারে ফেটে পড়েছে নদীর দুই চরের সমাবেশ।

বাঁশির সুর শুর হওয়ার সাথে সাথে থেমে গেছে চিৎকার। শুরু হয়েছে রইমণির গাওয়া গান—

তুষু মাগো, মাগো তুষু
তুয়ারলগে ই্ বছর।
(জুড়িদারদের কণ্ঠ জুড়ি দেয়)
(ই বছর, ই বছর)
নতুন সেরেঙ্গ বাঁধচি আমি
গম্‌গমাবে শীলাই চর।
(শীলাই চর, শীলাই চর)
তুয়ার লাল ডুরে শাড়ীখানা
আনছি কিনে শহরলে

(শহরলে শহরলে)
কিমন সুঁদর লাগছে তুকে
সুব্বাই দিখছে হাঁকরে।
(হাঁকরে হাঁকরে)
তুয়ার মুখে হাসি ফুটে
আমর আনা শাড়ী পরে
(শাড়ী পরে শাড়ী পরে)
মাথায় তুয়ার ধানের শীষ
যাচ্ছু সুবার ঘরে ঘরে।
(ঘরে ঘরে, ঘরে ঘরে)
লতুন ধানে হবেক মকর
চাষী বৌএর হাতের লে
(হাতের লে হাতের লে)
তুয়ার মুখে দিবেক মকর
তুয়ার ফুলের পরাগরে,
(পরাগরে পরাগরে)

খাইয়ে দাইয়ে বসবি এসে
ই শীলাবতীর চরে লে
(চরেলে চরেলে)
সেরেঙ্গ হবেক, বাজবেক মাদল
তুয়ার কথায় গানেরে।
(গানেরে গানেরে)
(ই বছর) শেষ হবেক তুয়ার সেরেঙ্গ
সুব্বাই চলেইঙ্গ যাবে করে
(যাবে ক্রে যাবে ক্রে)
থাকবক কি থাকবকলাই
সামনের বছর ইধারলে
(ইধারলে ই ধারলে)

তখন তুকে কে শুনাবেক
তুয়ার লগে তুয়ার গান
(তুয়ার গান, তুয়ার গান)

মিশাইঙ্গ যাবক ই বালিরে
(যখন) ফুরাইঙ্গ যাবেক আমর প্রান।
(আমর প্রান, আমর প্রাণ)
তুখন যদি মনে পড়ে
ই মাইয়াটার কুথারে
(কুথারে, কুথারে)
দেখবি আসাইঙ্গ লিখা আছে
চরের উপর সেরেঙ্গরে।
সেরেঙ্গরে সেরেঙ্গরে)

বার বার বাজছে রাইমণির গানটা। রণজিৎ, ঋষা গানটা আগেই শুনেছিল। আমার শোনা হয়নি।

রণজিৎকে বললাম—আচ্ছা রণজিৎ এই গানটা যদি অনুষ্ঠান চলাকালীন একটানা বাজানো হয়, তাহলে ভাল হয়না?

মন্দ হয়না—মতামত জানালো রণজিৎ। কিন্তু ওদেরকে বলবে কে। ওরা যেভাবে হেঁড়ে খেয়ে চলেছে।

একটা জিনিস্ লক্ষ করেছিস্?

কোন্‌টা।

বাঁশির সুরটা!

ওটা বাবুয়া বাজিয়েছে।

Fantastic !

রূপচাঁদ বদলে গেছে। সে যেন আজ সুখচাঁদের সবচেয়ে কাছের মানুষ। হয়তো আগামী দিনে সেই হবে মুখিয়া। এই ভাবনায়। সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে উপস্থিত বিশিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। মাঝে মাঝে সুরতির কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুরতি হেঁড়ের বাটি ধরিয়ে দিচ্ছে তার হাতে। গোগ্রাসে খেয়ে আবার যেন চরখি হয়ে যাচেছ।

রাইমণির সেরেঙ্গের শব্দ কমানো হয়েছে রূপচাঁদের নির্দেশে। রূপচাঁদ মাউথ স্পিকার ধরিয়ে দিয়েছে সুখচাঁদের হাতে।

সুখচাঁদ ঘোষণা করছে—সুব্বার অনুমতি লিয়ে ইবার শুরু হচ্ছে সেরেঙ্গের লড়াই।

সীতারাম এপার থেকে মাউথস্পিকার নিয়ে বলে—হ্যঁ। এবার শুরু হোক।

এ্য সীতারাম, তুয়ারা শুরু কর।

কিনে গো মুখিয়া। তুয়ারাই করনা কিনে!

চিৎকার করে ওঠে সুখচাঁদ—ই মুখিয়া যা বলছেক, তাই হবেক।

সীতারাম আর কোন বক্তব্য রাখেনি। তার দলের লোকদের নির্দেশ দিল—মুখিয়া বুলছে। আমাদের শুরু কুরতে হবেক। এ্য হপন, মাদলটা একবার বাজাইঙ্গ দিনা কিনে। এ্যা ভান্টু ধামসা বাজা।

মাদল ধামসায় যুগলবন্দি শুরু হল শীলাবতীর দক্ষিণ চরে—গিদতা, গিদাং, গিদতা গিদাং, ধিতাং, ধিতাং, ধিতাং, ধিতাং। কাঁশি জুড়ি দিচ্ছে ঠাঁই ঠাঁই, ঠাঁই ঠাঁই।

থেমে গেল মাদল ধামসার যুগলবন্দি। পানমনি ধরল গান।

আমাদের তুষু লাইতে এল
শীলাবতীর চরেলো
মাথায় মেখে ফুলং তেল
গন্ধ ম ম করেলো।
বুলেছিল গত বুছর
পরে নীল শাড়ী লো
জলের সাথে মিলাইঙ্গ দিবক
আমার সনার শরীরলো।
দিখবে তুদের তুষু আমায়
হিংসায় মরে যাবেকলো
রাগে গর গর করবেক ওরা
মাথার চুল ছিঁড়বেক লো।

তেজ হইঙ্গছে মুখিয়া বুড় হার
হারাইঙ্গ দিবেক বলছে লো
আয়না দেখি মুরদ কুত
নাকি ফাঁকা বুলি ঝাড়ছেলো।

থেমে গেছে পানমণি। মাদল ধামসায় দেওয়া জুড়িও থেমে গেল।

মুখিয়া ঘোষণা করল—ইবার আমাদের জবাবটা শুনাইঙ্গ লে।

এ্যা লখাই, এ্য ফুলমনি ধরনা কিনে তেজ লিয়ে।

লখাই তার বাউরি চুলটা গুছিয়ে নিয়েছে ফেট্টি বেঁধে। ফুলমণি শাড়ী বেঁধেছে কোমরে।

ধামসা, মাদল, কাঁসির ঐকতান শুরু এবং শেষ করে শুরু করেছে পানমণি, লখাই—

হ্য
হুই ধিতাং ধিতাং বোল তুলে
আমদের হাবানা যাবেক লাই

তুয়াদের তুষুর ইত গুমর
(যেন) ভুঁয়ে পা পড়ছে লাই।
গত বুছর বলেছিলি
(তুয়াদের তুষু) বেনারসী পরে আসবেকরে
কুথায় সে সব, ইখন দেখি
ছেঁড়া কানি পরেরে।

তুয়াদের হিংসা কিসের লগে!
দিখনা আমর তুষুর পানে
কি শাড়ী পরাইঙ আছেরে
আনছি হুই কলকাতারে।

কিমনে বলছ তেজ হইয়েছে
আমদের মুখিয়া বুড়হাটার
উয়ার লগেই ইখানে তুরা
গাব খসালি মাদলটার।

চাকঘুরানী ঘুরাইঙ্গ দিবক
ই শীলাবতীর চরেলে
পালাইঙ্গ যাবিক মাদল ফিলে
ছোটে কাপড়ে করেইঙ্গরে।

বুড়ো মুখিয়া নেশার ঘোরে মুখে হাত রেখে চিৎকার করছে বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ। তার সাথে জুড়ি দিচ্ছে তার দলের সবাই।

সবে জমে উঠেছে জবাব পাতনে। লোক জমছে তো জমছেই। ওসবে মন নেই বাচ্চা ছেলেগুলোর। তারা বালির চরে প্যান্ট জামা খুলে রেখে মেতেছে জলখেলায়।

বাতাস বইছে শীত ঝরিয়ে। নীল আকাশের এখানে ওখানে জমছে টুকরো টুকরো কালো মেঘ। মেঘ ছায়া মেখে গাছের পাতাগুলোও যেন মজেছে সেরেঙ্গে সেরেঙ্গে।

আবু অবাক হয়ে দেখছে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা প্রাচীন লোকসংস্কৃতি। যেন কোন গুহা থেকে একটা ছোট ভূমিকম্পে উঠে এসেছে মানুষের মাটির উপরে।

ঋষা, আবুর পাশে দাঁড়িয়ে কখনও হাততালি দিচ্ছে, কখনও সুখচাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আমি দেখছি মানুষগুলোকে। সব একাকার হয়ে গেছে। এক অভিনব যদিও পুরাতন অনুষ্ঠানে, আগুনের আঁচ নিতে নিতে। কিন্তু রণজিৎ!

তার যেন সমস্ত অনুভূতি বন্ধক পড়ে গেছে চারা জামগাছটার তলায়। সে যেন এই আনন্দমুখর দিনে খুঁজছে তার তুষুর নায়িকা পারুকে। ম্লান দার্শনিকের মত।

হঠাৎ, উত্তর পারের মানুষগুলো যাদের নজর ছিল চরের দিকে, দাঁড়িয়েছে পিছন ফিরে। একটা জিপ আসছে ধূলো উড়িয়ে। সে জিপ এলাকার সবারই চেনা।

মুখিয়ার কাছে কে যেন বলে—ঐ আস্ছে।

চিৎকার করে ওঠে মুখিয়া—সুব্বাই শুন্না কিনে। আমার বেটিয়া রাইমণি আসছে, বাবুয়া আসছে। রূপচাঁদকে ঠেলা দেয় সুখচাঁদ—আরে এ্য রূপচাঁদ, ইবার তুই বুলদিনা কিনে।

রূপচাঁদ মাউথস্বিকারে মুখ রেখে ঘোষণা করে—সুব্বাই শুনিলে, আজলে ইখানে, ঘোষণা হুবেক— রাইমণি, বাবুয়ার বিহার কুথা। যখন পুরস্কার দেওয়া হবেক— ই কুথাটা ঘোষণা করবেক রণদাদা।

তাছাড়া আজলে রাইমণি সেরেঙ্গ গাইবেক। উয়ার সাথে বাঁশি বাজবেক বাবুয়া। যেমনটা শুনছু মাইকলে বাজছে।।

আমার চোখ রাস্তার দিকে। যে রাস্তাটা শ্মশান ঘাট থেকে গিয়ে মিশেছে মনসাতলার চাতালে। জিপ ঘিরে মানুষের ভীড়। সেখান থেকে সবাই চলে যাচ্ছে যে যার বাড়ীর পথে। কেউ ফিরে আসছেনা। জীপটা ভীড় ঠেলে আসতেও পারছেনা। হঠাৎ হঠাৎ সমগ্র চিৎকার যেন নিরবতার চাদর পরে ফেলেছে।

রণজিৎকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার বলতো? সবাই চলে যাচ্ছে কেন?

রণজিৎ বোধহয় অন্যমনস্কতা থেকে এখনও সম্বিতে ফেরেনি।

আবার বললাম—এ্যাই রণজিৎ, কি হল তোর?

চমকে ওঠে রণজিৎ, জিজ্ঞাস করল—কিছু বলছিস্?

দেখছিস্ না সবাই চলে যাচ্ছে।

রণজিৎ তাকালো রাস্তার দিকে। বলল—এই অনিন্দ, কি ব্যাপার বলতো! পুলিশ জিপ আসছে মনে হচ্ছে!

আমিও তো তাই ভাবছি। তাহলে কি সুখচাঁদ যেভাবে অনুষ্ঠানটাকে প্রতিযোগিতার পর্যায়ে এনেছে। যেভাবে হেঁড়ে মদে মিলমিশ খেয়েছে। না জানি শেষ পর্যন্ত কোন্ পর্যায়ে যায়। তাই পুলিশ এসেছে কি? সেই ভয়েই ক সবাই চলে যাচ্ছে। তাছাড়া, দেখত দক্ষিণপারের কেউ যাচ্ছে না!

কিন্তু, আমার সাথে তো তেমন কোন আলোচনা হয়নি!

পুলিশের জিপ এসে গেল শীলাবতীর বাঁধে। ওরা নামছে জিপ থেকে। আমরা

ওদের কাছে গেলাম। রণজিৎ জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার স্যার? আপনারা আমাকে না জানিয়ে এখানে?

বড়বাবু বললেন—সরি রণজিৎবাবু। খুব খারাপ লাগছে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান। কিন্তু..............।

কিন্তু কি?

ততক্ষনে সুখচাঁদ টলতে টলতে এসে গেছে জিপের কাছে। দাঁড়াতে পারছেনা সে। দুহাত দিয়ে ধরেছে জিপটাকে। নিজেকে স্থির রাখার জন্য। আজ তারই তো সবচেয়ে আনন্দের দিন। কিছুক্ষণ আগে ঘোষিত হয়েছে তার মেয়ে, আর বাবুয়ার পরিণয়ের আগাম খবর।

জড়িয়ে যাওয়া তার ভাষা। জিজ্ঞাসা করে—তুয়ারা কিনেরে? তাকায় রণজিৎ-এর দিকে—এ্যা রণদাদা পুলিশ কিনে? কে উয়াদেরকে ইখানলে ডাকাইঙ্গছে। আমরা কি লড়াই কুরছি নাকি কুন ক্ষেতি কুরছি?

বড়বাবু সুখচাঁদকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি?

তাচ্ছিল্যের সাথে সুখচাঁদ জবাব দেয়—হ্যঁ, তুই কি লুতন লাকি?

মুখিয়া সুখচাঁদকে ইখানে জানে লাই, ইমন কে আছে।

ও! আপনি সুখচাঁদ!

রণজিৎ বোধহয় অশনিশঙ্কেত দেখেছিল। ডেকে নেয় বড়বাবুকে একটু দুরে। আমিও তার সাথে চলে যাই বড়বাবুর কাছে। জিজ্ঞাস করে রণজিৎ—বলুন স্যার, কি ব্যাপার?

দেখুন রণজিৎবাবু, ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু আমরাতো পুলিশ, আমাদেরকে আমাদের কাজ করতেই হয়। সে কাজ যত রুঢ় অথবা বেদনাদায়কই হোকনা কেন।

সে তো জানি, কিন্তু আসল...........

আজ সকালে একটা মোটর বাইকে লালগড়া থেকে আসছিল তিনজন। মেদিনীপুর মুখি একটা মালবাহী লরি ব্রেক ফেল করে ধাক্কা মারে ঐ মোটরবাইক সমেত আর একটা লরিকে। লরিটা উল্টে গেছে রাস্তার ধারে। তাদের কিছু হয়নি। কিন্তু মোটর বাইকের পিছনে বাসছিল যে দুজন—একজন মেয়ে, একজন ছেলে তারা ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। চালক কিভাবে যে বেঁচে গেল জানিনা! তাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে—ছেলেটি লালগড়ের নাম বাবুয়া. মেয়েটি এখানের নাম রাইমণি। ওরা তিনজন আসছিল তুষুমেলায় যোগ দিতে।

নির্বাক রণজিৎ, কিভাবে বলবে সুখচাঁদকে। নিজেকে শক্ত করে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি রণজিৎ।

বড়বাবু বলেন—আপনাদের কাউকে এক্ষুনি মেদিনীপুর মর্গে যেতে হবে।

বিনম্র বড়বাবু রণজিৎকে বলেন—আমাদেরও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। উপায় তো কোনকিছু নেই। তাহলে আসি রণজিৎবাবু। আপনারা আসুন।

খবরটা যেন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে লোকমুখে মুখে। রণজিৎ এর সাথে কথপোকথনের সময় সুখচাঁদ সুরতির কাছে এসে আরও কয়েকবাটী হেঁড়ে খেয়েছে। তার চেতনায় কোন বিপদের সঙ্কেত পৌঁছায়নি।

কিন্তু জেনে গেছে সীতারামের দল। বন্ধ করে দিয়েছে তাদের সেরেঙ্গ।

বন্ধ করে দিয়েছে লখাইরাও।

সুখচাঁদ হয়তো এক্ষুণি জেনে যাবে। তার আগেই সুখচাঁদের মুখোমুখি হতে ভয় পেয়ে রণজিৎ আমাকে বলে—অনিন্দ, তোকে সুখচাঁদকে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে হবে। ঋষা, আবুকে বলবি ওরা যেন সুখচাঁদের কাছে থাকে, কিছুটা স্বান্তনা পাবে। আমি রূপচাঁদকে নিয়ে মেদিনীপুর চলে যাচ্ছি। ওদের ময়না তদন্ত হলে রাইমণিকে নিয়ে আসব।

কেউ গাইছেনা, না লখাই, না সীতারামের দল। কেবল মাইকে বেজে চলেছে রাইমণির গাওয়া সেরেঙ্গটা। Slow volume তে।

চিৎকার করে ওঠে সুখচাঁদ—এ্যা লখাই, এ্যা সীতারাম, তুয়ারা কি আলা হইঙ্গ গেলি নাকিরে। থামাইঙ্গ দিলি কিনে?

নিজেকে সংযত করতে পারেনি সুরতি— চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলে—উঁয়ারা আর সেরেঙ্গ করবেক লাইগো কাকা। কাকাগো ইযে মাথায় বজ্রাঘাত পড়াইঙ্গ গিল গো। বাইমণি যে আমদের ভাসাইঙ্গ চলে গেলগো।

চিৎকার করে ওঠে সুখচাঁদ—কি বলছুরে সুরতি। আমার বেটিয়া..........

আর বলতে পারেনি সুখচাঁদ। দুহাত দিয়ে ছিঁড়ছে মাথার চুলগুলো। মাথা খুঁড়ছে বালির চরে।

ঋষা, আবু তাকে ধরে রাখতে পারছেনা। আমার হাত দুটো যেন অবশ হয়ে আসছে। সহ্য করতে পারছিনা ঘটনার অভিঘাৎ।

হঠাৎ নিরব হয়ে গেছে সুখচাঁদ। তার চোখ কখনও আবুর দিকে কখনও ঋষার দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বদলে গেছে সুখচাঁদ। চিৎকার করে ওঠে—কি হলরে, তুয়ারা থামাইঙ্গ গেলি কিনে। আমর বেটিয়া আসিছে। আমর জামাই আসিছে। উয়ারা সেরেঙ্গ চালাবেক। বাঁশি বাজাবেক।

হ্য হ্য, ইবার দেখাইঙ্গ দিবক, এ্যা বেটিয়া, ইবার তুই উয়াদের তুলাধূনা করাইঙ্গ দেত। উয়ারা বুলে কিনা............

আবার নীরব হয়ে গেছে সুখচাঁদ। বেশ কিছুক্ষণ।

শীলাবতীর দুই পারের জনসমাবেশ যেন জনশূন্যতার রূপ নিচ্ছে।

আকাশে জমছে ঘন কালা মেঘ। বাতাস বইছেনা। জাম, মাদার, হিজল, বাঁশের পাতা পড়ছেনা একটুও। ঋৃষা বুঝতে পারছেনা, কি করবে। আবু এই কিছুদিন আগে মাতৃহারা হয়ে শোকাহত। আর একজন সদ্যসন্তান হারানো পিতাকে স্বান্তনা দেবে, এমন ভাষা তার জানা নেই।

হঠাৎ ডুকুরে কেঁদে ওঠে সুখচাঁদ—বেটিয়ারে! তুই এই বুড়হা বাপটকে রাখাইঙ্গ কুথায় গেলিরে। তুয়ার লগে যে ইখানে সুব্বাইকে ডাকাইঙ্গছিরে। তুই দেখি জানা কিনে।

ঋৃষা সুখচাঁদকে টেনে নিয়েছে তার ছোট্ট বুকে। থেমে গেছে সুখচাঁদ, বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ঋৃষার বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখন সে নেশামুক্ত। ঋৃষা, আবুর হাত ধরে বলে—তুয়ারা পালাইঙ্গ যা। পালাইঙ্গ যা ইখন থিকে। ই শীলাই তুয়াদেরকেও লিযে লিবেক লিজের গভ্ভে। পালাইঙ্গ যা, পালাইঙ্গ যা। পালাইঙ্গ জানারে বেটিয়া।

চেতনা হারিয়ে গেছে সুখচাঁদের।

এইভাবেই কখনও হারিয়ে যাচ্ছে চেতনা, কখনও ফিরে আসছে।

মাইকটা বন্ধ করবে। ওখানে তেমন কেউ নেই। যারা শেষ পর্যন্ত ছিল তারা চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে চলেছে যে যার বাড়ীর পথে।

মাইকটাই যেন রাইমণি হয়ে গেয়ে চলেছে তুষু সেরেঙ্গ—

শেষ হবেক তুয়ার সেরেঙ্গ
সুব্বাই চলেঙ্গ যাবেকরে
থাকবক কি থাকবকলাই
সামনের বছর ইধারলে।

তুখন তুকে কে শুনাবে
তুয়ার লগে তুয়ার গান
মিশাইঙ্গ যাবক ই বালিরে
ফুরাইঙ্গ যাবেক আমর প্রাণ
কুখনও যদি মনে আসে
ই মাইয়াটার কুথারে

দেখবি হথায় লিখা আছে
চরের উপর সেরেঙ্গরে।

ঋষার দু চোখ বেয়ে নামছে ধারাস্রোত, আবু বিমূঢ়।

আমার ভাষা জানা নেই, কিভাবে বর্ণনা দেব এমন একটি ঘটনার। যেখানে, এই শীলাবতীর চরে এক একটি গান মিশে অছে। এক একটি বেদনা নিয়ে, জীবনের। তারা পারু, রূপালী, ফতিমা, সবাই রণজিৎ-এর। এইমাত্র যার বুকের হাহাকারে বয়ে চলেছে শীলাবতীর স্রোত। আজ, কিছুক্ষণের মধ্যে মিশে যাবে যে দেহটি আর তার গান, সে গান সুখচাঁদের হৃৎপিন্ডের।

যে সেরেঙ্গের ভাষা দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, প্রেম, সম্পর্ক, সংসর্গ। হয়তো বৈধ, হয়তো অবৈধ, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, শবকিছুই ভীষণ রকমের মানবিক।

নদী ভরবে বরষায়, তার সহস্র যৌবন নিয়ে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অবশিষ্ট পোড়া পোড়া কাঠগুলো। যে কাঠের উপরে রাইমণির শরীরের দাগ। সুখচাঁদের রাইমণির।

যার মৃত্যুর খবরে জাত, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে চোখের জল ফেলছে।।

যার মৃত্যুর দুঃখে উন্মাদ হয়ে যাওয়া পিতা সুখচাঁদ স্থান পেয়েছে ঋষা নামক আধুনিকার বুকে। মুসলিম হয়েও যে আবু এইমাত্র দোয়া ভিক্ষা করছে তার আল্লার কাছে।

যার শূন্যতায় নদীর দুপারের গাছগুলো নিরবতা পালনে রত। শীলাবতীর বোধহয় মায়া নেই। অথবা শীলাবতী বোধহয় প্রবাহমানা জীবন মৃত্যুর সেরেঙ্গ বুকে নিয়ে।

—সমাপ্ত-